নবগ্রামের সূচনা থেকে বর্তমানের সন্ধান

নবগ্রামের ইতিকথা

ঃ সম্পাদকমণ্ডলী ঃ

সর্বশ্রী ননীগোপাল শূর, অধ্যাপক নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
কবীর সুর চৌধুরী, অজয় চট্টোপাধ্যায়

NABAGRAMER ITIKATHA

প্রকাশক
শ্রীঅজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
ইং ১৯৯৯

অক্ষরবিন্যাস
রীতা পাল, পশ্চিম শান্তিনগর
বেলুড়, হাওড়া

মুদ্রক
কল্যাণকুমার জানা
নিউ আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
১/১, মুরারীপুকুর লেন,
কলকাতা-৭০০ ০৬৭
ফোন : ৮৩৬২৫০২ ৯

উৎসর্গ

তাঁদের উদ্দেশ্যে—
যাঁরা একসময় ভালবেসে
নবগ্রামকে সামাজিকভাবে
প্রতিষ্ঠিত করতে এবং চলার পথকে
সুগম করতে চেয়েছিলেন।



Government of West Bengal

Co-operative Directorate

Certificate of Merit

In recognition of meritorious services rendered in the cause of the Co-operative Movement, this Certificate is awarded to

Shri Jitendra Nath Das, Secretary

of Nabagram Coop Colony ~~Society~~ Ltd

in the district of Hooghly

Registrar of Co-operative Societies, West Bengal.

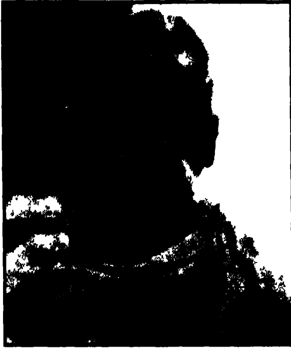
Minister, Food, Relief and Supplies and Co-operation, West Bengal.

Calcutta,

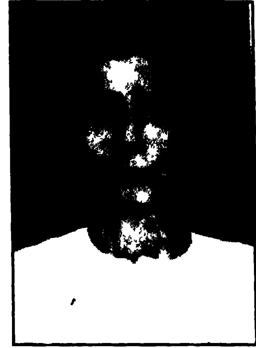
The 2nd July 1955.

সূচিপত্র

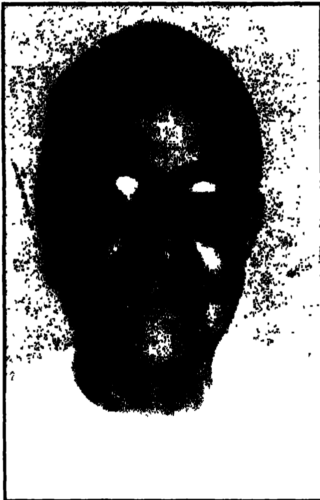
নবগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা দুই অক্লান্ত কর্মী



স্বর্গীয় গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র চন্দ



নবগ্রাম সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি
প্রয়াত সুকুমার চক্রবর্তী



নবগ্রাম সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক
প্রয়াত শচীন্দ্রকুমার সরকার



নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি লিমিটেড-এর
প্রথম বোর্ড অব ডিরেক্টরস(১৯৪৮-১৯৫১)



নবগ্রাম সোসাইটির ডিরেক্টর বোর্ডের প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ



নবগ্রামে মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রথম পাকা বাড়ীর জন্য
ভিত্তি স্থাপন। এখান থেকে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের দৃশ্য।

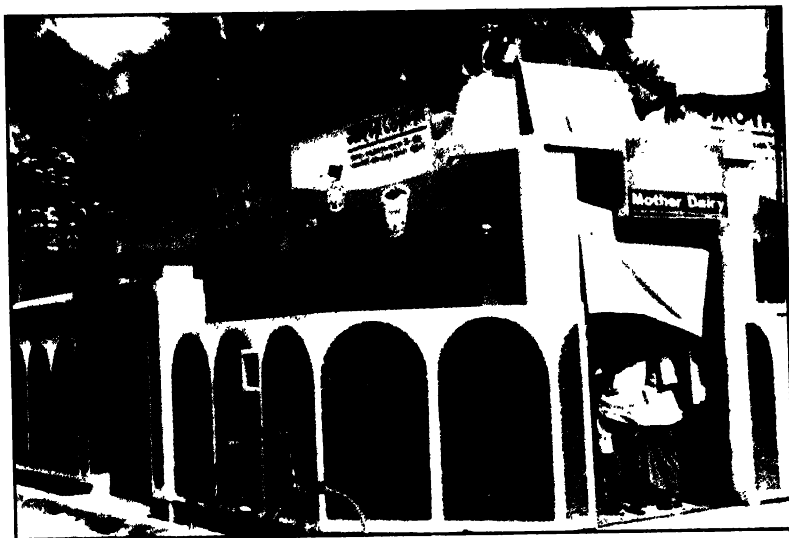


নবগ্রাম উচ্চশিক্ষা পরিষদের সভ্যবৃন্দ



নবগ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

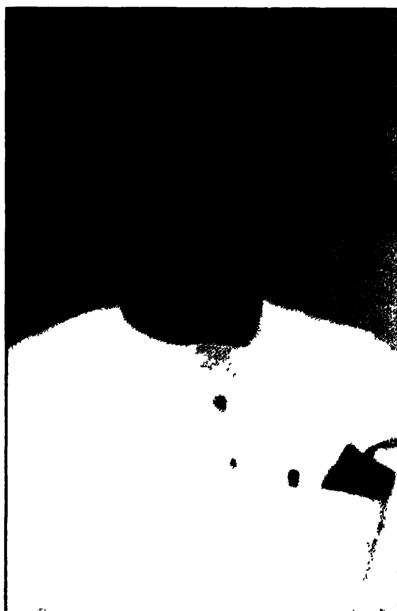
চিত্রে মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ, শচীন্দ্রকুমার সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রেবতীমোহন দাস, সুরেশচন্দ্র দে চৌধুরী, চন্দ্রভূষণ ভট্ট, ডাঃ তারাপদ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ



নবগ্রাম সোসাইটির নিজস্ব অফিস ঘর এবং তৎসংলগ্ন মাদার ডেয়রীর বুথ



প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের নবগ্রাম সোসাইটিতে
আগমন উপলক্ষে সম্বর্ধনা



প্রয়াত অমূল্যকুমার সরকার
নবগ্রাম সৃষ্টির প্রথম যুগের সংগঠক।
সোসাইটির প্রাক্তন সহঃ সভাপতি।
'নবগ্রাম' নামটি এঁর দেওয়া।



প্রয়াত জিতেন্দ্রনাথ কুশারী
স্বনামধন্য গান্ধিবাদী নেতা
সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি।



প্রয়াত জিতেন্দ্রনাথ দাস
উৎসাহী, নিষ্ঠাবান সংগঠক
সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক।



প্রয়াত চন্দ্রভূষণ ভট্ট
বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সংগঠক।
মাখলা ন-পাড়া ইউনিয়ন বোর্ড এবং
সোসাইটির প্রাক্তন সহঃ সভাপতি।

প্রাক্‌কথন

নবগ্রাম নামে গ্রাম হলেও কালের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে একবিংশ শতাব্দীতে সে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ। গ্রাম থেকেই সৃষ্ট এই নতুন গ্রাম। গ্রামের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েই আজ পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সমবায়ভিত্তিক উপনিবেশে। ''নবগ্রামের ইতিকথা'' গ্রন্থ রচনায় তাই দুটি জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নবগ্রামে বসতি স্থাপনের তাগিদ আর সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তার ধারাবাহিকতার কথা। এই জনপদের সৃষ্টি লগ্ন থেকে যাঁরা যুক্ত ছিলেন—যাঁরা অক্লান্ত শ্রম আর ভালবাসা দিয়েছিলেন, নবগ্রাম সৃষ্টির কর্মযজ্ঞ যাঁদের কাছে ছিল 'দিবসের সাধনা, রাত্রের স্বপ্ন'—সেই কর্মযোগীদের প্রচেষ্টার কথাও এই গ্রন্থে আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

নবগ্রাম সৃষ্টির পেছনে আছে একদিকে যেমন সাফল্যের ইতিহাস অন্যদিকে তাঁদের ফেলে-আসা অতীতের বেদনার কথা। ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যরাত্রে ভারতের গণপরিষদের সভাগৃহে উদ্বেলিতহৃদয় সদস্যদের সম্মুখে ভাবগম্ভীর পরিবেশে কংগ্রেস দলের এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) বহু-আকাঙ্ক্ষিত ভারতের-স্বাধীনতার কথা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন ''বহু বৎসর পূর্বে আমরা নিয়তির সঙ্গে অভিসারের সূচনা করেছিলাম। আর এখন আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের লগ্ন সমুপস্থিত। প্রতিশ্রুতির সামগ্রিক বা পূর্ণমাত্রার পূর্তি নয় এ, তবে প্রভূত পরিমাণে, মধ্যরাত্রি সমাগত হওয়া মাত্র, বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জাগরিত হয়ে উঠবে জীবনে ও স্বাধীনতায়। এক-একটা মুহূর্ত আসে আর ইতিহাসে এমন মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটে। ক্বচিৎ কখনও যখন আমরা পুরাতন থেকে বেরিয়ে এসে নূতনে পদক্ষেপ করি, যখন একটা যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং যখন দীর্ঘকাল পাষাণভারে নিপীড়িত থাকার পর কোন জাতির আত্মার প্রথম বাক্‌স্ফূর্তি হয়। এই পবিত্র মুহূর্তে এটাই স্বাভাবিক যে আমরা ভারত, তার জনসাধারণ ও তাঁদের চেয়েও মহত্ত্বের আদর্শ মানবতার সেবায় আত্মনিবেদন করার সংকল্প গ্রহণ করি।''

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট কেবল দিল্লীতেই নয়, ভারতের সর্বত্র হর্ষোল্লাসে মাতোয়ারা জনতা। প্রত্যুষে লালকেল্লার শীর্ষে পণ্ডিত নেহরু উত্তোলন করলেন স্বাধীন ভারতের অশোকচক্র অঙ্কিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। স্বাধীন ভারতের নবোদিত সূর্যকে দর্শন করলেন আবালবৃদ্ধ নরনারী। মিথ্যা নয়, আশ্বাস

বাক্য নয়, স্বপ্ন নয়। এতদিনে সার্থক হল—দীর্ঘদিনের সংগ্রাম। এর জন্য কত মানুষ ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছেন, আন্দামানের—সেলুলার জেলে নির্বাসিত মানুষের দল দিনের পর দিন প্রার্থনা করেছেন পরাধীনতার অবসান।

কিন্তু এই আনন্দের উত্তেজনা ক্রমশ যেন স্তিমিত হয়ে গেল অনেক মানুষের কাছে। হিন্দু পূর্ববঙ্গবাসীরা বুঝতে পারলেন যে তাঁদের মূল শিকড় ছিন্ন হয়ে গেছে ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে। যে স্বাধীনত'র জন্য তাঁরা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে, আজ তাঁদের একাংশের এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ সে-অস্ত্র প্রয়োগ করছে সহকর্মী স্বভূমির বন্ধুদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁদের অপরাধ? তাঁরা হিন্দু। ধর্মের ধ্বজা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বুঝতে পারলেন যে পূর্ববঙ্গে আর বসবাস করা যাবে না। তাই তাঁরা স্বাধীনতার শুভলগ্নে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে হলেন বাস্তুহারা—নাম হল উদ্বাস্তু। তাঁরা বুঝতে পারলেন স্বাধীনতা তাঁদের কপালে লিখে দিয়েছে ছিন্নমূলের তিলক। সাম্প্রদায়িকতার বিষ এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু থেকে তাঁদের অধিকার হারিয়ে গেছে। তাঁরা ভারতের দিকে পা বাড়ালেন, সেখানে তাঁরা ঘর বাঁধতে চেষ্টা করলেন। ভাবতে যাঁরা এলেন তাঁদের কয়েকটা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একদল মানুষ যারা চাকুরী, ব্যবসা ও লেখাপড়ার জন্য অনেক আগে থেকেই কলকাতা এবং সন্নিহিত এলাকায় এসে বাস করতেন। কেউ ছাত্রাবাসে, কেউ মেসে, কেউ ভাড়া বাড়িতে, কেউ আবার ঘরবাড়ীও করেছিলেন। এঁরা সাধারণত পুজো বা অনুষ্ঠানাদির সময় দেশের বাড়িতে যেতেন। নোয়াখালির ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এঁদের মধ্যে নতুন এই মানসিকতার সৃষ্টি করল যে পূর্ববঙ্গে মানসম্মান, সর্বোপরি ইজ্জত নিয়ে থাকা যাবে না। এঁরাই পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এ সময়ে বহু হিন্দু পূর্ব বাঙলায় রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর একদল গোঁড়া মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিষ এমনভাবে ছড়িয়েছিল যে তাদের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হল হিন্দুনিধন ও অমানবিক অত্যাচার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্ববঙ্গের কিছু বাঙালি মুসলমান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ালেও, সমবেদনা জানালেও, তাঁরা সফল হতে পারেননি। নিরুপায় হয়ে সর্বস্ব ছেড়ে, কেউ শালগ্রাম শিলা, পুঁথি-পত্র কেউ বা দলিল-পত্র নিয়ে ভিক্ষুকদের মতো জননী জন্মভূমির প্রতি শেষ প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চললেন ভারতের দিকে—স্বাধীন দেশের দিকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে দাঙ্গা ও বাস্তুত্যাগের টান এমন প্রচণ্ড ছিল যে তা যে কোন

সাধারণ রাষ্ট্রের পক্ষে ভেঙ্গে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ঐরকম অনিশ্চিত অবস্থায় ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিসংখ্যান রাখা সম্ভব হয় না এবং ভারত বিভাজনের সময়কার ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্যও নেই। তবে ঐ সময়কার এক বিশেষজ্ঞ পেনড্রেল মুন-এর মতে ঐ পর্বে মৃতের সংখ্যা দুই থেকে দশ লক্ষের মত। অপর এক বিশেষজ্ঞ লিওনার্ড মসলের মতে ভারত-বিভাজনের প্রথম ধাক্কায় দেড় কোটি নর-নারীকে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে শরণ নিতে হয় এবং ভারত থেকে বেশ কয়েক লক্ষ মুসলমানকে উদ্বাস্তু হয়ে পাকিস্তানে যেতে হয়। পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে আসার প্রবাহ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেই শেষ হয়ে যায়নি। দফায় দফায় চলেছে। স্বাধীন ভারত এই দুই কোটিরও বেশী উদ্বাস্তুর যথাসম্ভব পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সরকারী প্রয়াস (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারদের উদ্বাস্তু পরিকল্পনা সমূহ), বেসরকারী উদ্যোগ (অগণিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অবদান) ছাড়াও উদ্বাস্তুদের নিজস্ব অভিক্রমেরও প্রমুখ ভূমিকাও আছে ভারতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রয়াসে। নবগ্রাম সৃষ্টির পেছনে আছে মূলত নিজস্ব অভিক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আবাদী, অনাবাদী, জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কিছু কর্মযোগীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, এলাকার পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের সহযোগিতা আর নবাগত বাসিন্দাদের মানসিকতা—এই তিন স্রোতধারা মিলিত হয়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সৃষ্টি হলো নবগ্রাম।।

"সকল দ্বন্দ্বের মাঝে দ্বন্দ্বাতীত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। অসত্যের মাঝে লুকিয়ে আছেন সত্যরূপে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলার নিয়ামকরূপে, আবার প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও তাঁর মঙ্গল হস্ত উত্তোলিত হয়েছে আমাদের মস্তকোপরি। বর্তমানের দুঃখ বিপদ, আত্মকলহ, ক্রোধ, ঈর্ষার অন্তরালে শান্তি ও আনন্দের যে পারাবার আছে, সেখানে আমরা পৌঁছব, এই আশা নিয়েই বর্তমানকে যেন আমরা বরণ করি। নবগ্রামের নতুন সমাজ গড়তে গিয়ে সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।"

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী

সৃষ্টির কথা

নবগ্রাম নতুন গ্রাম। নামে গ্রাম হলেও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই অঞ্চল এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ। প্রায় ছয় দশক আগে এটি গ্রামই ছিল। আবাদী আর অনাবাদী জমিই ছিল নবগ্রামের ভিত্তি মৃত্তিকা। তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই গ্রামের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা সমবায়-ভিত্তিক কলোনিতে।

পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার, উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোন্নগর রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে ছোট বহেড়া বা খোর্দা বহেড়া, বড় বহেড়া এবং কোন্নগর মৌজার কিছু জমি নিয়ে নবগ্রামের সৃষ্টি। ইংরেজ আমলের মাখলা-ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের ন'পাড়া অঞ্চল। নবগ্রামের পূর্বে কোন্নগর, পশ্চিমে কানাইপুর, উত্তরে রিষড়া এবং দক্ষিণে নৈটি রোড। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল রিষড়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ন'পাড়া, পূর্বে সবটাই রেললাইন। আয়তন ২.৭৫ বর্গ মাইল। পূর্বে গঙ্গা, পশ্চিমে সরস্বতী, দক্ষিণে বালিখাল এবং উত্তরে বাগখাল। এরই মধ্যস্থলে উপরিউক্ত মৌজাগুলির অবস্থান বলা যেতে পারে। লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৭,৫০০ থেকে ১৮,০০০।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এই শুভ মুহূর্তে অসংখ্য নরনারী নিজ জন্মভূমিতেই সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে মর্যাদাহীন হল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল। পূর্ববাংলায় 'ইউনিয়ন জ্যাক' অবনমিত হল আর তারপর স্থান নিল পাকিস্তানের পতাকা। কারণ ভারতের স্বাধীনতা এসেছে ভারতবর্ষ ভাগের সম্মতি দিয়ে পূর্ববাংলার হিন্দু জনমতের প্রতি কোনরকম সৌজন্য না দেখিয়ে। এখানকার কিছু বাঙালী অহিন্দু তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিন যারা বাঙালী অহিন্দুর সঙ্গে হিন্দু বাঙালীর বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গেই পূর্ববাংলার বাঙালীদের লড়াই লেগেছিল। ধর্ম নিয়ে নয়—ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার রীতিনীতির পার্থক্য নিয়ে। তার পরিণতি স্বাধীন বাঙলাদেশ সৃষ্টি (১৯৭১)। সেদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করেছিল সমগ্র বায়ুমণ্ডল। তাই পরম আনন্দের দিনে, দীর্ঘ সংগ্রামের অবসানের পর চরম সাফল্যের দিনে পূর্ব

বাঙলার হিন্দুরা হল গৃহহারা, বাস্তুচ্যুত-উদ্‌বাস্তু। ১৯৪৭-এর ১৪-১৫ই আগস্টের মধ্যরাত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা। প্রত্যুষে একদিকে উৎসাহ-উল্লাস আর অন্যদিকে পূর্ব বাংলার অগণিত হিন্দুদের সব ছেড়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসার পদযাত্রা।

শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসায়ের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গবাসী বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতেন। তাঁরা পূজার ছুটিতে বা অনুষ্ঠানাদিতে দেশে যেতেন। এঁদের মূল শিকড়, পূর্ববঙ্গে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা Great Calcutta Killing (16.8.1946) তাঁদের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তারা চিন্তা করেন পশ্চিমবঙ্গেই স্থায়ী ঠিকানা করতে হবে। এঁদের মধ্যে অনেকে থাকতেন মেসে, হোস্টেলে, ভাড়া-করা বাড়িতে, আত্মীয়ের বাড়িতে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু পরিচিতদের বাড়িতে। তাঁরা এবার পশ্চিমবঙ্গে মাথা গোঁজবার আস্তানা তৈরীর জন্য জমি দেখাশোনা করতে লাগলেন। আর একদল স্থান নিয়েছিলেন সরকারী উদ্বাস্তু শিবিরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৈন্যদের পরিত্যক্ত সেনা নিবাসে, সরকারী জমিতে। এঁরা অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিলেন। এঁদের একাংশ জবরদখল করে অপরের জমিতে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে বা তাঁদের বাড়িতেই বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। আইন প্রশাসনের বাধা না মেনে মরিয়া হয়ে রাস্তার ধারে চালা তুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন এখনকার গুমটির মত। এঁরা হলেন জবর দখল কলোনির সৃষ্টিকর্তা। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-ভাগের ফলে যে কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল সেই দুঃখবেদনা কীভাবে সমাজ-জীবনকে কলুষিত করেছিল তা কারো অজানা নয়।

নবগ্রাম যে-ভূখণ্ডের উপর সৃষ্টি হয়েছে তা হল ছোট বহেড়া, বড় বহেড়া ও ন'পাড়ার কিছু অঞ্চল নিয়ে। এগুলি ছিল কৃষিজমি আর বাঁশবন, স্থানীয় কৃষকদের কিছু বসতবাড়ি। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিলেন কৃষি নির্ভর।

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার দাঙ্গার পর পূর্ববঙ্গেও নোয়াখালিতে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে যায়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে ঘর বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করতে আরম্ভ করলেন। এর পূর্ণ পরিণতি ঘটে ভারত বিভাগের পর। কোন্নগর রেলস্টেশনের পশ্চিমদিকে এই জমিতে বাসভূমি তৈরী করার মানসিকতার পেছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত কলকাতার সঙ্গে শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসাসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববঙ্গের উচ্চকোটি হিন্দুদের যোগসূত্র ছিল। অনেকেই মেসবাড়িতে, হোস্টেলে, কোম্পানীর কোয়ার্টারে ও ভাড়াবাড়িতে

এবং কিছু সংখ্যক লোক বাড়িঘর তৈরী করে বসবাস করতেন। পুজো বা অনুষ্ঠানাদির সময় দেশে গিয়ে সমবেত হতেন। তারা কলকাতা ও শহরতলীতে নানা কাজকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তাই কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে জমি জোগাড় করার জন্য গঙ্গা নদীর এপারে ওপারে জমি সংগ্রহ ও বাড়ি তৈরীর কাজে সচেষ্ট হন। সেই সূত্রে কোন্নগর স্টেশনের আশেপাশে পূর্ব এবং পশ্চিমদিকের জমি কেনার চেষ্টা চলে।

রেললাইন ও বাস চলাচলের সুবিধা—কোন্নগর সন্নিহিত অঞ্চলকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ। ১৮৫৪ সাল থেকে ক্রমে ক্রমে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের নেতৃত্বে কোন্নগর হাইস্কুল, কোন্নগর হিন্দু গার্লস স্কুল, কোন্নগর লাইব্রেরী, স্টেশন, পোস্ট অফিস, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়াও প্রায় ছয়শত বছরের পুরানো এই গ্রাম তার ঐতিহ্য নিয়ে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আসছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও এখানে বহু মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে। তাই এর একটা বিশেষ আকর্ষণও ছিল।

এখানকার কৃষকরা চাষবাস থেকে তেমন রোজগার করতে পারত না। প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও অনেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন না-থাকায় বিশেষ প্রয়োজনে জমি বিক্রয়ের একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। উভয় পক্ষের ইচ্ছার মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেয় কয়েকজন সহৃদয় পূর্ববঙ্গবাসী ভদ্রলোক এবং এই অঞ্চলের উদারমনস্ক কিছু সরল গ্রামবাসী। পূর্ববঙ্গবাসী কিছু ব্যক্তির সঙ্গে নানাসূত্রে এতদ্ অঞ্চলে কিছু জমির মালিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয় ছিল। তাঁদের সহযোগিতা নবগ্রাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে বড়বহেড়ার বাসিন্দা শিক্ষাব্রতী পরেশনাথ ঘোষের দাদা কানাইলাল ঘোষ তখন সন্নিহিত অঞ্চল, মাখলায় বৃটিশ বাণিজ্যিক সংস্থা র‍্যালি ব্রাদার্সে পাট সরবরাহ করতেন। তখন এই সংস্থায় হেডক্লার্ক ছিলেন গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কানাইবাবুর বিশেষ পরিচয় গড়ে উঠেছিল। গিরীন্দ্রবাবু, কানাইবাবুর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এখানে জমি কিনলেন এবং বেশ খানিকটা অঞ্চল নিয়ে নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বাসস্থান গড়ার কাজে এগিয়ে এলেন।

১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসে বড়বহেড়ার পঞ্চু ঘোষ, চারু ঘোষ, সন্তোষ দিগর প্রমুখদের দেড় বিঘা মত জমি ক্রয় করেন। এর কিছু পরেই মহেন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য (লক্ষ্মণ ঠাকুর) কিছু জমি ক্রয় করেন। এই জমির মালিকানা ছিল যথাক্রমে আশুতোষ ঘোষ এবং প্রসাদ ঘোষের। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে গিরীন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু, লক্ষ্মণবাবু এবং প্রফুল্লবাবু একই দিনে

তাঁদের বাড়ির ভিত দিলেও এঁদের মধ্যে শুধু গিরীন্দ্রবাবু এবং প্রফুল্লবাবু টিনের চালা তুলে বাস করতে আরম্ভ করেন। গিরীন্দ্রবাবুর সপরিবারে নবগ্রাম বসবাস শুরু করার তারিখটা হল ১৯৪৮ সালের ২৭শে জুলাই। বড়বহেড়া মৌজাভুক্ত অঞ্চলে গিরীন্দ্রবাবু ও প্রফুল্লবাবু যখন বসতি স্থাপন করেছিলেন তখন ফরিদপুর জেলার অক্ষয় দাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস জমি কেনেন। এঁরা ছোটবহেড়ার বর্ধিষ্ণু প্রজা সুরেন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে জমি কেনেন। সম্ভবত ১৯৪৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে তাঁরা বাড়ি তৈরী করেন।

এরপর প্রমথ ঘোষ, যোড়শীরঞ্জন দে চৌধুরী, পরেশ বিশ্বাস, শচীন্দ্রকুমার সরকার, জ্যোতিষ মজুমদার, সুধীর গুহ, হরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ফরিদপুর জেলার আগত মানুষেরা বি ব্লকের কেষ্ট ঘোষ ও কেদার ঘোষেদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। এঁদের এই ক্রীত জমিটি "লিচু ডাঙা" নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বড়বহেড়া গ্রামের পুরানো বাসিন্দা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পরেশনাথ ঘোষ লিখেছেন "আমাদের বহেড়া গ্রামের অর্থাৎ ছোট বহেড়া ও বড় বহেড়া গ্রামে মোট জনসংখ্যা ছিল ১০০০এর মতন। এর মধ্যে ছোট বহেড়ায় ৪০০ এবং বড় বহেড়ায় ৬০০। এই বসবাসকারীদের মধ্যে নাম সই করার মতন মানুষের সংখ্যা ছিল ৭০-৮০জন। আর পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ছিলেন ১৫-২০জন। মহিলাদের মধ্যে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন কেউই ছিলেন না। যদিও নিকটবর্তী শহর কোন্নগরে তখন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি কোন্নগর হাইস্কুল স্থাপন করেন ১৮৫৪ সালের ১লা মে।

গ্রামের সমস্ত মানুষই কৃষিজীবী ছিলেন। বড় বহেড়া ও ছোট বহেড়া গ্রামের মানুষ খুব বড় চাষী ছিলেন না। তখনকার দুই গ্রামের ৭-৮টি পরিবার ছাড়া প্রত্যেকেই প্রান্তিক কৃষক বলা যেতে পারে। পরিবার পিছু ৪০-৫০ বিঘা জমি ছিল বটে কিন্তু তার মধ্যে উৎপাদনক্ষম জমির পরিমাণ হয়ত ১০-২৫ বিঘা। যে পরিবারে কৃষিকর্মে সক্ষম সদস্য বেশী, সেই পরিবারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। এই সব পরিবারে ৭-৮বৎসরের শিশুদেরও কৃষক পিতার কৃষিকার্যে সাহায্যের জন্য পরিশ্রম করতে হত। গো-পালনে ছোটদের ভূমিকা ছিল। মাঠে কৃষি মজুরের জলখাবার পৌঁছে দেওয়া ছোটদের কাজ ছিল।

হুগলী জেলার কোন্নগর রেল স্টেশনের পশ্চিমপাশে নবগ্রামের অবস্থিতি। নবগ্রামের প্রথম ইতিবৃত্ত রচনা করেন নবগ্রামের প্রথম সম্পাদক প্রয়াত পরেশচন্দ্র চন্দ। এই রচনাটি বাংলার ১৩৫৭, ইংরেজী ১৯৫১ দোল সংখ্যায়,

নবগ্রাম সেবক সংঘের হাতে লেখা পত্রিকা "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হয়। 'প্রতিধ্বনি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে প্রয়াত কানু চক্রবর্তী।

পরেশবাবু লিখেছেন—"পিতৃ পিতামহের ভিটামাটি অম্লান বদনে বিসর্জন দিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় নিয়া চলিয়া আসিয়াছি। স্বাধীন ভারতে এক টুকরো মাটির উপর দাঁড়াইয়া মরিবার অধিকারও বুঝি আজ আমরা হারাইয়াছি। যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই অভিযাত্রীর দল একদিন ভূমির সন্ধান করিল বাঁশ ও জঙ্গলাকীর্ণ, মানুষের বাসের অনুপযোগী হুগলী জেলার বড় বহেড়া, ছোট বহেড়া ও কোন্নগর মৌজার সংযোগ স্থলে। এই স্থান আবিষ্কার ও নির্বাচনে প্রধান কৃতিত্ব আমাদের সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। আমরা অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি সংগ্রহের জন্য ঘুরিতেছিলাম। এমনি সময়ে একদিন এই জমির সন্ধান দিলেন শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। আরও পাঁচজন আসিলেন—আরও দশজন, বিশজন, ক্রমে আমরা পঞ্চাশজন হইলাম।

১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর হইতে জমি খরিদ ও রেজেষ্ট্রী আরম্ভ হইল। ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী ৪৪/১, গ্রে স্ট্রীটে আয়ুর্বেদ ভবনের আফিসে আমরা মিলিত হইলাম। নতুন আদর্শের নতুন পরিকল্পনা নতুন পরিবেশে নতুন সমাজ সৃষ্টির ভাবধারা লইয়া আমরা নবগ্রাম সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করিলাম। সেদিন আমরা যাঁহাদের সক্রিয় এবং আন্তরিক সহযোগিতা লইয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্রকুমার মজুমদার, জিতেন্দ্রনাথ দাস, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, অমূল্যকুমার সরকার, মণীন্দ্রকুমার মজুমদার, প্রবোধরঞ্জন গুহ, যামিনীকান্ত ঘোষাল চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮-এর ২৯শে মার্চ এক সাধারণ সভায় সমবায় প্রথায় এই কলোনি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতে থাকে। 'নবগ্রামে' গৃহনির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের পক্ষে উহা একটি স্মরণীয় দিন। আনুষ্ঠানিক শুভকার্যের পর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রবাবু উপস্থিত আমাদের সকলকে খিচুড়ি খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই বাঁশবনে লোকালয়ের চিহ্ন যেখানে নাই, জনমানবহীন নির্জন স্থানে চাল ও ডালের সংস্থান করা গেল, কিন্তু কোন সরঞ্জামের ব্যবস্থা নাই। বড় বহেড়া গ্রামের পঞ্চানন ঘোষের বাড়ি হইতে

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও জল আনা হইল। কিন্তু খিচুড়ির সাথে প্রয়োজনীয় তবকারি ও লঙ্কার অভাব। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চক্রবর্তীর জমিতে আলুর চাষ ছিল। সত্যপ্রসাদ বাবু সেখান হইতে আলু তুলিয়া আনিলেন। লঙ্কারও ব্যবস্থা হইল। তিনখানা ইঁটের সাহায্যে উনুন করা গেল। বাঁশপাতাকে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হইল। অনেক নাকের জল, চোখের জল একত্র করিয়া গিরীনবাবুর স্ত্রী ইন্দুবালা দেবী খিচুড়ি রান্না করিলেন, আমরা পংক্তি ভোজনে বসিয়া গেলাম। বহুদিন পর ছাড়িয়া আসা গ্রামের কথা মনে পড়িল। প্রিয়তম জন্মভূমির কথা মনে পড়িল। কোন্ অপরাধে আমরা তথা হইতে বিতাড়িত হইলাম? কোন্ বৃহত্তর স্বার্থের জন্য? কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? অথবা ইহা কি শুধু আমাদের নেতৃবৃন্দের ওপর অন্ধবিশ্বাসের পরিণাম? তথাপি গৃহহারা গৃহের সন্ধান পাইতেছে, বাস্তুহারা বাস্তু করিতে যাইতেছে, সমাজ ভ্রষ্টের দল সমাজ সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হইয়াছে—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের মাথা গুঁজিবার একটা আস্তানা হইতেছে এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল।"

পরেশবাবু আরো লিখেছেন—"নবগ্রামে প্রথম বাসিন্দা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস—তারপর আসেন একখানা টিনের ঘর করে গিরীনবাবু। পূর্বপ্রান্তে প্রফুল্লবাবু। পশ্চিম প্রান্তে গিরীনবাবু—মধ্যে ঘন বাঁশবন। ঠিক এই সময় প্রফুল্ল বাবুর বাড়িতে ডাকাতি হয়। এর পরে কলোনি সদস্যদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল যথাসম্ভব সত্বর নিজ নিজ গৃহ নির্মাণ করিয়া এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করবার জন্য। কলোনীর কাজও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। রাস্তাঘাট ও ড্রেন প্রস্তুত প্রধান কাজ ছিল। সার্ভেয়ার প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জরিপের কাজের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। ধীরে ধীরে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়েকজন প্রত্যেক ছুটির দিন কলিকাতা থেকে আসতেন এবং ভাগাভাগি করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করতেন গিরীনবাবু, জিতেনবাবু, প্রবোধবাবু ও প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে। জিতেন দাস মহাশয়ের অধিনায়কত্বে এই সময় একটি রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়, জিতেন দাস মহাশয়কে G.O.C. নামে অভিহিত করা হয়।"

"১৯৪৮-এর ২রা ডিসেম্বর তারিখে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি লিমিটেড সমবায় আইনানুযায়ী রেজিষ্ট্রীভুক্ত হয়। ৩রা ডিসেম্বর গিরীনবাবুর বাড়িতে হরির লুটের ব্যবস্থা হয়। সেটা ছিল একটি স্মরণীয় দিন। একটি সমিতি রেজিষ্ট্রী হওয়া খুব বড় কথা নয়, কিন্তু সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হইয়াছিল আমরা যেন দিগ্‌বিজয় করিয়া আসিয়াছি।" একথাও পরেশবাবুর লেখা থেকে জানা যায়।

'দামোদর কলোনী বড় বহেড়া মৌজায় 'বেনেপুকুরে'র উত্তরপাড়ে এবং বিদুর বাগানের উত্তরে কিছু কিছু বসতি স্থাপন হয়। হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসা বেনেপুকুর পাড়ের বৈদ্যনাথ ঘোষ, নলিনী ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই দামোদর কলোনীর সৃষ্টির প্রথম দিককার মানুষ। সম্ভবত ১৯৪৭ হইতে ৪৯ সালে এই অঞ্চলে গৃহাদি নির্মিত হয়। বর্তমানে দামোদর কলোনি নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

পরেশবাবুর বর্ণনায় আরো পাওয়া যায়—'সি' ব্লকে বড় বহেড়ার পশ্চিম সীমান্তে কানাইপুর ও ন'-পাড়ার সন্নিহিত অঞ্চলের যে বিশাল আবাদী-এলাকা ছিল সেখানে শিশুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাংশুশেখর বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ জমি কেনেন। ১৯৪৮-এর শেষের দিকে এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত জমি কেনা-বেচা ও গৃহাদি নির্মাণের কাজ চলে। সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী, নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ এখানকার বসবাসকারীদের মধ্যে স্বনামধন্য ছিলেন। প্রথমে নিজ নিজ উদ্যোগে জমি কিনিলেও পরে নবগ্রাম কলোনির অংশরূপে উহা গৃহীত হয়।

'বিধানপল্লী'-বড় বহেড়া সদ্‌গোপ পাড়ার সন্নিহিত অঞ্চলের 'কোলের ডাঙা' অঞ্চলের জমিতেই গড়ে ওঠে। ক্ষিতীশ কর নামে জনৈক ভদ্রলোক প্রথমে জমি কেনেন এবং একটি স্বতন্ত্র বসতি স্থাপনের জন্য যত্নবান হন। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলটিকে ''কর কলোনী'ও বলা হত। ক্ষিতীশবাবু নবগ্রাম কলোনীর সঙ্গে এর দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং পৃথক নামকরণ করেন 'বিধানপল্লী' (১৯৬২)।

ক্রমশঃ আরও অনেক পরিবার আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলেও নবগ্রামের বিস্তার ঘটে। নবগ্রামের জনবসতি পশ্চিমে কাঁটাপুকুর ও বোসপুকুর এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই অঞ্চলটি বর্তমানে 'বারুজীবী' নামে পরিচিত। ১৯৪৮ সালে ২৯শে মার্চ এক সভায় সমবায় সমিতি গঠন করে সিদ্ধান্ত হয় কোন্নগর, বড়ো বহেড়া ও খোর্দ বহেড়ায় জমি কিনে বসতি স্থাপনের কাজ করা হইবে এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়, "The Nabagram Co-operative Colony"। গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র চন্দ, অবনী আচার্য, জিতেন্দ্রনাথ দাস, প্রফুল্লরঞ্জন দাস, শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সত্যরঞ্জন চৌধুরী, প্রবোধরঞ্জন গুহ, মণীন্দ্রকুমার মজুমদার, অমূল্যকুমার সরকার, পবিত্রকুমার মজুমদার, সত্যভূষণ ব্যানার্জী, নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, সত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন সেন, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, রত্নেশ্বর ভট্টচার্য ও নীহারবালা ধর প্রমুখ এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই

সময়েই অন্যতম স্বাক্ষরদাতা নবগ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী, আইনজ্ঞ অমূল্যকুমার সরকার এই কলোনির নাম দেন 'নবগ্রাম'।

কিন্তু কাজের শুরুতেই ১৯৪৮-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে এক সংবাদ প্রকাশ হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "The Civil and Post and Telegraphs Accounts Co-operative Land Mortgage and Housing Society Ltd."-এর অনুকূলে বড় বহেড়া—খোর্দ্দবহেড়া—কোন্নগর মৌজা তিনটি হুকুম দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।" নবগ্রাম কলোনির সমস্ত জমি এই রিকুজিশানের আওতায় পড়বে। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা বা পুনর্বাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন; উপরন্তু যে সকল বাস্তুত্যাগী নিজেদের চেষ্টায় ও অপরিমিত অর্থব্যয়ে এক টুক্‌রো ভূমি সংগ্রহ করে একটি নীড় বেঁধেছেন তাঁহাদের আবার বাস্তুহারায় পরিণত করার আযোজন। সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হল, সামিল হলেন নবগ্রামের পক্ষ থেকে "East Bengal Refugee Asssociation" আর স্থানীয় ১৫০ ঘর চাষী পরিবার, যাঁরা পুরুষানুক্রমে এইখানকার বাসিন্দা এবং যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় নবগ্রামের পত্তন সম্ভব হয়েছে। জাতির জনক মহাত্মাজির অমর বাণী "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" আমরা স্মরণ করলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে"।

তিনি আরও বলেছেন—"এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া আমরা সর্বশক্তি নিয়া দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের শক্তির উৎস ছিল আমাদের সদস্যগণ। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাস হইতে অদ্য (১৯৫১) পর্যন্ত নবগ্রাম কলোনির প্রতিটি সদস্য বা অধিবাসী কলোনির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আস্থা স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক দরদ দিয়া কলোনিকে গঠন করিয়া চলিয়াছেন। এই কলোনি সংগঠনে ব্যক্তি হিসাবে কে কতটুকু পরিশ্রম করিয়াছেন বা কাহার দান কতটুকু সে প্রশ্ন বা বিচারের অবকাশ নাই—এই কথাই সত্য যে সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদ ও সময়ের আহ্বানে এবং সমবায়ের স্পৃহায় উহা উত্তরোত্তর উঠিতেছে—যদিও কার্য পরিচালনার জন্য একটি কর্ম পরিষদ আছে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা নূতন সমাজ সৃষ্টির পথে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছি। নূতন দেশে, পরিবেশে, নূতন নূতন বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইতেছে—পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। আমাদের যাত্রাপ্রথে আমরা দুজন পরম সুহৃদ ও বন্ধু পাইয়াছি যাঁহাদের আন্তরিকতা আমাদের কর্মে প্রেরণা যোগাইয়াছে

অনেকখানি—যাঁহাদের সহযোগিতা পথের বাধা অতিক্রম করিতে সাহায্য করিয়াছে বহুলাংশে। শ্রীরামপুর পুনর্বাসন কর্মকতা ধীরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং সমবায় সমিতি-সমূহের ইনসপেক্টর সুকুমার লাহিড়ীর কথাই আমি বলিতেছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমাদের সহযোগিতা করিয়াছেন বড় বহেড়া গ্রামের কানাইলাল ঘোষ, ছোট বহেড়া গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ দাস ও চরণ কাঁড়ার। তাঁহাদের প্রীতি ও আস্থা আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে সোসাইটির অকৃত্রিম সুহৃদ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কোন্নগরবাসী মুরারি মিত্র লিখিয়াছেন—"ঁগিরীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র চন্দ মহাশয়রা যখন উপরিউক্ত সমবায় সমিতি গঠন করে রেল লাইনের পশ্চিমে এবং নৈটি রোডের উত্তরে ছোট বহেড়া ও বড় বহেড়া গ্রামের বসতিহীন জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা উন্নয়ন করে কলোনি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করেন তখন প্রথমেই পর্বত প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হন। তাঁরা জানতে পারেন Post & Telegraph Dept. Co-operative Society নামে একটি সমবায় সমিতি ঐ একই এলাকায় তাদের সদস্যদের জন্য আবাসন কলোনি করতে চায়। গিরীনবাবুদের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম কারণ কেন্দ্রীয় সরকারি ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীগণের জন্য প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্প রাজ্য সরকারের আশ্বাস পাওয়ায় তারা কোনও প্রকার বোঝাপড়া বা সমন্বয়ে রাজি নয়। এ সময়ে গিরীনবাবুরা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁরা কানাইপুরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জমিদার রোহিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (রামবাবু) সঙ্গে দেখা করে এই অপ্রত্যাশিত বাধা অপসারণের জন্য সাহায্যের অনুরোধ করেন।

১৯৪৮ সালের শেষ দিকে একদিন শ্রীমান সত্যনারায়ণ মারফত রামবাবু ডেকে পাঠালেন। শ্রীমান সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য তখন আমাদের একজন বিশিষ্ট কর্মী। এম. এ. পাশ করে আইন পড়ছে, খাদ্য বিভাগে সামান্য কর্মরত (পরবর্তী জীবনে জেলা ও দায়রাজজ হয়েছেন) তখন কানাইপুর এলাকার উন্নয়নের জন্য নানা জনহিতকর উদ্যোগে এবং কানাইপুর সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির কাজে বিশেষভাবে যুক্ত। রামবাবুর নেতৃত্বে তাঁর বাড়িতেই ওদের কর্মকেন্দ্র। রামবাবুর কাছে সব শুনলাম। সত্যনারায়ণ বলল স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে গিরীনবাবুদের সঙ্গে নানা বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জনসংখ্যার অভাব গ্রামোন্নয়নের কাজে যে বিরাট অন্তরায়, তা সত্যনারায়ণরা তখন নিজেরাই বিশেষভাবে অনুভব করছে। যাঁরা বসবাসের জন্য আসছেন,

তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা দরকার। এলাকার উন্নয়ন হলে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে স্থানীয় অধিবাসীরাও উপকৃত হবেন। ডাক ও তার বিভাগীয় কর্মচারীদের সমবায় প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে নবগ্রাম সমবায় সমিতির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত বলে আলোচনায় স্থির হল কারণ Post & Tel. বিভাগ যা করবে তা শুধু তাদের কর্মচারীদের জন্য, যারা নানা স্থান থেকে কর্মোপলক্ষ্যে এখানে একত্রিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটি একই জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ করে দেশ বিভাগের ফলে বিড়ম্বিত মানুষের জন্য তাঁরা বসতি স্থাপন করতে চান, তাঁরা চিরকাল এখানেই বসবাস করবেন। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে যার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। সুতরাং স্থির হল 'নবগ্রাম সমবায় সমিতি'র পক্ষে-জনমত গঠন করতে হবে এবং সরকারের কাছে সেইমত দাবী জানাতে হবে। জনমত গঠনের প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে এ ব্যাপারে ছোটখাট বিরোধিতা, ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব, অমূলক আশঙ্কাজনিত অপপ্রচার ছিল। এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ঠিক হয় জনসভা করা হবে। ছোট বহেড়া, বড় বহেড়া, ন'পাড়া, কানাইপুর এবং এদিকে কোন্নগরের মানুষ সর্বদল নির্বিশেষে কোন্নগর রেল লাইনের পূর্বদিকে সুরেন্দ্রনাথ বাগের দোকানের পাশে খোলা জায়গায়, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় (যেখানে এখন সুপার মার্কেট, রিক্সা স্ট্যান্ড) এক জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রচুর জনসমাগমের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রোহিণীবাবুর সভাপতিত্বে সভা হয়। তখন কমিউনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় সব দল নিয়ে মাইক সহযোগে উন্মুক্ত স্থানে সভা করা সহজ ছিল না। বিশেষত যে সভায় Post & Tel Co-operative কে প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য সরকারী কাজের সমালোচনা করা হবে। জনগণের সমর্থনপুষ্ট নবগ্রাম কো-অপারেটিভকে সরকার যাতে সকল প্রকার সাহায্য করেন সেই মর্মে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৫৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই প্রস্তাব সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। ঐ প্রস্তাবের অনুলিপি রামবাবু এবং নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কর্তৃপক্ষ হুগলী জেলার নেতা ও মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে ব্যক্তিগতভাবে দিয়ে আসেন। এইভাবে সুপরিকল্পিত আন্দোলন ও চেষ্টার ফলে Post & Telegraph Co-operative Societyর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। নবগ্রাম সর্বার্থসাধক আবাসন সমবায় সমিতির কাজে সকল বাধা ও অন্তরায় দূরীভূত হয়।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য হুগলী জেলা কংগ্রেসের নেতা শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং যুগান্তর পত্রিকার

সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গা কটন মিলের মালিক গোপাল চৌধুরী, ছোট বহেড়ার মানিকচন্দ্র বাগ প্রমুখের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

তারপর শুরু হয় গিরীনবাবুদের কলোনি গড়ার কর্মযজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে সমবায় সমিতির সম্পাদকের ১৯৯২ সালের সম্পাদকীয় বিবৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ—

"গত ২৭ বৎসরে আমাদের এই সমবায় সমিতির, কার্যকরী সমিতির সভ্য হিসাবে সমবায় সমিতির উন্নতিকল্পে কঠোর পরিশ্রম যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের ছেড়ে পরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁদের তাই আজ সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করছি।"

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সভ্যদের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, চন্দ্রভূষণ ভট্ট, জিতেন্দ্রনাথ কুশারী, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ভট্টাচার্য্য, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দাস, মণীন্দ্র মজুমদার, প্রবোধরঞ্জন গুহ, হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, জীবনকৃষ্ণ সরকার, প্রফুল্লরঞ্জন দাস, অমূল্যকুমার সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, সুরেশচন্দ্র সাহা, ননীগোপাল পোদ্দার, সুনির্মল মজুমদার, প্রমথরঞ্জন সরকাব, রমণীমোহন নাগ, সত্যরঞ্জন আম্বুলী, ষোড়শীরঞ্জন দে চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র দে চৌধুরী, মৃগাঙ্কপ্রসাদ গুহ, মনোতোষ চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র চন্দ, শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

সমিতির কার্য্যকরী সমিতির বাইরে থেকেও নবগ্রামের উন্নতিকল্পে যে সব সাধারণ সভ্য অবিরাম কাজ করেছেন, তাঁদেরও অনেকেই আমাদের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরকেও আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। স্মরণ করি প্রয়াত প্রিয়মোহন চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, যামিনীকান্ত ঘোষাল, গোপালচন্দ্র দাস, গোবিন্দনারায়ণ রায়, অক্ষয়কুমার দেবনাথ, প্রমোদরঞ্জন চ্যাটার্জী, অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্রনাথ চন্দ, জিতেন্দ্রনাথ দাস (বি-ব্লক), প্রফুল্লকুমার দে, অধীরচন্দ্র দে, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নলিনীমোহন দাস প্রমুখদের। এছাড়া অনেক সভ্য বিভিন্নভাবে সমিতির উন্নতিমূলক কাজে সাহায্য করেছেন, এখন আমাদের ছেড়ে পরলোকে আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাঁদের প্রয়াণের কথা আমাদের কাছে পৌঁছে নাই বা আমাদের স্মরণে আসছে না, তাঁদেরও আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ দীর্ঘদিন অর্থাৎ ২৮/২/৬৫ সালের পর এই সমবায় সমিতির সভ্য/সভ্যাদের সাথে এক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ হওয়ায় আমরা আনন্দ বোধ করছি।

সমবায় আইন অনুযায়ী প্রতি বৎসর অনূর্ধ্ব ১৫ মাসের মধ্যে একবার সাধারণ সভা হওয়া বিধেয়। কিন্তু সেই সভা ২১/৮/১৯৬৬ — ১৯৯২ সন পর্যন্ত কেন হতে পারেনি সমবায়ী সভ্যদের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

দীর্ঘদিন যাবৎ এই ধরনের বিভিন্নমুখী সমবায় সমিতি যা হুগলী জেলায় কেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম সেই সমিতির সাধারণ সভা কেন হয়নি তার দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে গেলে হুগলী জেলার সমবায় সমিতিসমূহের Asstt Registrar, ও তাঁর সহকর্মীদের সাথে সাথে এই সমিতির সভ্যদের ব্যর্থতার কথাও স্বীকার করতে হবে।

এতদিন অর্থাৎ ১১/৮/৬৬ সন থেকে ১৯৯১-১৯৯২ সন পর্যন্ত কেন এই সমবায় সমিতির সাধারণ সভা হতে বিলম্ব হয়েছে সে বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন আছে একথা স্বীকার করেই আপনাদের মত সাধারণ সভ্যদের সচেতন থাকতে হবে যাতে এ ধরনের আইনের অপব্যবহার ও সমবায় দপ্তরের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব এড়িয়ে-চলার-মনোবৃত্তি ভবিষ্যতে না ঘটে।

১৯৬৬ সনের ২১/৮/৬৬ তারিখে এই সমিতির সভার দিন ধার্য হয়েছিল। সভা পরিচালনার জন্য আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল অনেক অর্থব্যয়ে। কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে এই সমিতির কিছু সভ্যের আবেদনে মাননীয় হাইকোর্টের ১৯/৮/৬৬ তাং আদেশবলে উক্ত তারিখে সাধারণ সভা বন্ধ হ'য়ে যায় এবং আরও কিছু সভ্য দ্বিতীয়বার অন্য একটি আদেশ মাননীয় হাইকোর্ট থেকে আনেন যার বলে সমিতির সমস্ত দৈনন্দিন কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্য বাধ্য হয়ে তদানীন্তন কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক মহাশয় মহামান্য হাইকোর্টের নিকট উপরোক্ত আদেশ বাতিলের জন্য উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করেন। মহামান্য হাইকোর্ট সোসাইটির বক্তব্য খুবই ন্যায়সঙ্গত মনে করে পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেন এবং দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য আদেশ দেন। ঐ আদেশের বলে সোসাইটির কাজ পুনরায় চলতে থাকে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি হুগলী জিলার সমবায় বিভাগের Asstt Registrar কে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ কোর্টের আদেশ বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত করেন ও যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।

যে সব সভ্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাৎসরিক সভাকে বানচাল করার জন্য ও সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য, পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই নিশ্চেষ্ট হলেন এবং যে মোকদ্দমা হাইকোর্টে দায়ের করেছিলেন তার প্রতিকার

বা পরিচালনার জন্য কোর্টে হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকেন। সোসাইটির যে ক্ষতি হবার তা হয়ে গেল। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ পুনরায় সাধারণ সভা করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেও কোন সুব্যবস্থা করতে পারলেন না। অন্যদিকে ১৮ মাস অতিবাহিত হলে সরকারের অনুমতি ভিন্ন সাধারণ সভা আহ্বান করা আইন বিরুদ্ধ।

সোসাইটির কর্তৃপক্ষ হুগলী জিলার তদানীন্তন Asstt Registrar কে সত্বর সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য ২৪/৯/৬৯ তারিখের এক চিঠিতে অনুরোধ করেন। বহুদিন যাতায়াত ও বহু চিঠিপত্র লেখার পর হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের Asstt Registrar ১৩/৬/৭০ তারিখে এই Society-র লেখা চিঠি সহ সমবায়সমিতিসমূহের Registrar-কে এক চিঠি দিলেন। এদিকে এই সোসাইটি থেকে ক্রমান্বয়ে হুগলী জেলার Asstt Registrar-কে ১২/৫/৭১ থেকে ১৪/১২/৭৭ তারিখ পর্যন্ত প্রচুর চিঠি দেওয়ার পর ১৪/১২/৭৭ তারিখের চিঠির উত্তরে ৪/২/৭৮ কিছু তথ্য Assti Registrar জানতে চাইলেন। যথা (1) Date of last Annual General Meeting (2) Name and address of the Society (3) Reason for not holding the General Meeting within 15/18 month। উক্ত চিঠির উত্তরে Society ২৫/২/৭৮ তাং Asstt Registrar-কে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সোসাইটির এই চিঠির কোন উত্তর না দিয়ে ২৯/৩/৭৮, ২১/৫/৭৮ এবং ৪/৭/৭৮ তারিখে Asstt Registrar-এর নির্দেশে Co-operative Inspector এনকোয়ারীতে আসেন এবং যথাযথ এনকোয়ারী হয়। কিন্তু কোনো এনকোয়ারী রিপোর্ট সোসাইটিকে জানানো হয় না। অপর দিকে হঠাৎ ২/৮/৭৮ তাং Asstt Secretary, Govt. of West Bengal (memo No. 3133-Co-op/14c-1/78) সোসাইটিকে এ্যানুয়েল জেনারেল মিটিং করার জন্য নির্দেশ দেন এবং যথাযথ ভাবে Society থেকে Asstt. Registrar, Hooghly মহাশয়কে ৩০/৮/৭৮ তাং Annual General Meeting করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইতিমধ্যে পুনরায় Enquiry করার জন্য Co-opt-office হুগলী থেকে Co-opt-Development Officer Society-তে আসেন এবং ১৬/১০/৭৮ এবং ২০/১০/৭৮ তারিখ সমূহে Enquiry করেন। ঐ Enquiry করার পর এই Society থেকে পূর্ববর্ত্তী এবং পরবর্তী Enquiry Report এর Copy-র জন্য ২৮/৯/৭৮, ৬/১১/৭৮ ও ১৯/১১/৭৮ তাং চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন Enquiry Report-এর Copy পাওয়া গেল না। হঠাৎ ARCS, Hooghly ২৪/১১/৭৮ ও ৬/১২/৭৮ তাং Society-কে চিঠি দিলেন

Annual General Meeting-এর date fix করার জন্য। Society থেকে AGM-এর date ২৫/৩/৭৯ ঠিক করে ২৬/১২/৭৮ তারিখে Asstt. Registrar-কে চিঠি দেওয়া হল। কিন্তু AGM এর date অনুমোদন না করে ২৪/১/৭৯ ও ৯/২/৭৯ তাং পুনরায় Enquiry করার জন্য Asstt. Registrar, Hooghly একজন Co-oprative Development Officer-কে পাঠালেন এবং যথারীতি ঐ Enquiry Reportও পাওয়া গেল না। Society থেকে পুনরায় AGM-এর তারিখ অনুমোদন করার জন্য গত ২৭/২/৭৯ এবং ৩/৪/৭৯ A.R.C.S.-কে স্মারক পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু A.R.C.S. ঐ পত্রের কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ একজন Inspector-কে Spl Officer নিয়োগ করে এই Society-র দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য পাঠালেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যখনই কোন Enquiry করা হয় তার পর সেই Enquiry-র report পাঠিয়ে তার কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং তার উত্তর যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলেই কেবল ARCS আইন মোতাবেক Special Officer নিয়োগ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কোন Explanation না চেয়েই উক্ত Special Officer appointment করা হয়। এই কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে মাননীয় High Court-এর নিকট বিস্তারিত জানিয়ে সুবিচারের আবেদন করেছিলেন ২৪/৪/৭৯ তারিখে। সোসাইটির ন্যায্য যুক্তিতে High Court-এ আবেদন করায় শ্রদ্ধেয় বিচারপতি Asstt. Registrar, Hooghly-র আদেশনামা স্থগিত রাখলেন এবং পূর্ণ বিচার না হওয়া পর্যন্ত Society-কে সমস্ত কাজ চালিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ একবার উপস্থিত হওয়ার পর আর Court-এ হাজির হননি। এরপর সোসাইটি Election করার জন্য Court-এ আবেদন জানান। Hon'ble Court গত ৩/৯/৮৪ তাং Sri. N. C. Saha, Advocate-কে SPL Officer নিয়োগ করে Election as per Act and Rules করার জন্য আদেশ দিলেন। ঐ আদেশে আরও উল্লেখ ছিল ARCS Co-opt. Societies যে Inspector-কে Spl. Officer নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন তিনি ও Society-র Board of Directors একত্রে মাননীয় N.C. Saha, Advocate. Spl. officer-এর তত্ত্বাবধানে কাজ চালাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত আদেশের পর ARCS, Hooghly কোন Inspector কে Society-তে পাঠাননি এবং সাধারণ সভা করার জন্য সরকারের কাছে আইন অনুযায়ী সুপারিশে বিলম্ব করায় Sri. N.C. Saha, Advocate, Spl. Officer সাধারণ সভা ও নির্বাচনের

জন্য কোন নির্দেশ দিতে পারেননি। Spl. Officer Govt. order পাওয়ার জন্য Asstt. Registrar, Co-opt. Society-কে অনেক চিঠি দিয়ে অনুরোধ করার পর দীর্ঘ এতদিন বাদে General Meeting করার অনুমতি Asstt. Secretary Govt. of West Bengal-এর কাছ থেকে পাওয়ার পর ২০/১২/৯২ তাং General Meeting হয়। এরপর নিয়মানুসারে বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টর নির্বাচিত এবং পরিচালক সমিতি গঠন করে কার্য পরিচালিত হচ্ছে। চতুর্দশ পরিচালক সমিতি (২০০৫—২০০৮) সাল-এর কার্য পরিচালনার দায়িত্বে আছেন।

৬০ বছরের মধ্যে কত কি পরিবর্তন ঘটেছে—এককালে ইউনিয়ন বোর্ডের সীমিত ক্ষমতায় উন্নয়নের কাজে মুখ্য ভূমিকা নিতে হয়েছিল সোসাইটিকে আর আজ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে—অর্থের যোগান এসেছে সরকারী আনুকূল্যে—রূপায়িত হয়েছে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি। সোসাইটির প্রাথমিক কাজ জমি কেনাবেচার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে—জমি এখন বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সোসাইটি কিন্তু আজও চলার পথে এগিয়ে চলেছে, শুধু পরিবর্তিত হয়েছে তার কাজের ধারা। আজ তাই জমি, বাড়ি, পথ সংক্রান্ত সমস্যা মেটানো—জনমানসে সুস্থ সাংস্কৃতিক রুচি নির্মাণে সহায়ক হিসাবে কাজ করে চলেছে। পরিবেশ দিবস, বিভিন্ন মহাপুরুষদের জন্ম দিবস পালন করে মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা—সোসাইটির অসমাপ্ত কাজগুলি পূর্ণাঙ্গ করার ব্রতে ব্রতী হয়েছে।

বর্তমানে সোসাইটির মালিকানায় পুকুর, দীঘি, সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর যা সম্পত্তি আছে তার আয়ে সোসাইটির দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং রক্ষণাবেক্ষণ, জনহিতকর কিছু কর্মসূচি রূপায়িত করা হয়। সমবায় সমিতির বিধি অনুসারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, কার্যধারার রিপোর্ট যথারীতি উপস্থাপন করা হয়। সভ্যদের ভোটে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নির্বাচিত হন। বর্তমান উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ঃ

(১) সভ্যদের বিভিন্ন সমস্যা (জমি সংক্রান্ত, পথঘাট) সমাধানে অভিভাবকদের ভূমিকা পালন করে।

(২) ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান।

(৩) সর্বোপরি সোসাইটি তথা সমগ্র নবগ্রামবাসীর কার্যকে যথাযথ বজায়

রাখার জন্য যে কোন সমস্যা সমাধানে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। ঝিল সংস্কার সাধন করে পরিবেশকে সুন্দর করে তোলা হয়েছে।

(৪) পূর্বসূরীদের স্বপ্নকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সম্পূর্ণ করাই এখন পরিচালন সমিতির ব্রত।

(৫) নবগ্রাম গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদন উন্নয়ন এবং পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ রূপ দেওয়ার যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তা বর্তমান পরিচালন সমিতির প্রচেষ্টায় পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে চলেছে।

"১৯৪৮ সালের শীতের এক সন্ধ্যায় বর্তমান 'নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের' সম্ভাবনা বুকে নিয়ে যে চালা ঘরটি দাঁড়িয়েছিল, তারই পেছনে সুকুমার কান্তি যে যুবকটি একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স থেকে অতি সন্তর্পণে বহু পাণিপীড়নে কাতর কয়েকটি বই হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে 'লাইব্রেরীর সভ্যদের' বিলি করছিল সে কি আজ নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘের প্রায় ৫৫০০ পুস্তক সম্বলিত নিয়ন আলোয় উদ্ভাসিত পাঠাগারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আনন্দিত বিস্ময়ে বিড় বিড় করে না? সেই কেরোসিন কাঠের বাক্স বন্ধ লাইব্রেরীর মসীলিপ্ত প্রথম হ্যারিকেনটির নম্র আলোতে এতো আলো জমা ছিল—অতীতের সেই দিনটিতে কে তা ভাবতে পেরেছিল।"

দেবব্রত সুর চৌধুরী

জমি ক্রয়-বিক্রয়

জমি ক্রয়বিক্রয় ছিল সমিতির একমাত্র অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। জমি বিক্রয়ের অর্জিত অর্থের উপর মূলত নবগ্রামের সমৃদ্ধি নির্ভর করত। তৈরি হয়েছিল বিদ্যাপীঠ, বালিকা বিদ্যালয় ও ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল, চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ঘর, সকলের আমোদ প্রমোদের জন্য পৌরভবন, সমবায় সমিতির অফিস ঘর, পোস্ট অফিসের জন্য ঘর এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বা ধর্মানুরাগীদের জন্য হরিসভা।

১৯৭৮-৭৯ সনের পর থেকে জমি ক্রয়-বিক্রয় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ জমির দাম হঠাৎ এত বেশী হয়ে যায় যে মধ্যবিত্তদের বেশী দামে জমি ক্রয় করে বসবাস করা সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়। সে জন্য সোসাইটিও জমি কেনাবেচা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

জমি কেনাবেচা প্রধানত অর্থোপার্জনের জন্য হলেও সেটা একমাত্র কারণ ছিল না। এই সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা ও সাধারণ মধ্যবিত্তদের জন্য জমির ব্যবস্থা করে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়াও ছিল অন্যতম কারণ। জমির দাম সোসাইটির কেনাবেচার নাগালের বাইরে হয়ে যাওয়ায় বিচ্ছিন্ন ভাবে জমি কেনাবেচা হতে থাকল এবং জমির দাম হু হু করে বাড়তে থাকল। জমি কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গেলেও এই সমিতিকে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনার জন্য, অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে সমিতিকে রক্ষা করার পরিকল্পনার ফলশ্রুতি 'নবগ্রাম জুবিলি মার্ট' (১৯৭৫)।

এই সমিতির সভ্য, সভ্যা সকলেই জানেন যে জমি সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের গৃহ নির্মাণ ও বসবাসের জন্য। কিন্তু সমিতির বিনা অনুমতিতে বিক্রয়ের জন্য নয়। এ বিষয়ে সকলেই জমি বিক্রয়ে সোসাইটির Bye Law মেনে চলতে বাধ্য।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বাড়ী বা জমি যাঁরা সোসাইটির কাছ থেকে কিনেছেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সভ্য বিক্রয়ের জন্য সোসাইটির অনুমোদনের জন্য আবেদন করলেও কেউ কেউ সোসাইটিকে না জানিয়ে অন্যত্র জমি বিক্রি করেছেন। এই বিক্রয় Co-operative Society Act 85 (9) ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ অবৈধ।

সভ্যদের কাছে আমরা আবেদন করি যে, কোন অবস্থাতেই সোসাইটির অনুমতি ছাড়া জমি ও বাড়ি বিক্রয় করবেন না এবং কোনো সভ্য বা সভ্যাকে অবৈধভাবে বিক্রয় করার জন্য প্ররোচিত করবেন না।

জলনিকাশের ব্যবস্থা

নবগ্রামের জলনিকাশের জন্য ১৯৭১ সনের ২১শে মে সি.এম.ডি-র কাছে এই সোসাইটি থেকে আবেদন করা হয়। বর্ষার সময় শুধু নবগ্রামের নয় রিষড়া, কানাইপুরের জল সবই নবগ্রাম স্টেশন রোডে জমে। সেজন্য সমস্ত নবগ্রামের অধিবাসীদের খুবই অসুবিধা হয়ে থাকে, এবৎসরও হয়েছে। তাই এই সোসাইটি থেকে একটা ম্যাপ তৈরী করা হয়, যাতে এতদঞ্চলের জল গঙ্গার জলের সাথে মিশে যায় সেজন্য সি.এম.ডি.এ-কে একটা ম্যাপ দেওয়া হয়েছিল। সেই স্কিম অনুযায়ী নিকাশি ব্যবস্থার জন্য সি.এম.ডি.এ-র তরফে কাজ আরম্ভ করা হয়। এই জল যাতে কোন্নগর বেসিন ড্রেনেজ স্কিম (এস. ডি. ২৪-এর অন্তর্ভুক্ত হয় সেজন্য সোসাইটি চেষ্টা চালাতে থাকে—এই সোসাইটি সি.এম.ডি.এ-কে যে স্কিম দিয়েছিল সেই অনুযায়ী কাজ এগোতে থাকে। সি.এম.ডি.এ-র তরফ থেকে ১৬/১১/৭৭ তারিখে যথারীতি জয়েন্ট ইনস্‌পেকশন করা হয়। C.M.D.A-এর Office (9A B.B.D Bag) থেকে ২৪/২/৭৮ তাং এক চিঠিতে এই Society-কে জানানো হয় যে "Scheme is under preparation by our Planning circle. As soon as the scheme is prepaired the matter will be intimated to you".

জুবিলি মার্ট

এই সমিতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতি অব্যাহত রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই নবগ্রামের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জুবিলি উৎসবের সময় এই জুবিলি মার্টের জন্ম। জুবিলি মার্ট তৈরী করার উদ্দেশ্য শুধু সমিতির অর্থ-সংগ্রহই নয়, কিছু বেকারের অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করাও। বর্তমানে জুবিলি মার্ট বহু যুবক-যুবতী ও গৃহবধূদের অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

এই জুবিলি মার্ট তৈরী করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল বা এখনও প্রয়োজন আছে। সমিতির কোনো সভ্য সভ্যাদের উপর চাপ না দিয়ে বা তাদের উপর অতিরিক্ত অর্থের বোঝা না চাপিয়ে এই জুবিলি মার্টের কাজ এগিয়ে চলেছে। যে বিপুল অর্থের বিনিময়ে এই জুবিলি মার্ট তৈরি হয়েছে সেই অর্থের কিয়দংশ সংগ্রহ করা হয়েছে দোকান ঘর গ্রাহকদের সহযোগিতায়। শুধু দোকান ঘর গ্রহণকারীদের সহযোগিতাতেই এই জুবিলি মার্ট তৈরী করা সম্ভব হয়নি,

অতিরিক্ত টাকা সোসাইটির নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ থেকে ব্যয় হয়েছে। বহু কষ্ট করে, ধৈর্য রেখে এবং বাধা অতিক্রম করে সৃষ্টি হয়েছে এই জুবিলি মার্ট। এখনও বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

এই জুবিলি মার্টে দোকান ঘর ছাড়াও সভ্যদের ও জনসাধারণের ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ পাওয়ার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র নবগ্রাম শাখা এখানে আনতে পারা গেছে।

অগ্রগতির ঝুঁকি নেওয়া ও রক্ষা করা খুবই দুঃসাহসিক। এই জুবিলি মার্টের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সোসাইটি প্রচুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল বলেই নবগ্রামের বহু পরিবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই মার্টের কাজ এখনও শেষ করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে এর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হবেই।

জুবিলি মার্টের প্রথম পরিকল্পনার জন্য আমরা চিরদিন স্মরণ রাখব সমিতির প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে।

প্রসঙ্গক্রমে সভ্যদের জানাতে চাই যে যত অপপ্রচারই হোক না কেন জুবিলি মার্ট তৈরী হওয়াতে নবগ্রামের সার্বিক উন্নতি হয়েছেই এবং জল নিকাশেরও কোন অসুবিধা হয়নি। অপপ্রচার থাকবেই। অপপ্রচারকে গুরুত্ব দিলে সোসাইটির উন্নতি ব্যাহত হবে।

সেকালের রাস্তাঘাট

ডাক্তার তারাপদ চৌধুরীর ডিসপেনসারির ডানদিকে ছিল টিনের চাল দেওয়া দু-একটি দোকান। ডানদিকে কোন রাস্তা ছিল না। সুরেন্দ্র বাজারের আকার ছিল খুবই ছোট। বাজারে ঢুকেই বামদিকে ছিল শিবচন্দ্র দাসের মুদির দোকান। সুরেন দাসের দোকান ঘরসহ দোতলা বাড়ীকে ডান দিকে রেখে কিছুটা এগোলেই ছিল অধুনা স্টেশন রোড, যা তখন ছিল পায়ে চলা পথ মাত্র। এই রাস্তা বিস্তৃত ছিল একেবারে রেললাইন পর্যন্ত। বাঁদিকে এগোলে চোখে পড়ত বর্তমানের শ্যামাপ্রসাদ রোডের মোড়। বাঁ দিকে আর কোন রাস্তা ছিল না। একটু পরেই ঘন বাঁশবন আর উঁচু জমিতে পাকা বাঁশের তলা দিকে একটা ছোট পায়ে চলা পথ যা পরে পানের বরজে পরিণত হয়। পরবর্তী সময়ে তা সেবক সংঘের জমি বাড়ীতে রূপান্তরিত হয়েছে। উঁচু জমিতে কয়েক পা পশ্চিমে এগুলে একটা ছোট ডোবা ছিল। এরপর নবগ্রামে নতুন মানুষদের জমি। জগবন্ধু ব্যানার্জী মশাই-এর ইটের ঘর তখন তৈরী হয়েছে। ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকে বাড়ি, বাঁদিকে বাড়ি—এই দুয়ের মাঝখান দিয়ে কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়ির উত্তর সীমানা ঘেঁষে ওই পায়ে চলা পথ একটি ছোট সাঁকো পেরিয়ে বর্তমান 'আদিবর্ত্ম'। তখন আদিবর্ত্মের সীমানা রেললাইন স্পর্শ করার আদৌ সম্ভাবনাই ছিল না। এই ভাষাচিত্র হল ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের। আদিবর্ত্মের আরম্ভ থেকে নবগ্রামের পশ্চিমাংশ থেকে পূর্বাংশে এইটুকু পর্যন্ত পৌঁছতেই প্রায় ২ বছর কেটে যায়। এই আদিবর্ত্মেরই আরম্ভের অংশটি পশ্চিমভাগে একমাত্র বড়বহেড়া গ্রামের চওড়া রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত।

আদিবর্ত্মের প্রথমেই সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিনের বাড়ি। দু নম্বর ওপারের পাইন বাড়ি। এভাবেই রাস্তাটা এগিয়ে চলেছে। ডানদিকে বাঁদিকে একটি দুটি গলি। এই ছিল প্রথম দিক্কার নবগ্রাম। মাঝামাঝি স্থানে বর্তমান রেডক্রশ। ডানদিকে কোন রাস্তা নেই। বাঁদিকে একটা ছোট গলিপথ। এই গলিপথেই প্রবোধরঞ্জন গুহের টিনের দোতলা বাড়ি। এই গলিপথটা পরে চওড়া হয়, দক্ষিণ উত্তরে লম্বা-চওড়া বিদ্যাসাগর রোড। রেডক্রশ বাড়ির আগের মালিকানা ছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীদের পরিবারের। পরে পারিবারিক কারণে জমি সোসাইটির হাতে এসে যায়। পরবর্তীকালে চক্রবর্তীরা নবগ্রামেরই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাসস্থান তৈরী করে। সোসাইটি জমির মালিকানা পেলে নতুন ব্যবস্থায় গলিপথ চওড়া করার ব্যবস্থা হয়। জ্ঞান বাবুদের ইটের বাড়িতে স্থাপিত

হয় কো-অপারেটিভ স্টোর, রেশন শপ, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এবং রেডক্রশ। পূর্বাংশের খালি জমি বিক্রি হয়। সেখানে বাড়ি করেন কুসুমরঞ্জন দাস। এই রেডক্রশের মাথাতেই নবগ্রামের প্রথম সন্ধ্যাকালীন কেরোসিন ল্যাম্পের আলো জ্বলে। এর প্রধান স্থপতি ছিলেন সত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (লক্ষ্মণ ঠাকুর)।

আদিবর্ত্মের এই পথ ধরেই নবগ্রামে এসেছিলেন তখনকার খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তখন থেকে রেশন ব্যবস্থা শুরু হয় নবগ্রামে।

রাস্তার নামকরণে হাত দিয়ে সোসাইটি প্রথম আদিবর্ত্ম নামে চিহ্নিত করলেন এই রাস্তাটিকে। একটা 'দ'-এর মতন আকারে রাস্তাটি নবগ্রামের পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্তে রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। লক্ষণীয় যে এই রাস্তাটি মোটামুটি চওড়া। তুলনামূলকভাবে পরের রাস্তাগুলি যেমন বিবেকানন্দ রোড, হরিসভা রোড, বাঘাযতীন রোড চওড়া কম। জমি কেনা হয় ক্রমে ক্রমে। পরে বিক্রি হয়। নতুন বাড়ি হয়। সব জায়গায় রাস্তা বড় করার মতন উপায় রইল না। এ ব্যাপারে যাদের পক্ষে রাস্তা বড় করার জন্য বাড়তি জমি দেওয়া সম্ভব তারা এগিয়ে না এলে এ সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়। জি.টি. রোড থেকে কোন্নগরে ক্রাইপার রোডে ঢোকার মুখে এই সমস্যা আজও রয়ে গেছে।

সুরেন্দ্র বাজারের বিপরীতে কয়েকটি কারখানা ছিল। বেশ উঁচু পাঁচিল, প্রশস্ত প্রবেশদ্বার, রঙকল, বেল্টিংকল, কাচকল প্রভৃতি ছিল। ঠিক এই গেটের উল্টোদিকে একটা কাঁচা বড় রাস্তা চোখে পড়ে। বাজারের গা ঘেঁষে একটু বেঁকে কাঁচা চওড়া রাস্তাটি এসে মিশেছে নবগ্রাম বি-ব্লকের দেশবন্ধু রোডের সঙ্গে। এর দু-পাশে বেশ কিছু দোকান, ব্যবসা-পত্তর চলছে। নগেনবাবুর লরীর অফিসও রাস্তার বাঁদিকে। প্রথমে স্টেশন রোড হিসাবে তৈরি হয়েছিল এই রাস্তাটি, যার সম্মুখভাগের কথা বলা হয়েছে একটু আগে। তখন এই রাস্তারই টানা সোজা মিলন ঘটেছিল বর্তমান স্টেশন রোডের মহুয়া মোড় পর্যন্ত। এর অল্প দিন পরেই পরেশ চন্দ মহাশয়ের চেষ্টায় বর্তমান স্টেশন রোড তৈরী করা সম্ভব হল। ফলে সুরেন্দ্র বাজারের পশ্চিমাংশের কাঁচা রাস্তার বদলে বাজারের পূর্বদিকে স্টেশন রোড পত্তন হয়। যতখানি সম্ভব সোজা রাস্তা তৈরী করা যাতে কোন্নগর রেল স্টেশনের কাছাকাছি আসা যায়। আনারস বাগান, বাঁশবন সব বিদায় নিল। বাড়তি পাওয়া গেল রেললাইনের ধারের লম্বা ঝিলটি। যার মালিকানা নবগ্রাম সর্বার্থসাধক সমবায় ও আবাসন সমিতির। সুরেন্দ্র বাজারের উত্তর দিকের জমি দেশবন্ধু রোড পর্যন্ত এসে গেছে। কেবল দেশবন্ধু রোডের এপাশের কাঁচা রাস্তার অংশটুকু যা মহুয়া মোড় পর্যন্ত এসে গিয়েছিল, তার আর কোন অস্তিত্ব রইল না। যত সহজে কথাটা বলা হল কাজে কিন্তু

তা নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এমনকি এই কাঁচা রাস্তাটির দখল রাখার জন্য সেদিন খিচুড়ি মহোৎসবও হয়েছে। মনে পড়ে এ-কাজে উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন সার্ভেয়ার প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। এই কাঁচারাস্তাটি পাকা হলে বি-ব্লকের মানুষ এই পথ ধরে সহজেই স্টেশন যেতে পারে এবং তাতে স্টেশন রোডের ইউ.বি.আই. পয়েন্টের চাপ কমবে। ১৯৫০ সালে, নবগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের কোন্নগর স্কুলে যাতায়াতের জন্য মাছের বাজারের মাঝখান দিয়ে যেতে হত। আনারস বাগান দিয়ে এসে এখনকার ময়ূর আবাসনের জলার ধারে আসতে হত। এবার বাঁদিকে একটু বেঁকে ঘুরে এসে মিষ্টি মহলের মোড়। সেখান থেকে বাঁদিক ধরে নবগ্রামে আসা। এই সামান্য পায়েচলা পথটি ক্রমে ক্রমে রূপ পেয়েছে বর্তমান স্টেশন রোড রূপে। মনে পড়ে সেকালে মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বা মইন্যা দা হাফ প্যান্ট পরে ১০.৪-এর গাড়িতে কলকাতা অফিসে চলেছেন। আনারস বাগানের হাঁটা-পথে, বাঁদিকে গাড়ি আসার শব্দ পেয়ে আনারস বাগানের শেষে উঁচু জমিতে উঠেই লম্বা দৌড়। এক দৌড়ে স্টেশন। গাড়ি তাঁকে না নিয়ে একদিনও যেতে পারেনি।

নামকরণ

রাস্তা হল। এবার নামকরণের পালা। সোসাইটি বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন এবং নামকরণের কাজ শুরু হল। নামকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাম হল—আদিবর্ত্ম, যে নামটি আজও বর্তমান, মধ্যবর্ত্ম—বর্তমান বিবেকানন্দ রোড, নববর্ত্ম—বর্তমান কলেজ রোড। বিদ্যাসাগর রোড নবগ্রামকে উত্তর-দক্ষিণে ধরে রেখেছে। এই রাস্তাটি দক্ষিণে নৈটি রোড স্পর্শ করেছে এবং উত্তরে রেলকলোনি, রিষড়া ছুঁয়েছে। সেই পর্বের কিছু নাম আজও বর্তমান, যেমন—নবগ্রামের পূর্ব অংশে ঝিলপথ। রেললাইনের ধার থেকে শুরু হয়ে একটু বেঁকে গোলক মুন্সি পাড়ার পূর্বদিকে ছুঁয়ে চলে গেছে কলেজ ছাড়িয়ে। সেকালের 'বাণীপথে'র আজ আর অস্তিত্ব নেই। বিশেষত পোষ্ট অফিসের কথা মনে রেখে সোসাইটি রাস্তার নামের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির নম্বর দিয়েছেন। পঞ্চায়েত আমলের পূর্ব পর্যন্ত এই রীতি বজায় ছিল। নবগ্রাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে এবং নামকরণের ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষীদের স্মরণ করা হয়েছে। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, রাণী রাসমণি, সারদামণি থেকে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত নাম এসে গেছে। ভিন্নধর্মী নামও এসেছে যেমন সমবায় পথ। জাতীয় নেতার নামও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বাঘাযতীন, জগদীশ বসু, নিবেদিতা, নেতাজী সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র,

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, শরৎচন্দ্র, অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন কেউ বাদ পড়েন নি। বাঙালী মনীষীদের মধ্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩) হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি জীবিত অবস্থায় নবগ্রামের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। ঠিক যেখানটিতে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করে রাস্তার নাম হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ রোড। সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদের গুণমুগ্ধ মানুষের চেষ্টায় ওই স্থানটিতে একটি আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ রোডের আশীস গুপ্ত মশাই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিস্থাপনের জমি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

স্টেশন যাবার রাস্তার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে সেকালের সোসাইটির সংগঠকদের বিশেষত সম্পাদক পরেশ চন্দর দূরদৃষ্টি প্রশংসনীয়। ১৯৫০ সালে ওই পায়ে-চলা পথের পাশে আনারস বাগানের বিপরীতে হাত তিরিশেক দূরে পশ্চিমে একটি পরিবার এসে বাড়ি করলেন অক্ষয় দেবনাথ ও তাঁদের পরিবার। এঁদের রাস্তা কি হবে এ নিয়ে ভাবনা ছিল। পরেশ বাবুর চেষ্টায় বর্তমান স্টেশন রোড পত্তন হলে দেবনাথ পরিবার কিছু বাড়তি জমি পেয়ে রাস্তার পাশে এসে পড়ল। আজ গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে অনেকগুলো দোকান রাস্তার পশ্চিম দিকে রয়েছে। রেলকর্মী দ্বিজেন ঘোষের পরিবারও একইভাবে বাড়তি জমি পেয়ে উপকৃত হন। এভাবে 'শাড়িমহল' বাড়ির উপেন দাস মশাই-এরও জমিবৃদ্ধি ঘটল। আজ স্টেশন রোড নবগ্রামের জমজমাট জায়গা। দু'পাশেই সারি সারি দোকান, ব্যাবসা চলেছে। বাঁদিকে ঝিল ঘেঁষে যুবক সংঘের অবস্থান। যুবক সংঘের জমি আর ঝিলের মাঝখানে ঝিলপথ। স্টেশন থেকে কলেজ যাতায়াতের পথে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই ঝিলপথ ব্যবহার করে।

বর্তমানে নামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০টি। নামগুলি উল্লেখ করা হল। স্টেশন রোড, কলেজ রোড, ঝিলপথ, বিবেকানন্দ রোড, শ্যামাপ্রসাদ রোড, বিদ্যাসাগর রোড, শ্রীঅরবিন্দ রোড, আদিবর্ত্ম, হরিসভা রোড, ড. জগদীশ বোস রোড, সমবায় পথ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, রবীন্দ্রনাথ রোড, মাইকেল রোড, রামমোহন রোড, নেতাজী সুভাষ রোড, পরমহংসদেব রোড, বঙ্কিম রোড, রাসমণি রোড, সূর্য সেন রোড, বাঘাযতীন রোড, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, অশ্বিনীদত্ত রোড, নবীন সেন রোড, বিপিনচন্দ্র পাল রোড, দেশবন্ধু রোড, সারদামণি রোড, হসপিটাল রোড, ড. মেঘনাদ সাহা রোড, সাধক রামপ্রসাদ রোড, বিদ্যাসাগর রোড বাইলেন, সত্যজিৎ রায় সরণি, কালীতলা রোড, সারদামণি প্রতিষ্ঠান রোড, 'সি' ব্লক হরিসভা রোড, নজরুল সরণি, সত্যেন

বোস রোড, 'সি' ব্লক স্কুল রোড, সুকান্ত বিথি, মাতঙ্গিনী রোড, লোকনাথ প্লেস, ঘোষপাড়া রোড, সুমন দাশগুপ্ত সরণি, নিবেদিতা রোড, দামোদর কলোনি লেন, পঞ্চাননতলা রোড, সমিতি পথ, শ্রীমা সরণি, সমবায় পথ এক্সটেনশন, নৈটি রোড, ছোট বহেড়া।

জলাশয়

সেকালে নবগ্রামের পুকুর বলতে একমাত্র বোসপুকুর। তখন কাঁটাপুকুর অনেক দূরের পথ। চরণের পুকুর তখন সাধারণের নাগালের বাইরে। পুকুরের প্রায় চারপাশেই ভাল চাষ হত—পাট, সবজি, শশা, চিচিঙ্গা, বড় বড় বাঁধাকপি। নিমন্ত্রণ বাড়ির লোকেরা বাজারে না গিয়ে এখান থেকে বাঁধাকপি সংগ্রহ করতেন। চরণ কাঁড়ার অভিজ্ঞ চাষী, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এসব করাতেন। পুকুরটি ছিল চাষের জলসেচের জন্য। বরং সেকালে হাতের কাছে আর একটি ছোট পুকুর জনসাধারণের ব্যবহারে নিত্যমুখর ছিল। সেটি হল আজকের বক্সী বাড়ির পুকুর। পঞ্চায়েত অফিসের পাশে। বর্তমানে চরণ-পুকুর ক্ষিতীশ রায়েদের হাত বদলে হয়েছে সমবায় পুকুর—সোসাইটির মালিকানায়।

"প্রতিটি ছুটির দিনে একটু কায়িক শ্রমের দ্বারা সঙ্ঘের সভ্যগণকে তাহাদের অর্থভাণ্ডার পুষ্ট করার জন্য আমি আহ্বান জানাই। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারা জঙ্গল কাটা ও সাফ করা, ড্রেন কাটা প্রভৃতি কাজে নামিয়া পড়িলেন। সাথে সাথে আমিও সাধ্যমত শ্রমদান করিতে লাগিলাম। এইভাবে প্রতি ছুটির দিনে নবগ্রামের উন্নয়নের কাজ করিয়া সমবায় সমিতি হইতে ১৫্ /২০্ টাকা Bill করিয়া সঙ্ঘের অর্থভাণ্ডারে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাম। এই টাকা বাহিরের লোককে না দিয়া নিজেদের হিতে এবং সমষ্টিগত স্বার্থে লাগিবে ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম।"

জিতেন্দ্রনাথ দাস

'গক' (Goc), নবগ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

১৯৪৮

নবগ্রামে জল ও বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ এল, তবেই জল আসার ভাবনা মনে এল নবগ্রাম সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর। ১৯৬২ সালের ডাঃ বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। প্রফুল্লবাবুর আনুকূল্যে নবগ্রামে নল সেবিত বিশুদ্ধ পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি মঞ্জুর হল। শ্রীরামপুরের কংগ্রেস বিধায়ক রাজ্যের তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ এই কাজে নবগ্রামকে সর্বাংশে সহযোগিতা করেছেন। এর আগে নবগ্রামের রাস্তার কোনায় কোনায় টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন নবগ্রাম সোসাইটি। বস্তুত সোসাইটির ডিরেক্টর বোর্ডের একজন সদস্য থাকতেন এই টিউবওয়েলের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য। এই প্রসঙ্গে সদস্য রেবতীমোহন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। নবগ্রামে পানীয় জলের অভাব হয়নি। অতি প্রথমে কুয়ার জল পান করার রীতি আস্তে আস্তে বর্জিত হল। প্রথমদিকে ইউনিয়ন বোর্ডের দু-একটা নলকূপ ছিল, সেখান থেকে জল আনা হত। যেমন পঞ্চানন তলা রোডের সুরেন দাসের বাড়ির একটু আগে বাঁহাতে বি-ব্লকে ঢোকার মুখের রাস্তা। এখানে ইউনিয়ন বোর্ডের একটি নলকূপ ছিল, মনে পড়ে। পরে তা আর রইল না। সোসাইটি তখন স্কুলগুলির প্রয়োজন মনে রেখে প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে একটি করে নলকূপ তৈরি করে দিলেন। নবগ্রামের কলেজে প্রথম থেকেই নিজেদের টিউবওয়েল ছিল।

নবগ্রাম সেবক সংঘের দক্ষিণ পাশের বেশ অনেকটা জমি সোসাইটি বরাদ্দ করে রেখেছিলেন জলের ট্যাঙ্কের জন্য। অনেক চেষ্টায় তদ্বিরে অবশেষে সেই জমিতে সু-উচ্চ জল ট্যাঙ্ক নির্মিত হয়েছে। এই কাজে তখনকার সম্পাদক স্বর্গত শচীন্দ্রকুমার সরকারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বলা যায় একক মানুষের চেষ্টায়ই নবগ্রামের মানুষ জল পেলেন। তিনি এই কাজের জন্য কলকাতা, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুরে যে কতবার তদ্বির করেছেন তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রবর্তনায় সোসাইটি প্রদত্ত জমিতে জলট্যাঙ্ক তৈরি হল। রাস্তায় জলের সময় বেঁধে দেওয়া হত। দিনে তিনবার সকাল, দুপুর ও বিকাল। তারপর বাড়ি বাড়ি জলের লাইন দেওয়া হল। তখন নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদে ছিলেন অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতিতে নবগ্রামে প্রথম বাড়িতে জল পৌঁছল শ্যামাপ্রসাদ

রোডে নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। এর পরে বাড়ি বাড়ি জলের লাইন পৌঁছে গেল। এখন নবগ্রামে জলের লাইন যায় নি এরকম বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এখন নবগ্রামে দ্বিতীয় জলট্যাঙ্ক দরকার। এজন্য সোসাইটি জমি বরাদ্দ করে রেখেছে ১নং প্রাইমারী স্কুলের কাছের মাঠে। ইত্যবসরে নবগ্রামের জল সরবরাহের সুবিধার্থে পাম্পহাউস তৈরি হয়েছে একাধিক। রেডক্রসের পিছনে, পঞ্চায়েত অফিসের সংলগ্ন জমিতে। জলের জোর বাড়াবার জন্য বোসপুকুরের দক্ষিণ পাড়ে পশ্চিমের মাঠে এবং বিবেকানন্দ রোডের উত্তরভাগে ডানদিকে তৈরী হয়েছে কেন্দ্র। ফলে জল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবই বিদ্যুৎ-নির্ভর ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ না থাকলে মুশকিল।

নবগ্রামের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৫৬ সালের পর অনেক চেষ্টায় এল বিদ্যুৎ। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, ১৯৫২-৫৭ সালের শেষের দিকে বিদ্যুৎ নবগ্রামে এসে পৌঁছল। হাওড়া থেকে শেওড়াফুলী পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন চলল ১৯৫৭ সালে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) এই যাত্রা উদ্বোধন করেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ভূপতি মজুমদার, খগেন দাশগুপ্ত প্রভৃতির আনুকূল্যে নবগ্রামে বিদ্যুৎ এসে গেল।

তখন পঞ্চায়েত ছিল না। নবগ্রাম ছিল মাখলা ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত। তখন কংগ্রেস পরিচালিত এই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাখলা নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ। এই ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ছিলেন নবগ্রামের মানুষ বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রভূষণ ভট্ট। প্রধানত ভট্টবাবুর চেষ্টায় ও মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের সমর্থনে, নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ-এর কাজ এগিয়ে গেল। তখন নবগ্রামের অধিবাসীদের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের সাধারণ কাজকর্মের অফিস ছিল ভট্টবাবুর বাড়িতে, নবগ্রামের পশ্চিমাংশে সূর্য সেন রোডে। এখানে নবগ্রামে প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বলল।

ক্রমে নবগ্রামের বড় বড় রাস্তায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেল। গলিপথে বিদ্যুৎ যাওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করল কটা বাড়ি বিদ্যুৎ নেবে তার ওপর। এইভাবে একটু একটু করে নবগ্রামে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যায়। ফলে নবগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিদ্যুতের আলোতে সম্ভব হল। কিছু কিছু কুটিরশিল্প আরম্ভ হল নবগ্রামে। এখনও এভাবে বিদ্যুৎ নির্ভর ব্যাবসা নবগ্রামে দেখা যায়। ক্রমে নবগ্রামের স্কুল কলেজ, চিকিৎসা কেন্দ্র, দোকান বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত হল। তবে আজও লোডশেডিং-এর কমতি নেই; তখন লোডশেডিং আরও বেশি হত। পাড়ায় পাড়ায় জেনারেটার তখন ছিল না। তাই প্রত্যেক বাড়িতেই

হাতের কাছে কেরোসিন নির্ভর হ্যারিকেন, মোমবাতি, দেশলাই রাখতে হত। কি জানি কখন দরকার হয়!

আরম্ভ লগ্নে নবগ্রামে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অফিস ছিল বিবেকানন্দ রোডে ঘোষেদের খাটালের বিপরীত দিকে বিনয় দত্তর বাড়িতে। এরপর এই অফিস চলে যায় বি-ব্লকে অশ্বিনী দত্ত রোড ও দেশবন্ধু রোডের কোনায় গুহ বাড়িতে। তারপর এই কেন্দ্রটি একটু বড় আকারের অফিস হয়ে বর্তমানে বড়-বহেড়ার কালীতলা রোডের দোতলা বাড়িতে অনেকটা জায়গা নিয়ে অবস্থিত। এটিও ভাড়া বাড়ি। নিজস্ব বাড়িতে অফিস কবে হবে বলা শক্ত। এই অফিসে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা অনেক। নবগ্রাম বড়বহেড়া, কানাইপুর, ন'পাড়া, এমনকি রিষড়ারও কিছু গ্রাহকের বিল জমা দেওয়ার কেন্দ্র এই অফিস। তাই অনেক সময় ভিড় হয়। লম্বা লাইন পড়ে। ECS রীতি চালু করা দরকার।

প্রথম দুরভাষ

নবগ্রামের জন্মলগ্নে এ অঞ্চলে কোন টেলিফোন ছিল না। যতদূর জানা যায়, নবগ্রাম বি-ব্লকের হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে প্রথম টেলিফোন আসে। তখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বলতে উত্তরপাড়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। এটি তখন ছিল উত্তরপাড়া স্টেশন রোডে বর্তমান হাসপাতাল ছাড়িয়ে জি.টি. রোডের পথে ডানদিকের কোনার বাড়িতে। ক্রমে টেলিফোনের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নবগ্রামে নিজস্ব অফিসের দরকার মনে হয়। তখন টেলিফোন কর্তৃপক্ষের আগ্রহে নবগ্রাম বি-ব্লকের মুখে দেশবন্ধু রোডের দক্ষিণে নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ঘরের সংলগ্ন জমিতে নব নির্মিত গৃহে নবগ্রাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হল। এই এক্সচেঞ্জের কোড নং প্রথমে ছিল ৬৭৩, বর্তমানে ২৬৭৩। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের হিসাবে নবগ্রামের আরম্ভ কোন্নগর এক্সচেঞ্জের আগে। নবগ্রামের টেলিফোন ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক।

কেনাকাটা ও বাজার

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে নবগ্রামে একটি দোকান ছিল। ১নং আদিবর্ষে এই দোকান সত্যভূষণ ব্যানার্জীর বাড়ির টিনের বারান্দায়, বিক্রেতার ভূমিকায় ছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার বসুর মধ্যম পুত্র বিভূতিভূষণ বসু। ওই বছরই ১৫ই

আগস্টের পরে নবগ্রামে হল একটি রীতিমতো মুদি দোকান কো-অপারেটিভ স্টোর্স, সেখানে কেরোসিন তেলও পাওয়া যেত। লক্ষ্মণ ঠাকুরের বাড়ির উত্তরাংশে, বিক্রেতা ছিলেন সুনীল পাল, পিতা সুরেশ পাল (চুনী বাবু)। তখন নারায়ণ দে, চুনীবাবুরা বিধানপল্লীর উপেন রায়ের বাড়ির ভাড়াটে। সেই দোকান থেকেই তখনকার অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেন। এই দোকানের সরকারী নাম ছিল 'বিপণী বিভাগ' এবং এর দায়িত্বে ডিরেক্টর-বোর্ডের লোক থাকতেন। পরে দোকান চলে এল ২নং আদিবর্ষ্মের পাইন বাড়িতে। পাইন বাড়ির শেষে স্টোর সেকশন উঠে আসে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, পরেশ চন্দ মশাই-এর পুরনো বাড়ির কোনাকুনি বিপরীতে।

১৯৫১ সাল। স্টোর সেকশন্ বিদ্যাপীঠকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে এল বর্তমান রেডক্রশের বাড়ির পশ্চিমাংশে। রেশন ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। বিদ্যাপীঠের ঘর থেকেই, তা পরিপূর্ণতা পেল রেডক্রশের বাড়ির মুদি দোকানের সঙ্গে। সমগ্র সি-ব্লক পর্যন্ত এই রেশন দোকানের আওতায় ছিল। রেশন তোলবার ব্যাগ নিয়ে অনেকে লাইন দিয়েছেন অতি ভোরে, হাতে গীতা। সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন গীতা পাঠে। আর স্টোরের কাছ থেকে পাওয়া বড় ঘরটিতে বিদ্যাপীঠের শিক্ষকবৃন্দ বসতেন। বিদ্যাপীঠের পাঠাগারটিও ছিল এই ঘরে। এই পাঠাগারের দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী।

রেডক্রশ বাড়ির স্টোর সেকশন বহু বৎসর নবগ্রামবাসীর সেবা করেছে। একদা এই স্টোরের শাখা খোলা হয়েছিল বর্তমান কলেজ রোডে। এর মাধ্যমে কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন প্রচলিত রীতি মেনে পয়লা বৈশাখে হালখাতার আয়োজন হত স্টোরে, রেডক্রস বাড়ীতে। মনে পড়ে বি-ব্লকের প্রবীণ অধিবাসী পরেশনাথ বিশ্বাস হালখাতার দিন উপস্থিত থেকে সব কাজ সুসম্পন্ন করতেন। স্টোরের ম্যানেজার ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

এই স্টোরের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন বেশ কয়েকজন। ফুটফুটে চেহারার কিরণ গাঙ্গুলী (সমদ্দার বাড়ির জামাই), মাখন সেন (ঝিলপথ), চিত্ত বিশ্বাস (বারুজীবী কলোনি), লক্ষ্মী দাস, নিশি, অমর ভট্ট (বিদ্যাসাগর রোড উত্তরাংশ)। রেশনের ওজনের কাজে ছিলেন আপ্পল স্বামী। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরে স্টোর ম্যানেজার পদে খুব উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন জীবনকৃষ্ণ সরকার।

স্টোর সেকশনের মাধ্যমেই রেশন দোকান চলত। চাল, কেরোসিন, চিনি, গম, কয়লা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নবগ্রামবাসী পেতেন। সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় বিপণী বিভাগ এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। তখন খাদ্যাভাব ছিল সারাদেশে। তারই মধ্যে নবগ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে সরকারী

কর্ডনীং ব্যবস্থানুযায়ী চাল সংগ্রহের চেষ্টা করতেন সোসাইটি। এ কাজে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমনকি পুলিশের রক্তচক্ষুও অনেক সময় বিপদ সৃষ্টি করেছে। তথাপি সোসাইটির নিবেদিত-প্রাণ ব্যবস্থাপকেরা ভীত হননি। আজ এসব কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি নাম অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে, তিনি সুরেশচন্দ্র সাহা। তখনকার দিনে সব কাজই নবগ্রামের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা করে উদ্যোগ নেওয়া হত। পরবর্তীকালেও নবগ্রামে কো-অপারেটিভ স্টোর্স-এর কাজ চলছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এর আদি উৎস সোসাইটির বিপণী বিভাগ। নবীন প্রজন্মের একথা ভোলা উচিত নয়। সবকিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত। এ জন্যেই কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও সেকালের প্রসঙ্গে এ সব তেল, নুন লকড়ীর কথা অনিবার্যভাবেই এসে যায়। কালের নিয়মে অনেক কিছু হারালেও কিছু থেকেই যায়, একথা মহাজনেরা বলে গেছেন।

নবগ্রামের রেল স্টেশন কোন্নগর, কলকাতা থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যায় সুরেন্দ্র বাজারে ঢুকে মাছ, সজি, ফল-ফলাদি, পান সবই কেনাকাটা করতে হত। ছোট বহেড়ার সুরেন দাস মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত এই বাজারই তখন নবগ্রামের বাজার। নবগ্রামের অধিবাসী, কর কলোনির বাসিন্দা কয়েকজন ক্রমে এই বাজারে দোকান সাজিয়ে বসলেন, একটু একটু করে বেশ বড় বাজার তৈরী হল। এর সঙ্গে ইদানীং প্রতিষ্ঠিত রেল বাজারেও বেশ কোনাকাটার ব্যবস্থা হয়েছে। একদা গিরীন বাবুদেরও একটা দোকান নৈটি রোডে হয়েছিল। সব মিলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য একটা ভাল বাজারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে। নবগ্রামের নগেন বাবুর পরিবহন কাজটাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। প্রতি রবিবার এই বাজারের কেনাকাটা খুবই বেশী। কোন্নগরের এমনকি এ্যালকালী কোয়ার্টার থেকে অনেক ক্রেতা আসেন। রেল স্টেশনের কাছে বাজার তাই সর্বাংশে আকর্ষণীয়।

নবগ্রামের নিজস্ব বাজার একটা ছিল। এই বাজার গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়নি। তখন স্টেশন বাজারই নবগ্রামের মানুষের প্রয়োজন মেটাত। সোসাইটি কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর নবগ্রামের কথা চিন্তা করে নবগ্রামের পূর্ব-উত্তর অংশে রেল লাইনের পাশে একটি নতুন বাজার স্থাপন করলেন। এটি একটু একটু করে বড় হচ্ছিল। এখানকার ব্যবসায়ীদের প্রবর্তনায় বাউল গানের আসর বসেছে। এখানে কেনাকাটা করতে এ্যালকালীর কোয়ার্টার থেকেও মানুষ আসতেন। কারণ রেল লাইনের তলায় একটা কালভার্ট প্রথম থেকেই আছে। কলেজের

কোণায় একটা কালভার্ট এবং তারপরেই এই নতুন বাজারের কালভার্ট। নবগ্রাম স্থাপনার পূর্বে এই অঞ্চলে সামান্য কিছু বসতি ছিল। একজন তখনকার এলাকার অধিবাসীর নাম মনে পড়ে নীলকমল বাগ। এখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই হোক এই বাজার এখন আর রইল না। কেনাকাটার উপযোগিতা থেকে বাসভূমির প্রয়োজনীয়তা বেশী বলে অধুনা বাজার নয়, বাসভূমির রূপ পাচ্ছে এই জায়গা। আর নবগ্রামের একটা প্রান্তে এর অবস্থান। লোকজন দূরে যেতে অনিচ্ছুক, বরং ষ্টেশনের হাতছানি সেখানে অনেকখানি। নানা প্রতিবন্ধকতা হেতু সোসাইটি কর্তৃপক্ষ বাজারটি আর চালাতে পারছেন না। অধিবাসীদেরও এ বিষয়ে আগ্রহ কম। সব মিলে নতুন বাজার এখন আর বজায় রইল না। বদলে এখন রাস্তার ধারে কোণে কোণে চলতি বাজার বেশি, সঙ্গে ভ্যান গাড়ীর চলমান বাজার।

নবগ্রামে ব্যাঙ্ক

নবগ্রাম সোসাইটি কর্তৃপক্ষের বিরোধীরা সংঘবদ্ধ হয়ে সমবায় সমিতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৬২ সালে সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিরোধীরা পরাজিত হওয়ার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীরা স্থির করলেন যে নবগ্রামের মানুষদের মধ্যে এমন কাজ করা প্রয়োজন যে কাজে সকলকে সহজেই ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। নির্বাচনের পর তাঁরা একত্রিত হয়ে স্থির করলেন যে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে পারলে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য হবে। ব্যাঙ্ক করার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন প্রয়াত অমর চৌধুরীর দাদা প্রয়াত প্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয়। এই ব্যাঙ্ক করার ব্যাপারে মহাদেশ পরিষদের তৎকালীন পরিচালক কমিটির প্রভাবশালী কর্মকর্তারা সহমত পোষণ করেননি। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাঙ্ক করার পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এই ব্যাঙ্ক করার ব্যাপারে প্রধান সমস্যা দেখা দিল যে নবগ্রাম সমবায় সমিতির সীমানার মধ্যে অন্য কোন সমবায় সমিতি গঠন করতে হলে নবগ্রাম সমবায় সমিতির অনুমোদন প্রয়োজন। এই সময় একটি কমিটি করা হয়। শ্রদ্ধেয় জীবনকৃষ্ণ সরকারকে সভাপতি এবং শ্রদ্ধেয় অমর চৌধুরীকে সম্পাদক করা হয়। প্রশ্ন দেখা দিল সমবায় সমিতির অনুমোদন নিয়ে। সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় সুবোধ দাশগুপ্ত ব্যাঙ্ক করার জন্য একটি প্রস্তাব দিলে এই প্রস্তাব সাধারণ সভায় নাকচ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় চন্দ্রভূষণ ভট্ট মহাশয় প্রধান ভূমিকা

পালন করেন। কারণ পূর্বেই ভট্ট মহাশয়কে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন বিরোধীদের সাহায্য করেন। তিনি এই প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারেননি। এই প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ার পর একটি কমিটি করে ব্যাঙ্ক করা হয় এবং সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কের প্রথম সভাপতি প্রয়াত জীবনকৃষ্ণ সরকার এবং সম্পাদক হন প্রয়াত অমর চৌধুরী। প্রথমে ব্যাঙ্কের কোন স্থায়ী বসার ব্যবস্থা ছিল না। ছোট একটা বাইক্ ছিল ব্যাঙ্কের প্রতীক, যা অমর বাবুর কাছেই থাকত। পরবর্তীকালে মহাদেশ পরিষদে ঘর ভাড়া নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চালান হত। ব্যাঙ্ক তৈরী হওয়ার পর নতুন করে ব্যাঙ্কের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ব্যাঙ্কের নির্বাচন রাজনৈতিক রূপ পায়। এই নির্বাচনে অবিভক্ত সি.পি.আই একটি পৃথক প্যানেল দেন। অন্য প্রার্থীরা আর. এস.পি-র সাথে যুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সি.পি.আই-এর প্যানেলের কোন প্রার্থী জয়যুক্ত হতে পারেননি। এই সময় থেকেই সমবায় ব্যাঙ্ক দখলের জন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে বলা প্রয়োজন প্রথমে ব্যাঙ্ক পরিচালনায় কোন রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি। দলীয় সমর্থকরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে দুই দলের মধ্যে মতান্তর প্রকট হয়ে ওঠে এবং অমরবাবু সহ অন্যান্য অনেকেই ব্যাঙ্ক থেকে পদত্যাগ করেন। সেই সময় থেকেই ব্যাঙ্কের একাধিপত্য একদলীয় প্রভাবে পরিচালিত হয়। ব্যাঙ্ক মহাদেশ পরিষদ থেকে নতুন নিজস্ব ভবনে চলে আসে। এই কাজে অমলেন্দু মল্লিক এবং দ্বিজেশ ঘোষ মহাশয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তৎকালীন অন্যান্য সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টা ব্যতীত এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। সমবায় ব্যাঙ্ক নবগ্রামের সমবায় আন্দোলনের একটি জীবন্ত প্রতীক। এই ব্যাঙ্ক স্থানীয় মানুষদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্যের কাজে এগিয়ে আসে। নবগ্রামের উন্নয়নে এই ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ব্যাঙ্ক বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচলিত হচ্ছে। এই ব্যাঙ্ক রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য স্থানের স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে।

বর্তমানে ব্যাঙ্কের অবস্থা : ২০০৩-০৪ সালের পরীক্ষিত হিসাব অনুসারে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন ৩৩.৫৮ কোটি টাকা। সদস্য/সদস্যার সংখ্যা ২৭৬৭। নিট লাভ হয় ১,১৩,৮৯,৭৪৯.০৭ টাকা। ব্যাঙ্কের প্রবর্তনায় হরিসভা রোডে তারকেশ্বর সেনগুপ্তের বাড়িতে নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ডাকঘরের কথা

দেশ ভাগ হল, স্বাধীনতা এল। তারপর দেশত্যাগ দলে দলে। নতুন আস্তানা খুঁজে খুঁজে একটা ঠিকানার ব্যবস্থা চাই। তাই নবগ্রাম নতুন ঠিকানায় মাথা তুলে দাঁড়াল নবগ্রাম কলোনি, পোঃ বড়বহেড়া, কোন্নগর, জেলা ঃ হুগলী। তার পাশাপাশি আর একটি ছোট গ্রাম, স্টেশন থেকে আসার পথেই পড়ে, নাম 'ছোট বহেড়া'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেশ তখনও একটু একটু আছে। স্টেশন নেমে মাইলষ্টোন পাওয়া গেল নৈটি রোডের রাস্তার ডানধারে। লোহার চাকতিতে লেখা ১/৪ মাইল। এর একটু পরেই বর্তমান পঞ্চানন তলা রোড। তারপরের কথা পাঠক একটু একটু জেনে গেছেন। বিদ্যাপীঠের বিপরীতে জিতেন দাস মশাই-এর বাড়ির আমগাছের গায়ে একটু ওপরে একটি ছোট সাইনবোর্ড, তাতে পোঃ- বড়বহেড়া নামটি পাওয়া গেল।

বড়বহেড়া গ্রামের কর কলোনিতে এই পোস্ট অফিসটি তখন কাজ করে চলেছে। শ্রীরামপুরের পোস্ট মাস্টার, ফরিদপুর জেলার মানুষ, ক্ষিতীশচন্দ্র করের বাড়ির টিনের ঘরের বারান্দায় এর অবস্থান। ডাকপিওন ছিলেন একজন বার্মা থেকে আসা রিফিউজী মানুষ, ক্ষিতীশবাবুরই আত্মীয়। এই পিয়নই নবগ্রামে বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করতেন। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এইভাবেই ডাকের কাজ চলছিল। নবগ্রাম সোসাইটি নবগ্রামের জন্য একটা পোস্ট অফিস চাই, এই সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজ শুরু হল। ডাকবিভাগ কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়নি। আর ক্ষিতীশ কর মশাই-এর মনে মনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তার বাড়ির পোস্ট অফিসের অধীনেই নবগ্রাম থাকুক। ডাকবিভাগ কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করে নবগ্রামের জন্য প্রাথমিক ভাবে একটি Experimental Post Office করার অনুমতি দিতে রাজি হলেন। কথা ছিল কাজের পরিমাণ দেখে ভবিষ্যতে অনুমতি দেওয়া হবে। তখন কানাইপুর গ্রামে আলাদা পোস্ট অফিস ছিল না। বড়বহেড়ায় একটি ছোট ব্রাঞ্চ অফিস ছিল, সেখানে পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের সুবিধা ছিল না।

ডাকবিভাগের পরিদর্শক এলেন। বিদ্যাপীঠের কাছাকাছি নবগ্রাম পোস্ট অফিসের কাজ শুরু হলে সেটা বড়বহেড়ার পোস্ট অফিস থেকে কত দূরে হবে ইত্যাদি ব্যাপার পরীক্ষা করার জন্য। এই পরিদর্শককে একটু ঘোরাপথে নিয়ে এসে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তখন বিদ্যাপীঠে হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। অতএব পরিদর্শক বুঝলেন যে নবগ্রামে আলাদা

পোস্ট অফিসের প্রয়োজন আছে। ডাকবিভাগ Experimental Office-এর অনুমতি দিলেন। নবগ্রাম সোসাইটি সেটা মেনে নিলেন।

কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেল। অল্পদিনের মধ্যেই নবগ্রামে ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস স্থাপনের অনুমতি পাওয়া গেল। তখন পরেশ চন্দ মশাই-এর নতুন দালান বাড়ীর বাইরের ঘরে পরীক্ষামূলক ডাকঘরের কাজ শুরু হল। একটি টেবিল, একটি চেয়ার, টেবিলে একটি ওজন যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটুকু সম্বল করে, অতি সাধারণভাবে পোস্ট অফিস কাজ শুরু করল। প্রথম পোস্ট মাস্টারের দায়িত্ব নিলেন নবীন যুবক শিশুরঞ্জন ভট্টাচার্য। নবীন পোস্ট মাস্টারের পাশে আর একখানা চেয়ার দেওয়া হল। সেখানে এসে বসতেন প্রবীণ অবনি আচার্য্য মহাশয় এবং শিশুরঞ্জনকে পোষ্ট অফিসের কাজ হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন।

বেশ তাড়াতাড়ি নবগ্রাম পোস্ট অফিস ব্রাঞ্চ অফিস পরিণত হল। অতএব স্থান বদল হল পোস্ট অফিসের। পোস্ট অফিস উঠে এল বিদ্যাপীঠের মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সোসাইটি অফিসের ভিতরে। এই ভাবেই চলল কিছুদিন। তারপর পোস্ট অফিসের একটা স্থায়ী নিজস্ব অফিস হল, বর্তমান রেডক্রসের বাড়ীতে বিপণী বিভাগের ঠিক পাশে একখানা ছোট ঘরে। এই ছোট পোস্ট অফিসেই একটি টেলিফোন রাখার ব্যবস্থা হল এমনভাবে যে প্রয়োজনে সেটি সবাই ব্যবহার করতে পারে। সেই নবগ্রামের প্রথম সর্বজনীন টেলিফোন। নবগ্রাম কলোনি নামেই গৃহীত হয়। রেডক্রসের দারোয়ান বাহাদুর টেলিফোনে আসা খবর বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিত। ইতিপূর্বে আদিবর্গের শ্যামাপদ চক্রবর্তী (শ্যামাঠাকুর) নবগ্রামে এসে ডাকপিয়নের কাজ করছিলেন সামান্য পারিশ্রমিকে। ডাকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ কর্মী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পোস্টঅফিসের ইনচার্জের ভার গ্রহণ করলেন। রেডক্রশে থাকাকালীনই পোস্ট অফিসের ডিপার্টমেন্টাল ডাক পিওন আসে। যতদূর মনে পড়ে এই নতুন ডাক পিওন ছিলেন দীর্ঘদেহী প্রণববাবু। এঁরই পরামর্শে চিঠি বিলি কাজের সুবিধার্থে সোসাইটি বাড়ির নম্বর দেওয়ার কাজটি সুসম্পন্ন করেন।

পোস্ট অফিসের কাজ দিনদিন বেড়ে চলেছে। সোসাইটি কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি ছিল এ ব্যাপারে। কারণ সোসাইটির আবেদনে সাড়া দিয়ে নবগ্রাম পোস্ট অফিসের কাজের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবদিক বিচার করে সোসাইটি বিবেকানন্দ রোডের বর্তমান স্থানটি বেছে নেন যাতে ভৌগোলিক ভাবে সবার

সুবিধা হয়। এই স্থানেই পোস্ট অফিস আজও বর্তমান। কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে সোসাইটি পোস্টঅফিসকে আরও বাড়িয়েছেন। এখন এর পেনশন বিলি ব্যাঙ্কের চাইতে কম নয়। টেলিফোন বিলও এখানে জমা দেওয়া যায়। এখানে টেলিগ্রাফের সুবিধা দীর্ঘদিন ছিল। দেবেনবাবু এই নতুন জায়গায় আর পোস্ট মাস্টার রইলেন না, এলেন ডিপার্টমেণ্টাল পোস্ট মাস্টার, কোয়ার্টার সহ। নবগ্রামের পোস্ট মাস্টার রূপে পরে এলেন লাবণ্য দে। তবে দেবেনবাবুকে নবগ্রাম ভোলেনি। দেখা যেত বৃদ্ধ দেবেনবাবু পোস্ট অফিসের বাইরের বারান্দায় কাজে রত। এন.এস.সি. সার্টিফিকেট বিক্রি, মানি অর্ডার ফর্ম লেখা প্রভৃতি কাজে তিনি সকলকে সাহায্য করেছেন। লাবণ্যবাবুর আমলে একবার সমস্ত ডাকপিয়নের লাগাতার অনুপস্থিতিতে কয়েক হাজার চিঠি জমে যায়। পাইওনীয়ার্স গ্রুপের সভ্যরা কবীর সুর চৌধুরীর নেতৃত্বে সেই চিঠির পাহাড় বাছাই করে বাড়ীতে বাড়ীতে বিলি করে দেয়। এমন ছিল সমাজসেবার স্বতঃস্ফূর্ততা।

নবগ্রাম পোস্ট অফিস আর ব্রাঞ্চ-অফিস রইল না। ডাকবিভাগ তাকে উন্নীত করেছে সাব পোস্ট অফিসে, কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পিওনের সংখ্যাও বেড়েছে। আর একটা কথা, আরম্ভ লগ্নে বড় বহেড়ার অধীনে ছিল নবগ্রাম। আজ সম্পর্কটি ভিন্ন—নবগ্রাম সাব পোস্ট অফিসের অধীনেই বড়বহেড়া ব্রাঞ্চ অফিস। তবে দিন সবই বদলায়। বড়বহেড়া পোস্ট অফিস আর ক্ষিতীশ করের বাড়ীতে নেই। এটি এখন নৈটি রোডের ডানদিকের পুকুর পাড়ে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত।

নবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

পাঠক জেনেছেন যে, আরম্ভ লগ্নে নবগ্রাম ছিল মাখলা-ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত। এই পর্বে কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের জীবনে ইউনিয়ন বোর্ডের ভূমিকা ছিল নগণ্য। এমনকি তখন রেশন কার্ডও ছিল নবগ্রাম সমবায় সমিতির প্রদত্ত। আর নাগরিক জীবনের যা কিছু কাজ সবকিছু করত সমবায় সমিতি। থানা-পুলিশ হলেই উত্তরপাড়া থানাকে দরকার হত।

চন্দ্রভূষণ ভট্টর যোগাযোগে নবগ্রামে মানুষের সঙ্গে প্রথম মাখলা-ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে। তখনই নবগ্রামে মাখলা-ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের রেশন কার্ড চালু হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ৫০ পয়সা, ১ টাকা থেকে শুরু করে ৫ টাকার মধ্যে ধার্য হয়। করদাতারা ভোটার হলেন ইউনিয়ন বোর্ডের। এদের সমর্থনে ভট্টবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন দীর্ঘকাল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন কংগ্রেস পরিচালিত। স্থির হয় অতঃপর ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েত হবে। খানিকটা নির্বাচনের কাজ এগিয়ে গেল, মনোরঞ্জন সরকারের বাড়ির বাইরের ঘরে নির্বাচনী অফিস চলল। এরপর সরকারী নির্দেশে নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল তখনকার মত। ফলে নবগ্রামে একাধিক সরকারী অফিসার পর পর দায়িত্ব নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েতের কাজ দেখাশোনা করতেন। ভট্টবাবু এঁদের সহায়তা করতেন। এরকম একজন অফিসার ছিলেন কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী তলার ঘোষাল বাড়ির বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বার্মায় শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন, দুর্গাপদ ঘোষাল-এর ভাইপো রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল।

তখন Administrator-এর অফিস ছিল প্রফুল্ল দাসের ভাড়া-বাড়িতে, বঙ্কিম চন্দ্র রোডে। কর আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন, বেতনভোগী কর্মী, ভট্টবাবুর আমল থেকেই সি-ব্লকের অধিবাসী, সন্তোষ ব্যানার্জীর মামা। পরে বিধান পল্লীর শান্তিরঞ্জন করের বাবা, কর মশায়। মোটামুটি এভাবেই কাজ চলে যাচ্ছিল।

এরপর বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমলে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। নবগ্রামে বামফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করে। প্রথম পঞ্চায়েত প্রধান নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক অমল মুখোপাধ্যায় এবং উপপ্রধান পদে জয়ী সি.পি.আই. প্রার্থী নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক জগদীশচন্দ্র বসু। অমল মুখোপাধ্যায়-এর পর প্রধান হন জগদীশ চক্রবর্তী।

পরবর্তী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও বি.জে.পি. প্রার্থী কৃষ্ণা বিশ্বাস গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হন। উপপ্রধান হন বি.জে.পি. প্রার্থী সুমন ঘোষ। সাম্প্রতিক (২০০৩) নির্বাচনে বোর্ড-এর প্রধান পদে পুনর্নির্বাচিত হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন কৃষ্ণা বিশ্বাস। আশা করা যায়, এই নতুন ব্যবস্থায় প্রধান—উপপ্রধান মিলে একযোগে কাজ করবেন। সরকারী আনুকূল্য লাভ করবেন, সাংসদ বিধায়কের সু-নজরে থাকবেন। নবগ্রামে পঞ্চায়েত আছে ঠিকই, পাশাপাশি নবগ্রাম মালটিপারপাস্ কো-অপারেটিভ ও আবাসন সমিতি লিমিটেডের চোখে পড়ার মত উজ্জ্বল উপস্থিতিও মনে রাখতে হবে। একথাটা পঞ্চায়েতে যিনিই ক্ষমতায় আসুন, তাঁকেই মনে রাখতে হবে; নইলে নবগ্রামের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হবে। অতীতে হাসপাতাল নির্মাণ প্রসঙ্গে অনেক ভুল বোঝাবুঝির পালা নবগ্রামে ঘটে গেছে। এ সবের পুনরাবৃত্তি চিরতরে বন্ধ হোক।

নবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের নব ৬ষ্ঠ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগণের নামের তালিকা

১) শ্রীমতী কৃষ্ণা বিশ্বাস (প্রধান)
২) শ্রীমতী বিনতা চক্রবর্তী (উপ-প্রধান)
৩) শ্রীমতী সুমিত্রা পোদ্দার
৪) শ্রীমতী রীনা ভৌমিক
৫) শ্রীমতী তপতী রায় চৌধুরী
৬) শ্রীমতী মিনু দাস
৭) শ্রীমতী ঝর্ণা মজুমদার
৮) শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্য্য
৯) শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য্য
১০) শ্রীঅজয় চ্যাটার্জী
১১) শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ সেন
১২) শ্রীগৌর মজুমদার
১৩) শ্রীঅমল মুখার্জী
১৪) শ্রীপ্রশান্ত ব্যানার্জী
১৫) শ্রীসুপল দাশগুপ্ত
১৬) শ্রীসুদর্শন ঘোষ
১৭) শ্রীনিরঞ্জন পাইন

১৮) শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
১৯) শ্রীসুমন ঘোষ
২০) শ্রীশিশুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য / সদস্যা

১) শ্রীত্রিদিব লাহিড়ী
২) শ্রীঅমিতাভ সেন
৩) শ্রীমতী রেবা কুশারী

জেলা পরিষদ সদস্য

শ্রীমতী চন্দ্রাণী ঘোষ

ঃ নবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের পরিচিতি ঃ

আয়তন	— ২.৭৫ বর্গ কিমি.
মৌজা	— ৩টি আংশিক মৌজা
জনসংখ্যা	— ১৭৪৫৭
গ্রাম সংসদ	— ১৯টি
গ্রাম উন্নয়ন কমিটি	— ১৯টি
গ্রাম শিক্ষা কমিটি	— ১৯টি
পুরুষ	— ৮৭৬৭
মহিলা	— ৮৬৯০
তপশিলী উপজাতি	— ৫৬৪
খেলার মাঠ	— ৬টি
শিশু উদ্যান	— ৩টি
গ্রন্থাগার	— ২টি, বেসরকারী - ৪টি
এ্যাম্বুলেন্স	— ৪টি
ক্লাব সংগঠন	— ২৭টি
সাংস্কৃতিক মঞ্চ	— ৬টি
অনুষ্ঠান গৃহ	— ৯টি
পঞ্চায়েতের অনুমোদিত ব্যাবসা	— ৪৯৫টি
বাজার	— ২টি
ছোট কারখানা	— ৯টি

নবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাথমিক/জুনিয়ার/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামসমূহ ঃ

ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ

সারদাস্মৃতি বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়

শ্রীশ্রীসারদামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সত্যভারতী শিশুতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়

নবগ্রাম ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়

নবগ্রাম ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়

নবগ্রাম ৩নং প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

নবগ্রাম শিশুভারতী হাইস্কুল

নবগ্রাম হাইস্কুল

সত্যভারতী বালিকা বিদ্যাপীঠ

ঃ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ

নবগ্রাম হীরালালপাল বালিকা বিদ্যালয়

ঃ মহা বিদ্যালয় ঃ

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ

ঃ মুক্ত বিদ্যালয় ঃ

২ (দুই) টি

ঃ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত (একতলা)

সুভাষনগর পল্লী উন্নয়ন সমিতি

নবগ্রাম সি-ব্লক পল্লীমঙ্গল সমিতি

গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদন

ঃ ব্যাঙ্ক ঃ

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া
(নবগ্রাম শাখা)
নবগ্রাম পিপলস্ কোঃ অপঃ
ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড
বেসরকারী নার্সিং হোম - ৩টি
টেলিফোন অফিস - ১টি
বিদ্যুৎ অফিস - ১টি
রেশন ডিলার - ৫টি
কেরোসিন ডিলার - ৭টি

ঃ পোস্ট অফিস ঃ

নবগ্রাম সাব্ পোস্ট অফিস
বড়বহেড়া পোস্ট অফিস (শাখা)

ঃ আই. সি. ডি. এস. সেন্টার ঃ

(অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র) ৯টি। প্রতি কেন্দ্রে
১ জন কর্মী ১ জন সহায়িকা

ঃ পানীয় জলের বুষ্টার ঃ

কে. এম. ডব্লুউ এন্ড এস্ এ — ৭টি
ওভারহেড রিজার্ভার - ১টি (১ লক্ষ গ্যালন)
নলকূপ - ৭২টি

আধিকারিক রাজস্ব পরিদর্শকদের কার্যালয় - ১টি

প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র - ১টি

ঃ স্বাস্থ্যপরিষেবা ঃ

ক) অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা—অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মানুষের চাহিদা মতো স্বল্প ভাড়ায় দিবারাত্র পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

খ) পোলিও রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের পালস্ পোলিও টিকা প্রদান বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৪টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামে সমস্ত ধরনের লোকেদের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের ঔষধ প্রদান, গর্ভবতী মায়েদের ইনজেকশন, টিকা এবং নানাবিধ চিকিৎসার পরিষেবা হয়ে থাকে। প্রতিমাসে স্বাস্থ্যবিষয়ে পঞ্চায়েতে একটি সভা হয়ে থাকে।

ঘ) আর্থিক দিকে পিছিয়ে-পড়া পরিবারগুলির ৩-৫ বৎসর শিশুদের পড়াশুনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শসহ শিশুদের পুষ্টিকর খাবার ৯টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র থেকে হয়ে থাকে। প্রতিমাসে অঙ্গনওয়ারির প্রকল্পসমূহের পঞ্চায়েতের নারী ও শিশু উন্নয়ন উপসমিতির একটি করে সভা হয়ে থাকে।

ঃ শিক্ষা ঃ

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনস্থ ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়েছে।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬জন ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক ৪৮০০০ টাকা ভরণপোষণ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

গ) মিড-ডে-মিল প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি মাসে ৩ কেজি করে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাল বণ্টন করা হয়েছে এবং জানুয়ারী থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল চালু হয়েছে।

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ৬টি প্রাঃ বিদ্যালয়কে নিয়ে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক ১৯টি গ্রাম-শিক্ষা-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঙ) সর্বশিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগে প্রচার অভিযান, মিছিল, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঃ ঋণ ও ত্রাণ ঃ

১। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে (স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্রকল্প) প্রকল্প স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২। পঞ্চায়েত ও ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে ঋণ পরিশোধ শিবির খোলা হয়েছে তবে ঋণ প্রাপকের ঋণ শোধের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়।

৩। বিভিন্ন সময়ে এর মাধ্যমে বিবেচনা করে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং অসহায়

৮০ জন ব্যক্তিকে জি. আর ৮৬ জনকে ৫ কেজি করে চাল এবং ৪৪ জনকে ৫ কেজি করে গম বণ্টন করা হয়েছে।

৪। গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় দুটি স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় গ্রুপ তৈরী করা হয়েছে।

৫। অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে ০৪-০৫ বর্ষে ৬৪টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঃ বনসৃজন ঃ

পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফলের চারা ও বীজ, সার কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর রোডে দক্ষিণ দিকে পঞ্চায়েতের শিশু উদ্যানটিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যপরিষেবা

চিকিৎসা পরিবেশ ও সমাজসেবার সাংগঠনিক সূচনা

বহুমুখী কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। নাম দেওয়া হয় নবগ্রাম কলোনি সেবক সংঘ।

এই সংঘের একটি শাখা 'সোস্যাল সেকশন' নামে পরিচিত। নৈশ প্রহরা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার সহায়তা করা এবং মশার নিবারণের জন্য সচেতন করা হত। এ কাজে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিলেন প্রমথরঞ্জন সরকার মহাশয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হত। ঐ সমস্ত কাজে ওই সময় উপস্থিত সমস্ত মানুষদের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যেত।

ইংরাজী ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী মহাশয় এখানে আসেন এবং তার উপস্থিতি এবং সমগ্র কাজে অংশগ্রহণ করায় ব্যবস্থাগুলির প্রভূত উন্নতি লাভ করে।

১৯৫০-৫১ সালে Nabagram Health Welfare কমিটি সোসাইটির উদ্যোগে গঠিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল নবগ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্ষুদ্র হাসপাতাল স্থাপন করা। ১৯৫১ সালের জুন মাস নাগাদ একটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাকেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, ডাঃ সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেন (I.M.S) এই প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করে। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটি হীরেন্দ্র সেনের বাড়ী ভাড়া নিয়ে আরম্ভ হয়। ডাঃ সেন (C.M.O.) বিনাবেতনে C.M.O. -এর দায়িত্বভার নেন। ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সীও মেডিকেল অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কয়েকমাস বাদে চিকিৎসাকেন্দ্রের বাড়ী পরিবর্তন করে আদিবর্ষে দক্ষিণা দত্তের বাড়ির উত্তরে ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারী অনুমোদনের দরখাস্ত করা হয়। এবং ডিভিশনাল কমিশনারের নির্দেশে প্রতিষ্ঠানটির নাম ও কমিটির সদস্য সংখ্যা নতুন করে ঠিক করা হয়। নাম হয় 'নবগ্রাম চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারি'। সরকার কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণীর স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে অনুমোদন লাভ করে। এতে কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। এই ডিস্‌পেনসারির প্রতিষ্ঠাতা 'নবগ্রাম কো-অপারেটিভ

কলোনি লিমিটেড' এবং পরিচালন ভার কলোনি কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের দ্বারা গঠিত। এই কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চন্দ ও সহ সম্পাদক ছিলেন ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী ও ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। শিশির দাশগুপ্ত ছিলেন অডিটর। এছাড়া আরও ৪ জন সভ্য ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার ঃ

(১) নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৪৫ টাকা মাসিক অনুদান।

(২) হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মাসিক ৩৫ টাকা অনুদান (এই টাকাটা বাড়ী ভাড়ার জন্য ব্যয় করা হত)।

(৩) সমস্ত আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও ডাঃ সত্যেন প্রসাদ সেনগুপ্ত দিয়েছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক ব্যতীত কর্মী সংখ্যা ছিল ২ জন। একজন কম্পাউণ্ডার ধীরেন দত্ত এবং সরোজিনী দাস নামে একজন মহিলা কর্মী। অনুমান ১৯৫২ সালের মার্চ/এপ্রিল নাগাদ ডাঃ এস. পি. সেন (I.M.S.) হঠাৎ পদত্যাগ করে লণ্ডন চলে যান। তখন ডাঃ নিরঞ্জন পাকড়াশী (M.B.B.S.) C.M.O. হিসাবে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন। এই সময় ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সি R. G. Kar হাসপাতালের সাথে যুক্ত হন। এবং মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তাহার সাহায্যে এখান থেকে পাঠানো বিভিন্ন রকমের বহু রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র U.C.R.W. নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যেত। এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রটি কলিকাতার রাজভবনে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্ত্রী শ্রীমতী ফুলরেণু গুহর কাছ থেকে নিয়মিত ঔষধ-পত্র পাওয়া যেত। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধেয় পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্তা ফুলরেণু গুহ মহাশয়া প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রে সাজ-সরঞ্জাম যোগানের সঙ্গে মশার বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশ্যে একসেট গ্যামাক্সিন স্প্রে পাম্প দেন। এর ফলে এলাকায় ঐ সময় মশা বৃদ্ধি নিবারণের কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হত। সেই কাজে প্রমথরঞ্জন সরকার আমাদের বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

১৯৫২-৫৩ সালে বর্তমানে বাড়ী ২২ নং আদিবর্ত্ম-এ এই প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত করা হয়। এর প্রথম দ্বার উদ্ঘাটন করেন তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটি এই বাড়ির মালিক। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠে একটি ঘরে তখন কো-অপারেটিভ স্টোর ছিল। ওখান থেকে ওই স্টোরটি ২২নং আদিবর্ত্মের বাড়িতে স্থানান্তরিত

করা হয়। এজন্য 'নবগ্রাম কো-অপারেটিভ 'স্টোর' 'নবগ্রাম চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিকে' ৪৫ টাকা করে ঘর ভাড়া দিত।

এতসত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা আর্থিক অনটনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন নিবেদন করেও বিশেষ কোন সাহায্য কোথাও পাওয়া যায় নাই। এ-সময় শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রশের সাধারণ সম্পাদক এস. আর. সেনগুপ্তর সাথে যোগাযোগ করেন। এই সময়ে ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য C.M.O-এর দায়িত্বে ছিলেন। একই সময়ে রেডক্রশের আগ্রহ অনুসারে তিনি কলিকাতার বেলেঘাটায় রেডক্রশের (মিঞাবাগান কেন্দ্রে) মেডিকেল অফিসার হিসাবে মার্চ ১৯৫৩ থেকে নিযুক্ত হন।

১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রশ সোসাইটি 'নবগ্রাম চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির' ভার পুরোপুরি গ্রহণ করেন। দিনটি ছিল ১৯৫৩ সালের ২৪শে আগস্ট। এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন তৎকালীন কো-অপারেটিভ মন্ত্রী ডাঃ আর. আহমেদ। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে এর সঙ্গে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ শাখাও চালু করা হয়।

"নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘের আমন্ত্রণে আমি এখানে এসে অসীম আনন্দ পেয়েছি। আসবার আগে আমার ধারণাই ছিল না এখানকার যুবক এবং প্রধানরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এতো উৎসাহপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সঙ্ঘটি গড়ে তুলেছেন। এঁদের কাছে আমরা ঋণী। কেননা এঁরা আমাদের মতন নগণ্য সাহিত্যিকবৃন্দকে সানুরাগে আমন্ত্রণ করেছেন এই সঙ্ঘের কার্যাদি দেখতে এবং অনুভব করতে। এঁদের পাঠাগার, এঁদের সংস্কৃতি অনুষ্ঠান সর্বত্রই আমি এক সংগঠনশীল মনোভাব লক্ষ্য করছি। নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক এই কামনা করি।"

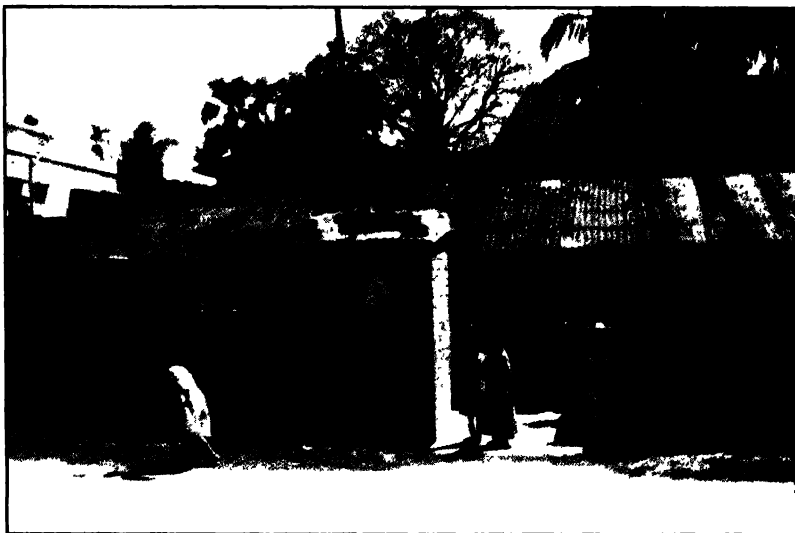
বিমল কর

ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি

১৯৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বছরের শেষ দিন প্রতিষ্ঠা হল নবগ্রাম রেডক্রশের, তদানীন্তন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীদের এজমালি বাড়ি সোসাইটির হাতে এলে, তবেই এখানে রেডক্রশ সহ বিপণী বিভাগ, পোস্ট অফিস, টেলিফোন, ও অন্যান্য বিভাগ খোলা হয়। পূর্বের অংশে বাড়ি করলেন কুসুমরঞ্জন দাস। পুরাতন অংশে প্রসূতি বিভাগ কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন। রেডক্রশের প্রয়োজনে কুসুমরঞ্জন দাসের দোতলা বাড়ির পশ্চিম পাশের জমিতে নতুন পাকা একতলা ঘর তৈরী করে দিয়েছে সোসাইটি।

রেডক্রশের আরম্ভ হল, কিন্তু বর্তমান স্থানে নয়। এর আরম্ভ বর্তমান শ্যামাপ্রসাদ রোড এবং বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ স্থলের যেখানে শ্যামাপ্রসাদের আবক্ষ মূর্তি বসেছে, তার পিছনে টালির দোচালা ঘরে। তখন ঐ টালির ঘরে ডাক্তার ছিলেন মিলিটারির অবসর প্রাপ্ত ডাক্তার সত্যেন সেনগুপ্ত, বাঁ পাটা একটু টেনে টেনে হাঁটতেন, বয়সে প্রবীণ মানুষ। ছিলেন ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (বিশু বাবু) ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী, ডাঃ নিরঞ্জন পাকড়াশী, পরে ডাঃ পাকরাশী আফ্রিকায় গেলেন ডাক্তারী করতে, ফিরে এসে দিল্লীতে। সুখময় পাক-ড়াশী এঁরই দাদা।

এখান থেকে রেডক্রশের স্থান হল তখনকার আদিবর্ম্মের মধ্য অংশে উত্তর পাশের জমিতে টিনের দোচালা বিশ্বাস বাড়িতে। এখানে আসার আগেই ডাঃ সেনগুপ্ত নবগ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। এই বাড়ি থেকেই রেডক্রশ স্থায়ী জায়গায় স্থানান্তরিত হল। 'নবগ্রাম' মেডিক্যাল ইউনিট রূপ পেল 'নবগ্রাম রেডক্রশে, রাজ্য রেডক্রশের অধীনে। নবগ্রাম রেডক্রশ এখনও বর্তমান এবং একটা এ্যাম্বুলেন্স তো অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। এই রেডক্রশের মাধ্যমে নবগ্রামবাসী বহুদিন বহুভাবে উপকৃত হয়েছে। ডাক্তার বিশুবাবুর কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিটি নবগ্রামবাসী বিশুবাবুকে জানেন। তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, বিশেষত কম্পাউণ্ডার হিসাবে, মাইকেল রোডের বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তপন ভট্টাচার্য্য। রেডক্রশের প্রসূতি বিভাগের অবদান আর একবার স্মরণ করি। ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সীর মত মানুষের ডাক্তারী শুরুর ক্ষেত্র এটি, অবিশ্বাস্য মনে হয়, যাঁকে কাছে পেলে নিশ্চিন্ত হতেন সত্যজিৎ রায়। আজ ডাঃ বক্সী ভারতবিখ্যাত এক চিকিৎসক, আন্তর্জাতিক



নবগ্রাম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ১নং



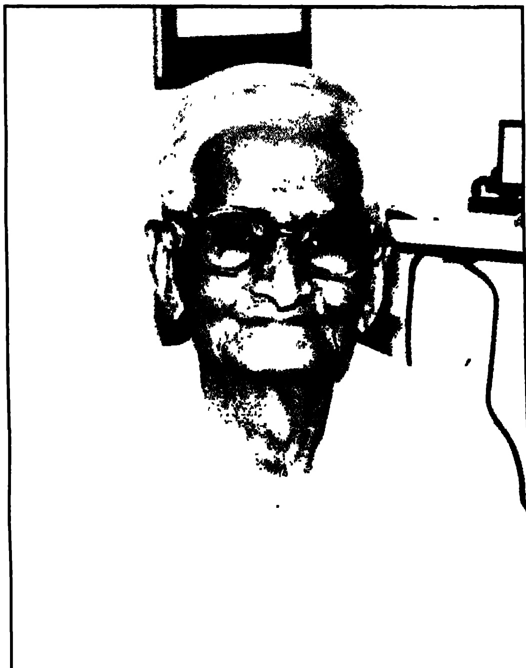
নবগ্রাম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 'বি' ব্লকে শিশু উদ্যান



নবগ্রাম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২নং



নবগ্রাম হীরালাল পাল কলে



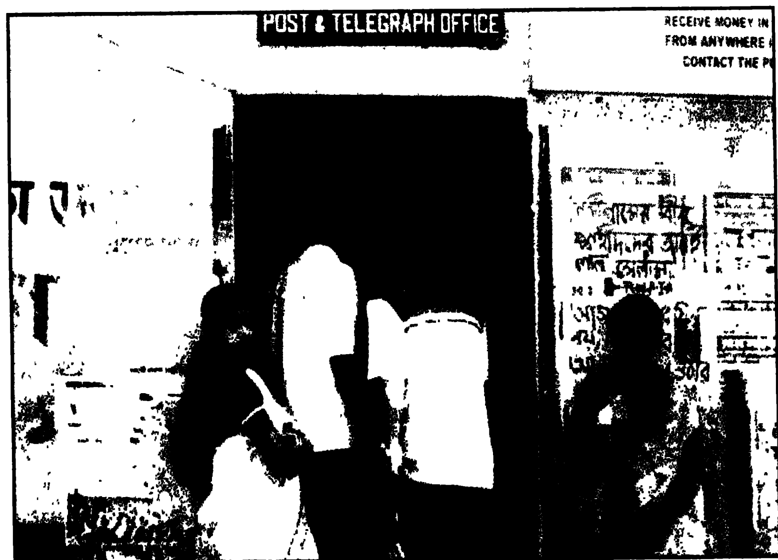
প্রয়াত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম-১৯১৩, মৃত্যু-২০০৫)
নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের প্রথম সম্পাদক।



নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ (ছেলেদের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়)



নবগ্রাম সোসাইটির জুবিলি মার্টে অবস্থিত
ব্যাঙ্ক — ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া



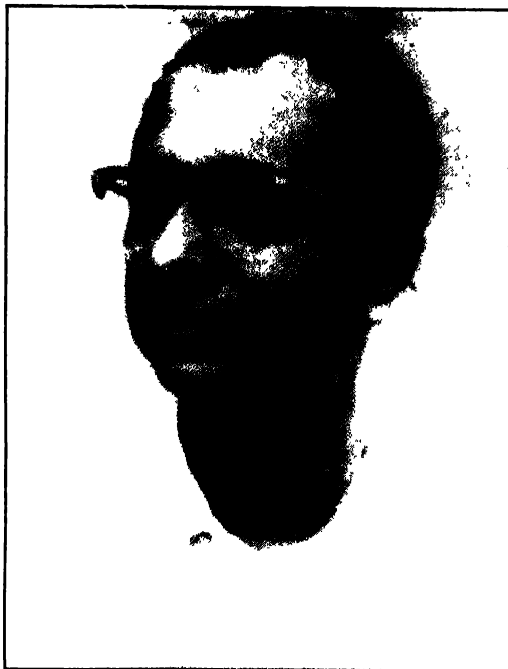
নবগ্রাম ডাকঘর



নবগ্রাম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত জুবিলি মার্ট



নবগ্রাম সেবক সংঘ



নবগ্রামের প্রখ্যাত শিল্পী তারাপদ ভট্টাচার্য
তদানীন্তন নাট্যজগতের এক কিংবদন্তী



নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘের যাত্রা অনুষ্ঠানের এক বিশেষ মুহূর্তে সভ্য নীহার চট্টোপাধ্যায় ও স্বপন সেনগুপ্ত



নবগ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের
প্রচেষ্টায় স্থাপিত
নবগ্রাম পিপলস কোঃ অপারেটিভ
ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড



নবগ্রাম টেলিফোন কেন্দ্র



নবগ্রাম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত নবগ্রাম হরিসভা



ইন্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটি নবগ্রাম শাখা

খ্যাতিসম্পন্ন। ভবিষ্যতে হয়ত আজকের রেডক্রশ নাও থাকতে পারে তবুও রেডক্রশের অবদান কোনদিন ভোলা যাবে না।

কর্মসূচি

আউটডোর মেডিকেল ইউনিট

সমস্ত রুগীকে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এখান থেকেই সরবরাহ করা হত। মাইনর অপারেশন, ড্রেসিং আর ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থাও এখানে ছিল।

মেটারনিটি বিভাগ ঃ

প্রতিটি মা ও শিশুকে প্রতিষেধক টীকা প্রদান করা হত। এলাকার গর্ভবতী মায়েদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের নাম নথিভুক্ত করা হত এবং নিয়মিত তাদের তত্ত্বাবধান করা হত। স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়িতে গিয়েও দেখাশোনা করতেন অথবা রুগীকে ক্লিনিকে আনতেন। প্রসবের পর নবজাতক শিশু ও মায়েদের নিয়মিত যত্ন নেওয়া হত।

যে সমস্ত মায়েদের বাড়িতে প্রসব করানোর মত স্থান ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে সেখানে আমাদের মিড ওয়াইফ ও হেলথ্ ভিজিটর গিয়ে প্রসব পরিচালনা করতেন। (স্বাভাবিক প্রসবকালে)।

যে সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের বাড়ীতে প্রসব করানোর ব্যবস্থা সম্ভব ছিল–না তাদেরকে রেডক্রশের মেটারনিটি সংলগ্ন বেডে ভর্ত্তি করে প্রসব পরিচালনা–করা হত। এভাবে ৫৮ সাল থেকে চলছে ৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত। প্রথম ভর্ত্তির দিন ছিল ২২/৯/৫৮ শেষ যেদিন রুগী ভর্ত্তি হয়ে ছিলেন সে দিনটি ছিল ৩১/১২/৭৮।

Infant (১ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত) শিশুদের কার্ড করে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা হত।

১ থেকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি অল্প ব্যয় অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হত।

মেটারনিটি বিভাগের কর্মী

চিকিৎসক ১ জন, হেলথ্ ভিজিটর ১ জন, মিড ওয়াইফ ১ জন, সহকারী মিড ওয়াইফ্ ২ জন (ট্রেনড্ দাই), দারোয়ান ১ জন।

দাই প্রশিক্ষণ ঃ

এলাকার এবং এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পাশ মেয়েদেরকে এখানে দাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। রেডক্রশ হেড্ কোয়াটার থেকে এদের সিলেকশন করা হত।

পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ ঃ

প্রতিদিন সকালে মা ও শিশুকে এবং রোগীকে বিনামূল্যে দুধ এবং রান্নাকরা পুষ্টিকর খাদ্যও বিতরণ করা হত। নিয়মিত গর্ভবতী মা ও শিশুকে প্রতিষেধক দেওয়া হত।

নবগ্রাম গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদন

রেডক্রশের কথার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি যে নবগ্রাম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একটা স্বাস্থ্য সচেতনতা ছিল। তাই রেডক্রশের পাশাপাশি ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল তৈরীর স্বপ্ন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সেই স্বপ্ন আজ আর অধরা নয়। নবগ্রামে আজ একটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। ক্রমশ সেটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে Dental College সহ রূপ পাবে এ আশা করা যায়।

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামের এক দুরন্ত উচ্চাভিলাষী সন্তান ভাগ্যের হাতছানিতে কলকাতা নয়, বোম্বাই নয়, পৌঁছে গেলেন সুদূর লণ্ডনে। সেখানে কেমন করে সেই সামান্য মানুষ অসামান্য মানুষের রূপ লাভ করলেন, উল্লেখযোগ্য দাতারূপে প্রতিভাত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, আত্মীয় স্বজনের কাছে এবং নবগ্রামের মতন সমগ্র নবগ্রামবাসীদের কাছে সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। এই সুসন্তানের নাম ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরী। তাঁরই পিতামাতার নামে সোসাইটির প্রদত্ত জমিতে প্রধানত তাঁরই অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে এই সেবাকেন্দ্রটি। নবগ্রামের কলেজ রোডের গোলক মুন্সী পাড়া তাঁরই অর্থ সাহায্যে তৈরী হয়েছে। এখানে তাঁর আত্মীয়বর্গ আলাদা আলাদা বাড়িতে বাস করছেন। ধূর্জটিবাবু নিজে যখন আসতেন তখন বাস করতেন আবাসনের মধ্যে ঢুকেই বাঁ হাতের প্রথম একতলা বাড়িতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এলাহাবাদের মানুষ ডাঃ বিধুভূষণ মালিককে দেখা যেত এই বাড়িতে ধূর্জটিবাবুর সাথে দেখা করতে এসেছেন। লণ্ডনে ধূর্জটিবাবুর স্থাপিত 'আহার

শালায়' দেশী খাবার খেতে লন্ডনে ভারতীয় ছাত্ররা আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ভারতীয় ছাত্র জ্যোতি বসু।

ধূর্জটিবাবুর জীবিত কালে কথা হয়েছিল নবগ্রাম বোস পুকুরের পশ্চিমে ১ নং প্রাইমারী স্কুলের ওপাশে সোসাইটি প্রদত্ত জমিতে হাসপাতালটি তৈরী হবে। এজন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন শ্রদ্ধেয় বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। এই অনুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করেছিলেন ডঃ চিত্তরঞ্জন বশিষ্ঠ। নানা কারণে এখানে হল না। বরং জমি বদল করে হাসপাতাল অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হল বর্তমান জমিতে। সেই টানাপড়েন ভুলে গিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত।

হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তখনকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ পাল। যথাসময়ে এর উদ্বোধন হল। সেই অনুষ্ঠানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও উপস্থিত থাকবেন কথা ছিল। ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ জনাব আকবর আলি খন্দোকার, এইদিনের এই অনুষ্ঠান ছবি সহ প্রচারিত হয়েছিল কলকাতা দূরদর্শন সহ বিভিন্ন মিডিয়ায়।

আরম্ভ লগ্নে (ডিসেম্বর ৯৮) এই চিকিৎসকরা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা কার্যে এগিয়ে এসেছেন। যথা—নাক, কান, গলা বিভাগে ডাঃ বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী—এম. বি. বি. এস. (কলি), অর্থপেডিক বিভাগে ডাঃ অমিত গুহ—এম. এস. (কলি), ডাঃ এম. এস. গোস্বামী—এম. বি. বি. এস. (কলি), ডি. জি. ও. (কলি), ডি. আই. সিওজি, এম. এস. (কলি), এম. সি. এইচ. (পি. ডি. টি.) (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) (Paediatric Surgeon Gynocologist) ডাঃ কল্যাণচন্দ্র চন্দ—এম. বি. বি. এস. (কলি). ডাঃ কমল পাণ্ডে—বি. ডি. এস. (দন্ত বিশেষজ্ঞ)। ডাঃ কুনাল পাল—ডি. এম. এস. ডি. ও. এম. এস.—চক্ষু চিকিৎসক, Micro Surgery বিশেষজ্ঞ, আই. ও. এম. এল.। ডাঃ এস. পি. মল্লিক—এম. বি. বি. এস.। ডাঃ পি. কে. মুখার্জী—এম. বি. বি., এস. ডি. টি. সি. ডি. (Lucknow) ডি. পি. এইচ. (কলি), Chest-Physicians এবং টি. বি. বিশেষজ্ঞ। ডাঃ চৈতালী মুখার্জী এম. বি. বি. এস. (কলি), ডি. এম. সি. ডব্লু (কলি), এ ফ. আই. এইচ. জি. পি. (Gynocologist) ডাঃ আর. এম. ঘোষ এম. ডি. (কলি), এফ. আর. এস. এম. (হল্যাণ্ড), এফ. সি. সি. পি. (আমেরিকা), মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও Cardiologist, ডাঃ সঞ্জয়কুমার দাস এম. বি. বি. এস., ডিপ—বি. এম. এস. ডি. এম. আর. টি. (কলি), প্রাক্তন ফেলো ন্যাশানাল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউশন মিশন (ইটালি) ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। ডাঃ সুবীর ব্যানার্জী—এম. বি. বি. এস., ডাঃ উদয়ন দাশগুপ্ত এম. বি. বি. এস., ডিপ.

কার্ড (কলি)। ডাঃ আর. কে. হেস.—এম. বি. বি. এস. ডাঃ দীপশিখা সান্ন্যাল (আর. এম. ও.) এম. বি. বি. এস., ডাঃ কে. পি. ভট্টাচার্য এল. এম. এফ.। প্যাথোলজি বিভাগে ডাঃ টি. কে. ব্যানার্জী ডি. টি. এম., এম. বি. X-Ray বিভাগে ডাঃ জি. কে. পাল এম. ডি. (Radiologist), রাজা ঘোষাল (Physiotherapist)।

ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী নবগ্রামে একটি সুপরিচিত নাম। অধুনা কলকাতার অন্যতম সেরা চিকিৎসক। দেশ বিভাগের পর এই বক্সী পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে এসে নবগ্রামে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। আজও এদের বাড়ি নবগ্রামে অরবিন্দ রোডে বিদ্যমান, শ্রীশ্রী রামঠাকুর ভক্ত পরিবার; অক্ষয় তৃতীয়ায় ঠাকুরের বার্ষিক উৎসবে ডাঃ বক্সী তার শত ব্যস্ততা উপেক্ষা করে উৎসবে উপস্থিত থাকতেন। নবগ্রামের হাসপাতাল উদ্বোধনের দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন না ঠিকই, পরে তিনি পরম আগ্রহে নবগ্রামে এসেছেন এবং এই হাসপাতালে পদার্পণ করেছেন। হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নতির ভাবনায় এই অভিজ্ঞ দেশবিখ্যাত চিকিৎসক হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কর্মী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন। আজও প্রয়োজনে এই অঞ্চলের মানুষ ডাঃ বক্সীর কাছে যেতে পারেন।

অধুনা লণ্ডন অধিবাসী, আদিতে কুমিল্লার মানুষ, পরে বার্মার অধিবাসী এবং শেষে কলকাতার গৃহবধূ, বিবাহ সূত্রে প্রবাসী বাঙ্গালী ডাঃ মল্লিকা দে ঘোষ, শিশু চিকিৎসক। নবগ্রামের আত্মীয় বাড়িতে আসার সুবাদে এই গুণী চিকিৎসককে আমরা পেয়েছি নবগ্রাম গোলক মুন্সী হসপিটালে। তাঁর সুচিকিৎসায় এই হাসপাতালের রোগীরা উপকৃত। ছুটি কাটাতে এসেও এই মহিলা চিকিৎসক চিকিৎসার কাজ থেকে ছুটি নেন না। বরং শিশু বিভাগে অর্থ সাহায্য করে হাসপাতালের উন্নতির কাজে সহায়তা করছেন। আগামীতেও করবেন এ আশা আছে। এঁর পিতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে এম. বি. বোসপুকুরের উত্তর কোনায় বাড়ি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র জ্যোৎস্না দে (গণেশ) সপরিবারে এখানে বাস করেন। ডাঃ মল্লিকের পিসি শ্রীমতী লাবণ্য (দে) সিংহরায়, এবং নারায়ণপ্রসাদ সিংহরায় পিসেমশাই। আদিবর্ষে এঁদের বাড়িতেই ডাঃ মল্লিকা আসেন।

নবগ্রামের গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদনের কাজে ছোট বড় অনেক দান এসেছে। তিল তিল করে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আরও দানের প্রয়োজন হবে। সরকারী সাহায্য কবে আসবে, বা আদৌ আসবে কিনা বলা শক্ত। তবুও নবগ্রামের হাসপাতালের কাজ এগিয়ে চলবে, এটাই

অঙ্গীকার। কাজে কেউ কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন—বড়বহেড়া গ্রামের শ্রীমতী জ্যোৎস্না নাগ তাঁর কন্যার স্মৃতিতে ৮৫,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করেছেন। এই অর্থ শল্য চিকিৎসার টেবিল ক্রয়ে ব্যবহার করা হবে।

শ্রীরামপুরের প্রাক্তন সাংসদ শেওড়াফুলি স্টেশনের অদূরের গঙ্গার নিকট অধিবাসী প্রয়াত জনাব আকবর আলি খন্দ্‌কার-এর সাংসদ তহবিলের দানে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সম্ভব হয়েছে। এজন্য মাননীয় সাংসদ ধন্যবাদের পাত্র। অ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াতকারী রাস্তাটির দুপাশে অধিবাসীদের বদান্যতায়, সাংসদ তহবিলের অর্থে অপেক্ষাকৃত চওড়া করা সম্ভব হয়েছে। রাস্তাটির আরও উন্নতি কাম্য। বস্তুত নবগ্রামের ভবিষ্যৎ ভেবে কয়েকটি রাস্তার দুপাশের জমি অধিবাসীদের সহায়তায় গ্রহণ করে রাস্তা চওড়া-হওয়া এখনও সম্ভব। পরে সম্ভব না-ও হতে পারে। (যেমন হয়েছে কোন্নগরের জি. টি. রোডের বাটা পয়েন্ট থেকে কোন্নগর স্টেশনে ঢোকার ক্রাইপার রোডের আরম্ভের অংশটি।) (যেমন—বিদ্যাসাগর রোড, উত্তর অংশ; বিবেকানন্দ রোড; হরিসভা রোড; বাঘাযতীন রোড)। রাস্তার পাশাপাশি নবগ্রামে ড্রেনের কথাও ভাবতে হবে। কাঁচা ড্রেন পাকা হওয়া দরকার। আর ড্রেনের জল ময়লার নির্গমনের পথ উত্তর-দক্ষিণ এবং আংশিক পশ্চিমে খোলা থাকা দরকার। পূর্বে রেল লাইনের তলার কালভার্টের মাধ্যমে কোন্নগরের জল অনেক সময় নবগ্রামে ঢুকে পড়ে, এটা কাম্য নয়। প্রসঙ্গত দেখা দরকার নবগ্রাম কোন্নগর আণ্ডারপাশের জল জমার ব্যাপারটাও যাতে না হয়, শীঘ্র পাম্প আউট করার ব্যবস্থা। হিন্দমোটরের মাঠে বর্ষার বাড়তি জল রেলের টিকিট ঘরের পূর্বের জমির নীচ দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই এখন আর স্টেশন রোড, দেশবন্ধু রোড প্লাবিত হয় না।

নবগ্রামের শিক্ষার সূচনা ও প্রসার

নবগ্রামের প্রাণকেন্দ্র, সমিতির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনের (২৭জুন, ১৯৫৪) সম্পাদকীয় বিবরণীতে সম্পাদক পরেশচন্দ্র চন্দের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

"বাস্তুচ্যুত, ছিন্নমূল, নিঃসম্বল ও রিক্ত অবস্থায় এইস্থানে আসিয়া আমরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যৌথ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভিক্ষুকের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারি নাই—আত্মসম্মানে বাঁধিয়াছে। আমাদের শিক্ষা, রুচি, কার্যস্পৃহা নূতন আবাস-সৃষ্টির স্বপ্ন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। 'Servival of the fittest'-এর যুগে বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রামে আমরা আত্মনিয়োগ করিলাম। যাহার ফলে এই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৫০টি পরিবার এইস্থানে বসতিস্থাপন করিয়াছেন। অগৌণে আরও শতাধিক পরিবার নবগ্রামে গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করিবেন। জনমানবের পরিত্যক্ত চোর, ডাকাত, দস্যু, সর্প ও শৃগালের আস্তানা সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বাঁশ জঙ্গল লুপ্ত হইয়া সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। নবগ্রাম আজ প্রায় তিন সহস্রাধিক কণ্ঠ মুখরিত আদর্শ পল্লীতে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের বংশধরদের মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার—

—যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা
দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক
—একটা আস্তানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

নবগ্রামের সদস্যরা 'বিত্তশূন্য' শিক্ষিত পরিবার ও চাকরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নবগ্রামের তহবিল হইতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলির মারফতে যদি কিছু মনীষীর আবির্ভাব নবগ্রামে হয় তবেই আমরা এই অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বলিয়া গণ্য করিব।"

তিনি বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন—

১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ৫/৬টি ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া যে Coaching Class আরম্ভ হইয়াছিল বর্তমানে "নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ" ও "নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়" তাহার পরিণত রূপ।

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ

আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। এ যেন সন্ধ্যায়‌ আলো জ্বলবে বলে ভোরের বেলা সলতে পাকানো শুরু। স্বীকৃতি দেবার সময় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নাম দিয়েছিলেন "কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ"। পরে কোন্নগর কথাটি বাদ দেওয়া হয়। তাই নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ নাম হয়।

শচীন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে 'নবগ্রাম সংবাদ' পত্রিকার প্রকাশ হয়েছিল। নবগ্রাম সংবাদের ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭-এর প্রকাশিত পঞ্চম সংখ্যায় 'নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের ইতিকথা' লিখিত হয়েছে—"১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দুই স্বাধীন দেশের জন্ম হল। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে দলে দলে মানুষ এপার বাংলায় চলে এলেন। সে-ই নবগ্রামের আরম্ভ। ১৯৪৮ সাল থেকেই এখানে বসতি শুরু। ফরিদপুরের ভড্ডা গ্রাম থেকে এলেন গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরিদপুর জেলার পালং গ্রাম থেকে শ্রীমতী সুধাকণা দাস, বৃদ্ধা মা ও মাসীমা সহ এলেন ডাক বিভাগের কর্মী প্রফুল্লরঞ্জন দাস। বড়বহেড়া গ্রামে এলেন পুরানো বাড়ি কিনে ফরিদপুর জেলার কার্ত্তিকপুর গ্রামের শৈলেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। পরেশচন্দ্র চন্দ এলেন এবং আরও অনেকে এসে পড়লেন।

বসতি মানেই লেখাপড়া চাই। নবগ্রামে পড়াশুনা শুরু হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকেই। কিন্তু নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের জন্ম তখনও হয়নি। তখন ছিল নবগ্রাম কলোনি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যা পরে হয়েছে আজকের ১নং প্রাইমারি স্কুল।

প্রবোধরঞ্জন গুহের যোগাযোগে অধুনা বঙ্কিম চ্যাটার্জী রোডে অক্ষয়কুমার বসু-রেণুকা বসুর নবনির্মিত বাড়ীতে স্কুল বসত ১৯৪৯ সালে, সেখানে প্রয়োজনে প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসও ছিল। শিক্ষক ছিলেন পরেশনাথ ঘোষ।

১৯৪৯ সাল শেষ হল। নবগ্রামের বিদ্যালয় বসু পরিবারের বাড়ি থেকে বর্ত্তমান আঙিনায় উঠে এল ১৯৫০-এর ৯ই জানুয়ারী তারিখে। বিদ্যালয়ের গৃহ ৩ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি, মেঝে মাটির, ছাউনি টাটা কোম্পানীর টিনের দোচালা, তৈরী করে দিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রী। টাটা কোম্পানীর টিন কম পড়ে যায়। তখন সুকুমার চক্রবর্তীর মারফত টিন সংগৃহীত হয় উপেন্দ্রনাথ দাস-এর বাড়ী থেকে (শ্যামাপ্রসাদ রোড)। বিদ্যালয় গৃহের দ্বার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেছিলেন তখনকার খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। তখন ছিল

কো-এডুকেশন স্কুল। ১৯৫০-এ প্রথম প্রধানশিক্ষক হয়ে এলেন উত্তরপাড়া থেকে জানকীনাথ সরকার, পূর্ব বাংলায় কুমিল্লা শহরের অতি বিখ্যাত স্কুল ঈশ্বর পাঠশালার প্রধানশিক্ষক। বিদ্যাপীঠের প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তখন হাইস্কুলের পূর্ব পাশে বসত। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন গোপালচন্দ্র হালদার, অধুনা পাণ্ডুয়ার কাছে মহানাদ গ্রামে বাড়ি।

জানকীবাবুই বিদ্যালয়ের নাম রাখেন নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ। তাঁরই উত্তরপাড়ার প্রতিবেশী বরিশালের মানুষ অশ্বিনীকুমার দত্তর (১৮৫৬-১৯২৩) আদর্শে অনুপ্রাণিত ইংরাজীর এম.এ. অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী, পুষ্পপ্রিয় দ্বিজেন্দ্রমোহন গুপ্ত এলেন শিক্ষক হয়ে এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। অঙ্কের শিক্ষক হয়ে এলেন ব্যাণ্ডেল থেকে ক্ষীরোদলাল বিশ্বাস। শ্রদ্ধাস্পদ অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী শিক্ষক রূপে এলেন চাঁদপুর থেকে। এ সময়ে ১৯৫১ সালে, একজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিকা ছিলেন, আর দুই জন শিক্ষিকার নামও স্মরণীয়, শ্রীমতী অনিমা কর ও শ্রীমতী বকুল সেন।

জানকীবাবুর পরের প্রধানশিক্ষক ভরদ্বাজ আশ্রমের, নাম কালীপদ মুখোপাধ্যায়। এরপর প্রধানশিক্ষক পদে এলেন ইংরাজীর এম.এ.বি.টি (শ্রীঅরবিন্দ ভক্ত), ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছাত্র নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, তিনি ১৯৫২-এর শুরুতেই চলে গেলেন। এলেন প্রমেশচন্দ্র কর বি.এ.বি.টি.। বিদ্যাপীঠের স্বীকৃতি, বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, সব তাঁরই হাতে।

১৯৫২ সালে প্রাথমিক স্কুল চলে গেল প্রফুল্ল দাসের ভাড়া-বাড়িতে এবং বিদ্যাপীঠ গৃহে ২রা জানুয়ারী থেকে আলাদা বালিকা বিদ্যালয়ের শুরু। প্রথমদিকে কয়েক মাস প্রমেশবাবুই বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই পর্বে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার পদে বালি থেকে এলেন শ্রীমতী লাবণ্য (দে) সিংহরায় এবং নবগ্রামের গৃহবধূ গ্র্যাজুয়েট শ্রীমতী উমা চট্টোপাধ্যায়।

১৯৫২-এর শেষ দিকে এলেন শিবেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য গোয়ালন্দ রাজবাড়ি স্কুল থেকে। প্রমেশ বাবু, দ্বিজেন বাবু, শিবেন বাবু—এই ত্রয়ীর হাতে একটু একটু করে গড়ে উঠল নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ। ১৯৫৩ সালে বিদ্যাপীঠ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃতি পেল না তাই দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা (রঞ্জিত ব্যানার্জী—সি. ব্লক, বিভূতোষ নিয়োগী, পরিতোষ চ্যাটার্জি, শান্তি-মানিক চক্রবর্তী, প্রদোষরঞ্জন দাস (দুলু), তপেন ভট্টাচার্য, লোহিতবরণ রায়, শংকর

সেনগুপ্ত প্রমুখ কোন্নগর, রিষড়া এবং অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররূপে পাস করেন। তাই ১৯৫১ সালে (VIII), ১৯৫২ সালে (IX), ১৯৫৩ সালে (X) হয় এবং ১৯৫৪ সালে প্রথম ছাত্রদল বিদ্যাপীঠ থেকে S.F পাস করল। অর্থাৎ এই ছাত্রদল যখন IX-এ পড়ে তখন বিদ্যাপীঠে দশমশ্রেণী ছিল না। প্রথম উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম—(১) নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, (২) অমলেন্দু দাশগুপ্ত, (৩) অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (৪) সুখরঞ্জন দত্ত, (৫) দেবপ্রসাদ বসু, (৬) অসীমকুমার ভট্টাচার্য, (৭) সব্যসাচী দত্ত, (৮) শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, (৯) নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রমেশচন্দ্র কর মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পরে প্রধানশিক্ষক হন শ্রীরামপুরবাসী রামচন্দ্র ঘোষ। তাঁর অবসর গ্রহণের পর শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রধানশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। যাঁর অকালমৃত্যুর পর বর্তমানে প্রধানশিক্ষক পদে আছেন ড. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

এই শুরু, এই গতি অব্যাহত ভাবে চলেছে। তখনকার নবগ্রামের অধিবাসী একাধিক ব্যক্তি আগ্রহের সঙ্গে বিদ্যাপীঠে শিক্ষাদান সহ বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সন্ধ্যার পরে ইলেকট্রিক তখনও হয়নি বলে, হ্যাজাক জ্বেলে বিনা পারিশ্রমিকে প্রথম পরীক্ষার্থী দলকে পড়িয়েছেন, একথা ভোলা যায় না।

এই সময় হুগলীর ডি.আই. ছিলেন সুশীলকুমার মুখার্জী, ডি. আই. হিসাবে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বিবেচনায়, আয়োজনের কিছু কিছু অসম্পূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করে, সরকারী স্বীকৃতি দেন। এ বিষয়ে মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার প্রমুখের অবদান উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাপীঠের শিক্ষক না হয়েও যাঁরা বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ মুখার্জী, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম স্মরণীয়। সময়ে সময়ে প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেছেন পরেশচন্দ্র চন্দ, জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কানু), চিররঞ্জন ব্যানার্জী, সুকুমার ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তি। বিদ্যাপীঠে সন্ধ্যার পর ইংরাজী ক্লাস নিতেন শ্রীমতী লাবণ্য সিংহ রায়। নবগ্রাম হরিসভা রোডের অমিয় সেনদের বাড়ীতে ক্লাস নিতেন ''সাহিত্য মন্দিরে''র অমিয়কুমার সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নবগ্রাম মাইকেল রোডে দিনের পর দিন ইংরেজী পড়িয়েছেন সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এঁদের সকলের কথাই স্মর্তব্য।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিদ্বয় খোলা হয়েছিল। কলোনির অধিবাসী শ্রীমতী অনিমা কর এবং জ্ঞান চক্রবর্তী মশাই-এর ভাইপো হেরম্বনাথ চক্রবর্তী, পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যৎকিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে এই দুই শ্রেণিতে শিক্ষাদান করেছিলেন। এদিকে কলোনির অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অভিভাবকরা তাঁদের উচ্চশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য উপদেষ্টা সমিতিকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিদ্বয় চালু করতে অনুরোধ করেন। অবশেষে উপদেষ্টা সমিতি এই শ্রেণিদ্বয় চালু করবেন বলে স্থির করেন। অতুলচন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী এই দুই শ্রেণীতে শিক্ষাদানে সাগ্রহে রাজী হন এবং পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালার যশস্বী প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক জানকীনাথ সরকার এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের পদ গ্রহণ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হন। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এই শিক্ষকদের সহায়তায় সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি খোলা হল। উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যতদিন পর্যন্ত কোন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিযুক্ত না হন, ততদিন উচ্চশ্রেণী সমূহে ইংরেজী পড়াতে রাজী হন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় উন্নতির পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

উচ্চশ্রেণীসমূহ খোলার পর পরিচালক সমিতি নতুন করে গঠিত হয়। শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক সভাপতি হন পদাধিকার বলে। মোট ১২ জন সদস্য নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়। গিরীনবাবু ও সত্যবাবু পুনরায় যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এর কিছুদিন পরই চাকরী সূত্রে সত্যভূষণ বাবু বদলি হয়ে চলে যান দুর্গাপুরে। তখন বিদ্যাপীঠের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সি-ব্লকের নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়। বিদ্যাপীঠ আর সহ-শিক্ষামূলক বিদ্যালয় রইল না। বিদ্যাপীঠের প্রথম ছাত্রদল ১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যাপীঠের পাশাপাশি ভোরবেলায় একই গৃহে স্থাপিত নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করল বটে, কিন্তু প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী রূপে। এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা ছিল নিখিল বাবুর। নিখিলবাবু ছিলেন উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরের সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থিনী হিসেবে স্কুল ফাইনাল পাস করে। এদের মধ্যে চিত্রা দাশগুপ্ত, গায়ত্রী দাশগুপ্ত ও বীণা গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতাদের যে স্বপ্ন ছিল, তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলা যায়। আজ সমগ্র হুগলী জেলার উল্লেখযোগ্য স্কুলের মধ্যে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের নাম স্থান পেয়েছে। আজ এটি ১২ ক্লাসের স্কুল, এখান থেকে প্রতিবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্ররা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে। অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টাড এ্যাকাউটেন্ট হয়ে বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা নবগ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করে।

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ এতদঞ্চলে তো বটেই, রাজ্যের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য মাত্রা সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছে তার ৫৩´বছরের যাত্রাপথে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে চারাগাছটির প্রথম অঙ্কুরোদগম, স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতিতেই তা আজ পরিণত এক মহীরুহে। কালের বিচিত্র গতির মধ্য দিয়ে যখন একটি চারাগাছ মহীরুহে পরিণত হয় তখন তার পরিণতির, তার বিকাশের পিছনে থাকে অনেকের অবদান, যত্ন, নিরলস পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের বিকাশের, পরিণতির পিছনেও আছে অগণিত শিক্ষক, শিক্ষাদরদী মানুষের অকুণ্ঠ অবদান।

সেই কৃতজ্ঞতার ও শ্রদ্ধার এবং ভালবাসার মনোভাব থেকেই আমরা প্রয়াসী হয়েছি এমন একটি তালিকা প্রণয়নের, যাতে ধরা থাকবে সেই সব কৃতবিদ্য ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মযোগী পরিচালন সমিতির সভ্যদের নাম যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে বিদ্যাপীঠের সম্মানিত সৌধ নির্মাণ ও পূর্ণবিকাশ।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পরিচালন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, প্রকাশক ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দ ও কৃতীছাত্রদের নামের তালিকা।

সভাপতি

গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী, তাপসচন্দ্র চন্দ, দীপক ভট্টাচার্য, মনোজকুমার বড়াল।

সম্পাদক

সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, সুকুমার চক্রবর্তী, জগদিন্দুনারায়ণ ভট্টাচার্য, বাসুদেব রায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত।

সরকারী প্রশাসক

সুনির্মল মজুমদার, মনোজকুমার বড়াল।

পরিচালন সমিতির অন্যান্য সদস্য

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্র দাশগুপ্ত, ষোড়শীরঞ্জন দে চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ দাস, সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, কালীকুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, রঙ্গলাল দত্ত, নারায়ণ প্রসাদ সিংহরায়, অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত, মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথনাথ রায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত (বড়ো) হরিপদ চক্রবর্তী, শম্ভুদাস চৌধুরী, ডাঃ সুজিত দাস, আশিস মজুমদার, বিমলনারায়ণ চক্রবর্তী, প্রাণতোষকুমার ঘোষ, রমণীমোহন নাগ, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র চন্দ, ক্ষিতীশচন্দ্র কর, জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র হালদার, ডাঃ সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভূপালরঞ্জন চক্রবর্তী, কানাইলাল চ্যাটার্জী, পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রবীর চৌধুরী, অমল পোদ্দার, ত্রিদিব লাহিড়ি, গৌরীশঙ্কর ঘটক, পবিত্রকুমার ভট্টাচার্য, এম. এন. রায়, ডাঃ জে. পি. পাইন, সুভাষচন্দ্র নন্দী, ডাঃ কল্যাণচন্দ্র চন্দ, গৌতম চোংদার, গোবিন্দলাল রায়, অমৃতাভ ব্যানার্জী, অপরূপ ধর, পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল শূর।

বিভিন্ন সময়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষিকা, গ্রন্থাগারিক, করণিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ

প্রধান শিক্ষক

জানকীনাথ সরকার, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, প্রমেশচন্দ্র কর, রামচন্দ্র ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

রতনলাল দে, রণজিৎচন্দ্র দাস, সুকুমার চৌধুরী, সুকুমার চক্রবর্তী।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শিক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা

শিক্ষকবৃন্দ

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ, ক্ষীরোদলাল বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, বিজন লাহিড়ী, হরিপদ রায়, নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্রমোহন গুপ্ত, গোপাল হাজরা, অনিল কৌস্তু, তপনরশ্মি মিত্র,

ডঃ কমলাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিপ্রদাস চক্রবর্তী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নির্মাল্য পাল, যুগল নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পিনাকী নাগ, শুকদেব মুখোপাধ্যায়, দীপককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, প্রদ্যোৎকুমার ভদ্র, প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমীরকুমার মুখোপ্যাধ্যায়, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র দে, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবির সেন, সুনীল সেন, মলয়ভূষণ চক্রবর্তী, অমলকান্তি চক্রবর্তী, শ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার দাস, জ্ঞানরঞ্জন দাস, অরুণকুমার সেন, শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত, বিনোদবিহারী ঘোষদস্তিদার, *শিবেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য, নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী, গৌতম মজুমদার, নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী চৌধুরী, বিশাল দেওসিং, কুমুদবিহারী দত্ত, শিবনারায়ণ দত্ত, বিমলকুমার চক্রবর্তী, তিমিরবরণ চক্রবর্তী, শশধর দাস, সুশীলকুমার চক্রবর্তী, অজিতকুমার দে, অরুণকুমার চক্রবর্তী, সচ্চিদানন্দ রায়, প্রণব ঘোষ, বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুহ, রাজীব দে, *মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, হিরন্ময় চক্রবর্তী, দীপককুমার ভট্টাচার্য্য, অমলকুমার সেনগুপ্ত, অমূল্যকুমার ভট্টাচার্য্য, গিরীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, লক্ষীকান্ত দাশগুপ্ত, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী, ব্রজগোপাল মণ্ডল, অরূপ বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *রতনলাল দে, গোপীবল্লভ সাহা, অনাদিকুমার মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, গৌরাঙ্গ চন্দ্র হালদার, রণজিৎ চন্দ্র দাস, সুকুমার চৌধুরী, *সুকুমার চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, কালিদাস কুশারী, ভূদেব রায়, প্রভাসলাল দাস, *অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, রণেন্দ্র চক্রবর্তী, ব্রতীন সিংহরায়, বিজয়কুমার চক্রবর্তী, হরমোহন ভট্টাচার্য্য, *শ্যামাপ্রসাদ সেন, *স্বরাজ মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার সাহা, *জগদীশচন্দ্র বসু, বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব রায়, সুধীন্দ্রকুমার নাগ, রণজিৎ সেনগুপ্ত, *হিরন্ময় দাশগুপ্ত, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপকলাল ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ দে, গোপালচন্দ্র সাহা, সুখেন্দু সেনগুপ্ত, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নীলরতন সরকার, কানাইলাল চক্রবর্তী, সনাতন বাগ, অমলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত, দীপক পোদ্দার, সুভাষচন্দ্র ঘোষ, বাসুদেব দাস, বিজনবিহারী চক্রবর্তী, সব্যসাচী কোনার, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, চন্দ্রশেখর বিশ্বাস, গৌতম ভবানী, সুব্রত সেন, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বৈদ্য, তপনকুমার সাহা, প্রবীর

পোদ্দার, অমিতাভ সেন, স্বপন ঘোষ, গোপাল ঘোষ, পরিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত বড়ুয়া, প্রদীপকুমার রায়, প্রকাশচন্দ্র দত্ত, শঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীমতী প্রীতিকণা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী সুপর্ণা গাঙ্গুলী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, আনন্দচন্দ্র মণ্ডল, তরুণ মণ্ডল, শুদ্ধকর চক্রবর্তী, সুধীর কুণ্ডু, সুধাংশুশেখর খান, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, ভবতোষ চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ বসু, চিত্তরঞ্জন বাগ, আবদুল হাই মণ্ডল, শুভেন্দু মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সংবর্ত তরফদার, মেঘনাদ মণ্ডল, কৌশিক মুখোপাধ্যায়।

যে সকল শিক্ষকের পাশে * চিহ্ন আছে তাঁরা বিভিন্ন পরিচালন সমিতিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত।

করণিকবৃন্দ

হর্ষনাথ চক্রবর্তী, হরিজীবন দাস, অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন দত্ত, বিধুভূষণ চক্রবর্তী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, রামপদ মুখোপাধায়, লীলাময় দাশগুপ্ত, দশরথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র দত্ত, গৌরীশঙ্কর চন্দ্র, মৃণালকান্তি পাল।

পরিচালন সমিতির শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

গ্রন্থাগারিক

শেখর দে

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

যজ্ঞেশ্বর দে, নারায়ণচন্দ্র দাস, দীপক গাঙ্গুলী, অজিত ভট্টাচার্য, নির্মল পোদ্দার, চঞ্চল রায়, শৈলেন সরকার, ভবতোষ চক্রবর্তী, বলরাম দে, মহেশ পণ্ডিত, স্বপন মুখার্জী, অজিত দেব, লক্ষ্মীনারায়ণ বাগ।

১৯৪৮ সালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৫৪ সালে প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার স্বীকৃতি লাভ হয়। এরপর ১৯৬১ সাল থেকে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে শুরু উচ্চ মাধ্যমিক (নবম-দশম-একাদশ শ্রেণী) এরপর বাণিজ্য বিভাগ শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। তাই কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় ১৯৬৪ সালে এবং বাণিজ্য বিভাগের ১৯৬৯ সালে। এরপর আবার পাঠক্রমের পরিবর্তন হয়। শুরু হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ)। মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম হয় ১৯৭৬ সালে এবং

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় ১৯৮১ সাল। এই পরীক্ষাগুলিতে কৃতী ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রথম হয় তাদের নামের তালিকা দেওয়া হল।

স্কুল ফাইনাল

১৯৫৪ সাল	ঃ	অমলেন্দু দাশগুপ্ত
১৯৫৫ সাল	ঃ	মলয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী
১৯৫৬ সাল	ঃ	রণজিৎ গুহরায়
১৯৫৭ সাল	ঃ	তিমিরবরণ চক্রবর্ত্তী
১৯৫৮ সাল	ঃ	শিশিররঞ্জন দে চৌধুরী
১৯৫৯ সাল	ঃ	মনোজকুমার ভট্টাচার্য
১৯৬০ সাল	ঃ	স্বপনকুমার রায়
১৯৬১ সাল	ঃ	কীর্তিভূষণ চক্রবর্ত্তী
১৯৬২ সাল	ঃ	প্রিয়তোষ চৌধুরী

কৃতী ছাত্রদের নামের তালিকা

উচ্চমাধ্যমিক

সাল	কলা বিভাগ	বিজ্ঞান বিভাগ
১৯৬৪	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রসূন মুখোপাধ্যায়
১৯৬৫	সনৎ রায়	চিন্ময় চক্রবর্তী
১৯৬৬	কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	সমরেশ চক্রবর্তী
১৯৬৭	অমলকুমার বসু	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৮	সঞ্জীবকুমার চট্টোপাধ্যায়	শরদিন্দু চন্দ্র

সাল	কলা বিভাগ	বিজ্ঞান বিভাগ	বাণিজ্য বিভাগ
১৯৬৯	শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী	নায়ারণচন্দ্র দাস	কল্যাণ মজুমদার
১৯৭০	রমেন্দ্র চক্রবর্তী	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শৈলকুমার নন্দী
১৯৭১	অনুপকুমার চৌধুরী	প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৯৭২	অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রবীররঞ্জন চক্রবর্তী	সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য
১৯৭৩	মানস চৌধুরী	দেবাশীস ভট্টাচার্য্য	শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

মাধ্যমিক		উচ্চমাধ্যমিক	
সাল	(দশম)	বিজ্ঞান বিভাগ	বাণিজ্য বিভাগ
১৯৭৪	মৃণালকান্তি চক্রবর্তী	পার্থসারথী ঘোষ	প্রদীপ কুশারী
১৯৭৫	মানবেন্দ্র দাস	কুমারেশ চক্রবর্তী	অসিতকুমার দে
১৯৭৬	শ্যামল ব্যানার্জী	দেবাশীস ঘোষ	প্রণব নাগ
১৯৭৬	অরুণ চক্রবর্তী		
১৯৭৭	কল্লোল মণ্ডল		
১৯৭৮	প্রদীপ চক্রবর্তী		
১৯৭৯	তুষারকান্তি দাস		
১৯৮০	বিমান কুমার ভট্টাচার্য		
১৯৮১	গৌতম চ্যাটার্জী	তাপসকুমার ভাদুড়ী	কল্লোল নন্দী
১৯৮২	পার্থ চ্যাটার্জী	সঞ্জীব ব্যানার্জী	সঞ্জয়কুমার দত্ত
১৯৮৩	অভিজিৎ চৌধুরী	সুব্রত দাস বর্মন	দীপঙ্কর ঘোষ
১৯৮৪	অর্ঘ কুণ্ডু	বিভাস চক্রবর্তী	আশীসকুমার ভট্টাচার্য্য
১৯৮৫	রাজীব ভট্টাচার্য্য	বিপ্লব চৌধুরী	আলোকেশ রায়
১৯৮৬	জয়ন্ত স্যান্যাল	গুপীনাথ ভাণ্ডারী	দেবব্রত মুখার্জী
১৯৮৭	রাজেশ মজুমদার	রাজীব ভট্টাচার্য্য	চন্দন ব্যানার্জী
১৯৮৮	গৌতম চক্রবর্তী	জয়ন্ত সান্যাল	রাজীব দে
১৯৮৯	মৌলিন্দু চ্যাটার্জী	সুকান্ত গাঙ্গুলী	সুদীপ উকিল
১৯৯০	সৌরভ চক্রবর্তী	গৌতম চক্রবর্তী	ভাস্কর ভট্টাচার্য্য
১৯৯১	দেবাংশু সাহা	রাহুলদেব চক্রবর্তী	সর্বাশিস ভট্টাচার্য্য, অনুপ ব্যানার্জী } যুগ্ম
১৯৯২	সুমিত চক্রবর্তী	রাজীব ব্যানার্জী	মনোজ বড়ুয়া
১৯৯৩	রুদ্রনীল সেন	প্রণব পাড়ুই	অনির্বান দত্ত
১৯৯৪	পূর্ণাভ মজুমদার	সুমিত চক্রবর্তী	সুমিত মুখার্জী
১৯৯৫	অনিমেষ দত্ত	রমেন দে	শুভ্র দাস
১৯৯৬	সৌরভ চক্রবর্তী	পূর্ণাভ মজুমদার	চিরঞ্জীব দেব
১৯৯৭	উজ্জ্বল মজুমদার	অনিমেষ দত্ত	অমিত দাস
১৯৯৮	অনিরুদ্ধ কোণার	সৌরভ চক্রবর্তী	সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয়

২০০২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে রবীন্দ্র মুক্তবিদ্যালয় নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ পাঠকেন্দ্রের পঠনপাঠন শুরু হয়। যদিও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১২ই জানুয়ারী যুবদিবসের পবিত্র দিনে। আর্থসামাজিক কারণে অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে যাঁরা বিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন, পরিবারের বা বন্ধুজনের সহায়তায় সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেও বয়সসীমা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ের দরজা যাঁদের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁদের জীবনে সেই দরজা পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই পাঠকেন্দ্র স্থাপনা। এই ব্যবস্থায় পাঠ নিয়ে মুক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হতে পারবেন। কেউ কেউ এই ব্যবস্থাকে বিকল্প শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেবে ভুল করেন। বাস্তবে এটি হল প্রচলিত ব্যবস্থার পরিপূরক শিক্ষা-ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে প্রায় ১৬০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী এই পাঠকেন্দ্রে পাঠ গ্রহণ করেছেন ও করছেন। এই উদ্যোগকে আরো বিকশিত করতে হবে। পিছিয়ে-পড়া মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। প্রকল্পের সূচনায় এই ছিল অঙ্গীকার। সকলের একান্তিক সহযোগিতায় সেই অঙ্গীকার পালনে সার্থক হবো আমরা।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

স্টুডেন্ট হেলথ্ হোম

বিদ্যালয়ে স্থাপিত হেলথ হোমে সপ্তাহে সোম, বুধ ও শুক্রবার চিকিৎসকদের পরামর্শ ও ঔষধ ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়।

নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ের কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে। বয়স বিচারে এই স্কুলকে সমবয়সী মনে করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম ছাত্রদলের উত্তীর্ণ তালিকা ভিত্তিতে বালিকা বিদ্যালয়কে ১ বছরের পরের স্কুল বলে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীদল ১৯৫৫ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করে। প্রথম উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে দু-একজনের নাম উল্লেখ্য—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা-সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরী সিংহরায়, পিতা ললিত সিংহরায়। অদিতি পাইন, বকুল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের নাম বদল হল। দাতা হীরালাল পালের ইচ্ছানুসারে নতুন নাম হল নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়। ঢাকা নারায়ণগঞ্জের মানুষ হীরালাল পাল ছিলেন নিমতলার কাষ্ঠ ব্যবসায়ী, লেখাপড়া ভালবাসতেন। নবগ্রামে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের যোগাযোগ হয়েছিল প্রিয়মোহন চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন সরকারের মাধ্যমে। প্রথমে নবগ্রাম হরিসভায় তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং তারপরই বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং এরপর কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগে হীরালাল পাল নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ স্থাপনে অর্থ দান করেন। দাতার ইচ্ছানুযায়ী দাতার নামে কলেজের নামকরণ হয় ১৯৫৭ সালে।

শ্রীমতী লাবণ্য (দে) সিংহ রায় ১৯৫২-৫৪ সাল পর্যন্ত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে এলেন মণিকা মিত্র বি.এ.বি.টি. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহে। অতঃপর লাবণ্য সিংহ রায় সহ-প্রধানশিক্ষিকা এবং মণিকা মিত্র প্রধান শিক্ষিকা পদে বৃত হন। দিনমানে আলাদা স্কুল হবে এটা সকলেই চাইত। তাই ক্রমে আলাদা স্কুলবাড়ি হল বর্তমান জমিতে। আর বিদ্যাপীঠের গৃহে সকালে স্কুল রইল না। বেশ মনে পড়ে এক শুভদিনে শঙ্খ-ধ্বনির মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। তখনও স্কুলের নাম ছিল নবগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়। তারপর নতুন বাড়িতে হীরালাল পাল মহাশয়ের উপস্থিতিতে নতুন স্কুলবাড়ির উদ্বোধন হল। তখন স্কুলবাড়ি বলতে ছিল এল প্যাটার্নে রাস্তার দিকে পশ্চিম-উত্তর কোনা ধরে লম্বা একতলা বাড়ি। উদ্বোধনের দিন প্রস্তরফলকটি উন্মোচিত হল। ভিটের দক্ষিণের দিকের মধ্যাংশের দরজায়, তখনও ঘরের সামনে

বারান্দা হয়নি। তখনকার বালিকা বিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক সদস্য ছিলেন নলিনীমোহন দাস, দীর্ঘদেহী মানুষ। প্রথানুযায়ী ওই প্রস্তর ফলকের ঢাকাটি নলিনীবাবুই খুলে দিয়েছিলেন।

নবগ্রামের বুকে বালিকা বিদ্যালয় সগৌরবে পথ চলেছে। নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয় নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের যোগ্য পরিচালনায় প্রথম থেকেই একটা ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

নিখিলবাবুকে গঠনমূলক কাজে সহায়তা করেছেন এক গুণীমানুষ, বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য, মৃগাঙ্কপ্রসাদ গুহ মহাশয়। এমন হত, নিখিলবাবু কলকাতা থেকে পরিচালক সমিতির সদস্য চন্দ্রভূষণ ভট্ট মহাশয়ের মাধ্যমে খবর পাঠালেন, কোন একটা কাজে সরকারি অর্থ প্রাপ্তির জন্য আঁকা-ম্যাপ ও খরচের হিসাব, প্ল্যান ও এস্টিমেট সহ অচিরে জমা দিতে হবে। একাজে দক্ষ মানুষ ছিলেন মৃগাঙ্কপ্রসাদ মহাশয়। যথাসময়ে সরকারী অনুমোদন এল, তখনই বিদ্যালয় গৃহের উত্তরাংশে চরণ কাঁড়ারের পুকুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে তৈরী হল শিক্ষিকাদের আবাস গৃহ। খেলাধুলার আয়োজন চলতে থাকে, পাঁচিল ঘেরা জমিতে। তবে এই জমি বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পক্ষে উপযোগী নয়। শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁদের দূরে বাড়ি তাদের কেউ কেউ এই আবাসগৃহে অবস্থান করেন অপেক্ষাকৃত কম খরচে।

নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠাগারটি সু-পরিচালিত। অনেক বই, আলাদা পাঠাগার গৃহ, মধ্যে বড় টেবিল, প্রয়োজনে বসে বই পড়া যায়। আনন্দের বিষয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সুনাম অছে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়। এই স্কুলে পাস করা ছাত্রী হয়েছে M.B.B.S.ডাক্তার, ডব্লু.বি.সি.এস. অফিসার ইত্যাদি। প্রথম দিক্‌কার এক ছাত্রী মালবিকা বক্সী, পিতা স্নেহাংশুভূষণ বক্সী। মালবিকা বিহারের একটি কলেজের অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রী-অবস্থায় মালবিকা ইংরাজী কবিতা, "The Song of the night at day break"-এর বাংলা অনুবাদ করেছিল—

"রজনী কাঁদিয়া বলে
যাই আমি যাই
দিনের আলোতে মোর
সাথি কেহ নাই...........।"

('নবগ্রাম'-মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত)

ঠিক নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের মতন নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়েও

বহু দূরদূর থেকে ছাত্রীরা পড়তে আসে। কোন্নগর থেকে তো বটেই, রিষড়া অঞ্চলের বহু ছাত্রী এখানে পড়ার সুযোগ পেলে আর অন্য কোথাও পড়তে যায় না। চন্দননগরের "English Language lovers' Association" প্রদত্ত পুরস্কার পেয়েছে এই স্কুলের ছাত্রী, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরাজীতে সমগ্র হুগলী জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এই পুরস্কার পেয়েছে, নাম অনুরিয়া দে, পিতা রাজীব দে।

জাতীয় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীবৃন্দের তালিকা

	নাম	সাল	বিভাগ	মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক
১.	সুব্রতা চক্রবর্তী	১৯৭০	কলা		,,
২.	হৈমন্তী চক্রবর্তী	১৯৭৩	,,		,,
৩.	কৃষ্ণা চক্রবর্তী	১৯৭৩	বিজ্ঞান		,,
৪.	রাজ্যশ্রী গুহঠাকুরতা	১৯৭৪	,,		,,
৫.	শর্মিলা বশিষ্ঠ	১৯৭৪	,,		,,
৬.	বনানী সাহা	১৯৭৬	,,		,,
৭.	মধুছন্দা আইচ	১৯৭৯		,,	
৮.	সুজাতা দাস	১৯৮০		,,	
৯.	অপর্ণা চক্রবর্তী চৌধুরী	১৯৮০		,,	
১০.	সুস্মিতা দাস	১৯৮০		,,	
১১.	তুলিরেখা সরকার	১৯৮২		,,	
১২.	মৌসুমী চ্যাটার্জী	১৯৮২		,,	
১৩.	শুভ্রা সান্যাল	১৯৮৩		,,	
১৪.	জয়তী মিত্র	১৯৮৩		,,	
১৫.	দীপান্বিতা ব্যানার্জী	১৯৮৩		,,	
১৬.	ছন্দা চৌধুরী	১৯৮৩		,,	
১৭.	রুমা দাস	১৯৮৩		,,	
১৮.	সীমা চ্যাটার্জী	১৯৮৩		,,	
১৯.	মহুয়া গুহ	১৯৮৪		,,	
২০.	মহাশ্বেতা মহাপাত্র	১৯৮৪		,,	
২১.	বনানী বসু	১৯৮৪		,,	
২২.	সান্ত্বনা প্রামাণিক	১৯৮৬		,,	

	নাম	সাল	বিভাগ	মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক
২৩.	খেয়া গুহ	১৯৮৭		,,	
২৪.	মৈত্রেয়ী সাহা	১৯৮৮		,,	
২৫.	অদিতি চক্রবর্ত্তী	১৯৮৯		,,	
২৬.	মানসী চক্রবর্ত্তী	১৯৮৯		,,	
২৭.	তনিমা চৌধুরী	১৯৯০		,,	
২৮.	নন্দিনী মজুমদার	১৯৯০		,,	
২৯.	তমালী রায়	১৯৯০		,,	
৩০.	অনিন্দিতা রায়চৌধুরী	১৯৯১		,,	
৩১.	মানসী চক্রবর্ত্তী	১৯৯১			,,
৩২.	সুপালি কর	১৯৯২		,,	
৩৩.	মল্লিকা ধর	১৯৯৩		,,	
৩৪.	রিখি দে	১৯৯৪		,,	
৩৫.	সুমি রায়	১৯৯৫		,,	
৩৬.	মৌমিতা বেরা	১৯৯৬		,,	
৩৭.	সঞ্চারী সিদ্ধান্ত	১৯৯৭		,,	
৩৮	মধুরিমা দাস	১৯৯৮		,,	
৩৯.	মৌমিতা সেনগুপ্ত	১৯৯৯		,,	
৪০.	অনুরিয়া দে	২০০০		,,	
৪১.	সায়ন্তনী দত্ত	২০০১		,,	
৪২.	নবনীতা চক্রবর্ত্তী	২০০২		,,	
৪৩.	অমৃতা সিন্‌হা	২০০৩		,,	
৪৪.	অনন্যা ভট্টাচার্য্য	২০০৪		,,	
৪৫.	সুদেষ্ণা পাল	২০০৫		,,	
৪৬.	রুমা ঘোষ	১৯৯২			,,
৪৭.	মৌ ভট্টাচার্য্য	১৯৯৩			,,
৪৮.	চন্দ্রানী দাশগুপ্ত	১৯৯৪			,,
৪৯.	শুভা চক্রবর্ত্তী	১৯৯৫			,,
৫০.	নবনীতা সেনগুপ্ত	১৯৯৬			,,
৫১.	সুমি রায়	১৯৯৭			,,
৫২.	অন্তরা দে	১৯৯৮			,,

প্রধান শিক্ষিকার তালিকা

নাম	সাল
১. মনিকা মিত্র	০১-০১-১৯৫৪ - ৩১-০১-১৯৭৮
২. হাসিকণা রায়	০৬-০৭-১৯৭৯ - ১৯-১২-১৯৮৮
৩. ভারতী সেন	২৯-০৪-১৯৯২ - এখন পর্য্যন্ত

দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা বলা হল—(১) ছেলেদের স্কুল নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, (২) নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নবগ্রামে সোসাইটি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ এই দুই পক্ষই, দুইপক্ষ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে নবগ্রামের জন্ম লগ্ন থেকেই সোসাইটি পক্ষ স্কুল স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। আমরা দেখেছি সীমিত আয়ের মধ্য থেকেই ২টি বিদ্যালয়ের জমি যথাসময়ে সংগৃহীত হয়েছে, বিদ্যালয় গৃহ তৈরী হয়েছে একটু একটু করে। প্রথমে বিদ্যাপীঠের কথাই বলা যাক।

প্রথমে বিদ্যাপীঠ এবং পরে বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা করা হল। দীর্ঘকাল মামলা চলল। অনেক সময় গেল, অর্থ ব্যয় হল। অবশেষে মামলার রায় বের হল। দুই জায়গাতেই মহামান্য হাইকোর্ট আদেশ দিলেন সোসাইটিকেই স্কুল দুটির প্রতিষ্ঠাতা বলে মেনে নিতে হবে। সোসাইটির নামান্তর সম্পূর্ণ বৈধ, অতএব নবগ্রাম সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি লিমিটেড ও হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড এক এবং অভিন্ন সংস্থা। এরপর প্রথমে বিদ্যাপীঠে সোসাইটি মনোনীত প্রার্থী গৃহীত হলেন এবং তারপর বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী সোসাইটি মনোনীত প্রার্থী স্থান লাভ করলেন।

নতুন আদেশ বলে বিদ্যাপীঠ সেই পুরাতন সদস্যকেই ফিরিয়ে নিলেন সদস্য হিসাবে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অতঃপর বিদ্যাপীঠের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য রূপে কাজ করছেন। পরবর্তীকালে এই পদে এসেছেন নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের বহুদিনকার সম্পাদক সুকুমার চক্রবর্তী, ননীগোপাল শূর। নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই ঘটনা ঘটল। হাইকোর্টের আদেশবলে অধ্যাপক নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করলেন। এখানেও পরবর্তীকালে সোসাইটি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে এসেছেন দীপক পোদ্দার, রণজিৎচন্দ্র দাস।

নবগ্রাম হাইস্কুল

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের পক্ষে সকল ছাত্রকে স্থান দেওয়া সম্ভব হল না। স্নি-ব্লক অঞ্চলে একটা স্কুল দরকার। এইভাবেই নবগ্রাম হাইস্কুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। আরম্ভ লগ্নে হাইস্কুলের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন হিমাংশু বসু মহাশয় ও সভাপতি পদে নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত। মাথায় চুল কম, মৃদু হাসি, অক্লান্ত কর্মী হিমাংশু বাবু। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ হল। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল একটি সহ-শিক্ষামূলক হাইস্কুল। ফলে কেবল নবগ্রামের মানুষই নন বৃহত্তর নবগ্রামের মানুষ ছোটবহেড়া, বড়বহেড়া, বাঁশাই, ন-পাড়ার ছাত্র-ছাত্রী পড়ার সুযোগ পেল। সেদিক থেকে এই স্কুল পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে কাজ করে চলেছে। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হরমোহন ভট্টাচার্যের পত্নী প্রয়াত বাসন্তী ভট্টাচার্য এই স্কুলে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে পড়িয়েছেন। নবগ্রাম বিবেকানন্দ রোডের মধ্যভাগের অধিবাসী ইতিহাসের এম.এ. ঁরতন রায় এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘকাল। বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব লগ্নে (১৯৮৮) প্রধান শিক্ষক রতন রায় দায়িত্ব নিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন।

বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকদের নামের তালিকা

সুহৃদ ভাদুড়ী, রতনকুমার রায়, প্রদীপরঞ্জন চক্রবর্তী, আনন্দমোহন পাল, সুরিতকুমার সাহা (টিচার-ইন-চার্জ)।

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ

হাওড়া ব্যাণ্ডেল লাইনের যাত্রাপথে কোন্নগর স্টেশন অতিক্রম করে একটু গেলেই বাঁদিকে চোখে পড়বে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ। আম, লিচু বাগান ঘেরা ইংরেজী অক্ষর ইউ-আকৃতির দোতলা বাড়ি, সম্মুখে দু-পাশে দুই বিরাট পাম গাছ, কিছু কিছু সেগুন গাছ চোখে পড়ে। এই কলেজটি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীন, পরে কিছুকাল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, তারপরে আবার শ্রীরামপুর পর্যন্ত সমস্ত কলেজই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলছে।

নবগ্রামের জন্মলগ্নের ভাবনা ছিল এখানে গতানুগতিক বি.এ., বি.এসসি., বি.কম.-এর কলেজ না হয়ে একটা কর্মমুখী টেকনিক্যাল স্কুল বা কলেজ হোক। ভাবনাটা এইরূপ যে কাছাকাছি কলকারখানায় চাকরী পেতে সুবিধা হয় এরকম টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হবে। ১৯৫৫ সালে নবগ্রামে 'বোর্ড অফ হায়ার এডুকেশন' গঠিত হয়। এদের মাধ্যমে রেল লাইনের ধারে ধারে কিছু জমি বাগান, পুকুর, ঝিল কেনা হল। সেগুলো প্লট প্লট করে বিক্রি করা হল। নতুন নতুন বাড়ি গড়ে উঠল। ১৯৫৬ সালে পুজোর সময়ই শ্রদ্ধেয় সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্যের মুখে কলেজ স্থাপনার কথা শুনতে পাওয়া গেল। দাতা হীরালাল পালের নিমতলার বাড়িতে যোগাযোগের কাজ এগিয়ে চলল। তখন সোসাইটির গোলক মুন্সী পাড়ার স্থাপনার ব্যাপারটাও এই কলেজের সাথে সম্পৃক্ত। কোন্নগর মাষ্টার পাড়ার অধিবাসী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁরই অধ্যাপক মাষ্টার পাড়ার নিবাসী ডঃ অমল চৌধুরী নবগ্রামে কলেজ স্থাপনায় এগিয়ে এলেন। নবগ্রামের সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, প্রিয়মোহন চক্রবর্তী, হেম চক্রবর্তী ঠাকুর, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ভট্টাচার্য্য, নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত, বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত কলেজ স্থাপনা কার্যে এগিয়ে এলেন। গোলক মুন্সী পাড়ার ডঃ পরেশচন্দ্র চৌধুরী (নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ও তাঁর আত্মীয় ব্যারিষ্টার এ.পি. চৌধুরী কলেজ স্থাপনা কার্যে সহায়তা করলেন। হীরালাল বাবুর আগ্রহে 'নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি লিমিটেড'-এর সম্পাদক পদাধিকার বলে কলেজ গভর্নীং-বডির সদস্য মনোনীত হন। এই পর্বে কলেজ স্থাপনার ক্ষেত্রে নবগ্রাম বঙ্কিমচন্দ্র রোডের অধিবাসী প্রয়াত কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়-এর ভূমিকা অতি উল্লেখযোগ্য।

দাতার ইচ্ছানুযায়ী কলেজের নাম হল নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ। হীরালাল বাবু তখন জীবিত। মাঝে মাঝেই তিনি কলেজের কাজে কলেজে আসতেন। একজন ভাল প্রিন্সিপাল চাই। এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষপদে এলেন ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের জামাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তখন কলেজের মধ্যাংশের একতলা তৈরী হয়েছে। কলেজে ঢুকতেই ডানদিকে সিঁড়ি-ঘরে অধ্যক্ষের অফিস, আর বাঁদিকে অধ্যাপকদের বসবার ঘর। ১৯৫৭ সালে কলেজ শুরু হল। কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তখনকার পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ডাঃ বিধানচন্দ্র নবগ্রামে সেই একবারই এসেছেন।

সেই কলেজ আজ বি.এ., বি.এসসি., বি.কম. পড়ার একটি পূর্ণ কলেজ। কয়েকটি বিষয়ে অনার্সও পড়ানো হয় এখানে। বিজ্ঞান বিভাগের আরও শ্রীবৃদ্ধি আমরা আশা করি। বাংলা বিভাগ ও বি.কম. অনার্সে এ কলেজের থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ছাত্র ভর্তি হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন তারকেশ্বরের প্রত্যন্ত গ্রামে পর্যন্ত এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর দেখা মিলত। তারকেশ্বরের কংগ্রেস এম.এল.এ. বলাই শেঠ এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন।

কলেজের পাঠাগারটি সমৃদ্ধ, সু-সজ্জিত। এতে ছাত্ররা উপকৃত হয়। কলেজের বাইরের মানুষও এই পাঠাগারের সাহায্য পেয়ে উপকৃত। কয়েক বছর হল 'নেতাজী ওপেন ইউনিভারসিটি'র কেন্দ্র হিসাবেও কলেজটি পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে নবগ্রামের এবং বাইরের, দূরবর্তী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরও পড়াশোনার আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের গবেষক, একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সূচনা কালে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনারায়ণ সাহা

সূচনাকাল থেকে অধ্যাপনা এবং প্রশাসনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন—ছাত্র সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনারায়ণ সাহা। দর্শনের অধ্যাপক, অধ্যাপনার সঙ্গে বহুবার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভাইস প্রিন্সিপাল, টিচার-ইন-চার্জের পদও তাঁকে একাধিকবার নিতে হয়েছে। ছাত্রদরদী,

একাধিক গুণের অধিকারী, সমাজসেবী মানুষটির কলেজ উন্নয়ন ছিল 'দিবসের সাধনা, রাত্রের স্বপ্ন।''

সম্প্রতি তাঁর গুণগ্রাহী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনারায়ণ সাহা স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছে। এবং ''সীমার মাঝে অসীম'' নামে তাঁর সম্পর্কে একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

জনপ্রিয় টি.ভি. অভিনেতা, সিনেমায় অংশগ্রহণকারী বেহালাবাসী অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে ইংরাজী পড়াতেন।

কোন্নগরে আর কলেজ নেই। এই অর্থে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজই কোন্নগরের কলেজ। আরম্ভ লগ্ন থেকেই কলেজটি সহ-শিক্ষামূলক, কত ছাত্রী, কত গৃহবধূ এই কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আজ নবগ্রামের ঘরে ঘরে গড়ে ৩ জন করে গ্র্যাজুয়েট বর্তমান এবং এর পেছনে এই কলেজের অবদান স্বীকার করতেই হবে। পাঠক হয়ত জেনে খুশি হবেন যে নবগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা বিশ্বাস এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্রী। এই কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বীকৃত পরীক্ষা কেন্দ্র। তাই নবগ্রামবাসী, চাকরীরত ছাত্র বা ছাত্রী এই কলেজ থেকে বহিরাগত-পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় পাস করে আপন আপন জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। কলেজটি ইউ.জি.সি-এর অন্তর্গত। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছুমাত্র আর্থিক অনুদান ছাড়াই ইউ.জি.সি.-এর দানে দোতলা বাড়ি সম্প্রতি সুসম্পন্ন হয়েছে। কলেজের অগ্রগতিতে নবগ্রামের ভূমিকা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
স্মারক
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ সাল, নবগ্রাম উচ্চশিক্ষা পরিষদ
নবগ্রাম (কোন্নগর), জেলা-হুগলী

নবগ্রাম উচ্চশিক্ষা পরিষদ-এর সভ্যগণ

১। গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ.—সভাপতি
২। প্রিয়মোহন চক্রবর্তী —সহ-সভাপতি
৩। মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য, —সহ-সভাপতি

৪। কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়, বি.এসসি.,—সম্পাদক

৫। সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম.এ.,সি.এ.আই.আই.বি.—সহ-সম্পাদক

৬। জীবনকৃষ্ণ সরকার—কোষাধ্যক্ষ

৭। তারকদাস চট্টোপাধ্যায়, বি.এ.

৮। জনরঞ্জন সেন

৯। হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর

১০। বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম.এ

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের গভর্নিং বডির সভ্যগণ

১। এস.এম. ভট্টাচার্য, আই.এ.এস. (জেলা শাসক)—সভাপতি

২। গ্রেগোরী গোমেশ (মহকুমা শাসক)—সহ-সভাপতি

৩। তারকদাস চট্টোপাধ্যায়-(সভাপতি, কোন্নগর পৌরসভা)—সহ-সভাপতি

৪। হীরালাল পাল—সহ-সভাপতি

৫। সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম.এ.; সি.এ.আই.আই. বি.—সম্পাদক

৬। বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম.এ., বি.কম.

৭। সুনীল সেনগুপ্ত, এম.এ.

৮। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৯। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ভট্টাচার্য, বি.এ.

১০। অজিতপ্রসাদ চৌধুরী, বার-এট-ল

১১। নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম.এ.; এ.এম.আই.ই.

প্রিন্সিপাল/টিচার-ইন-চার্জ-এর নামের তালিকা

১। ডঃ টি. সি. দাশগুপ্ত

২। জে. কে. গাঙ্গুলী

৩। এস. কে. ব্যানার্জী

৪। এস. এন. সাহা

৫। এস. সি. চক্রবর্তী

৬। এন. কে. ভৌমিক

৭। এইচ. পি. ঘোষ

৮। এ. সি. ঘোষ

৯। ডঃ এ. কে. মুখার্জী

১০। এন. এন. চ্যাটার্জী

১১। ডঃ অলোক নাথ দাস

১২। ডঃ তপনকুমার পান

শিশুভারতী

নবগ্রামে এক স্রষ্টা মানুষ ছিলেন কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রধানত তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে শিশুভারতী। কেন্দ্রটি নবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এর শুরু বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে। নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, জগদীশ বসু, দ্বিজেশ ঘোষ, প্রমুখের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি একটু একটু করে বড় হয়েছে।

বর্তমানে স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (চক্রবর্তী) (অঙ্কের অধ্যাপক, হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ)। এই স্কুলে একদা যুক্ত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিবেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রতনলাল দে। এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের পদ থেকে যথাসময়ে অবসর নিয়েছেন শ্রীরামপুরবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী জলপাইগুড়ির বকসা জেলের বন্দী কালীপদ সেনগুপ্ত।

পাইওনীয়ার্স গ্রুপ

নবগ্রামে শিশুদের প্রতিভা বিকাশের জন্য ১৯৭২ সালে স্থাপিত হয় 'পাইওনীয়ার্স গ্রুপ ননফরম্যাল এডুকেশন সেন্টার।' প্রতিষ্ঠাতা কবীর সুর চৌধুরীর নেতৃত্বে সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক, ক্যাম্পিং, হাইকিং, বিজ্ঞান মডেলিং, সমাজসেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা, বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান, অগ্নি নির্বাপক দল গঠন, ফটোগ্রাফি শিক্ষণ, দেওয়াল পত্রিকা ও হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, নবগ্রামে প্রথম ছড়া প্রদর্শনী, শিশুদের সঙ্গীত, আবৃত্তি, আলপনা, বানান প্রতিযোগিতা, কুইজ কনটেস্ট, চলমান রবীন্দ্রজয়ন্তী ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ১৫ বৎসর ধরে পাইওনীয়ার্স গ্রুপ মানুষ গড়ার কাজ করে চলে। বহনযোগ্য তারামণ্ডলী প্রদর্শন যন্ত্র তৈরী করেন কবীর সুর চৌধুরী এবং তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ প্রদত্ত দুটি সম্মান পুরস্কার লাভ করে। কলকাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্-এ শিশুদের দশটি অঙ্কন প্রদর্শনী ও পাঁচটি ফটোগ্রাফী প্রদর্শনী করে পাইওনীয়ার্স গ্রুপ এবং সেগুলি বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

নবগ্রামের কিছু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান

নবগ্রাম সেবক সংঘ

১৯৪৯-এর স্থাপিত "নবগ্রাম কলোনি সেবক সংঘ" বিষয়টি পাঠক ইতিপূর্বেই পরেশচন্দ্র চন্দ মশাই-এর লেখায় পেয়েছেন। মোটামুটি ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে সেবক সংঘের কাজ শুরু হল। নবগ্রাম সেবক সংঘকে 'সোসাইটির কালচারাল সেক্‌শন' বলে উল্লেখ করা হত সেকালে, (দ্রষ্টব্য: সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা গ্রন্থ, ১৯৯৭, সম্পাদকের বিবৃতি)।

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—"সামাজিক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করল নবগ্রাম সেবক সংঘ। এই সংঘ প্রতি রাত্রে পাহারার বন্দোবস্ত করতে লাগল। তখন এখানে কোনো ডাক্তার ছিল না, চিকিৎসার অভাব। সেবক সংঘ রোগ প্রতিষেধক, ইনজেকশন, নর্দমায় ডি.ডি.টি. স্প্রে এসব করতে শুরু করল। এই সংঘ বাড়িতে বাড়িতে দরকার হলে রাত জেগে রোগীর শুশ্রূষাও করতে লাগল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, ব্যায়মাগার ক্রমে ক্রমে সব প্রতিষ্ঠিত হল। সেবক সংঘের কাজ ও সমবায় সমিতির কাজ সমান্তরাল গতিতে চলতে লাগল।"

ওই সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকার 'কিছু কথা' অংশে বলা হয়েছে—'সামাজিক জীবন বিকাশ, খেলাধুলা, নাটক অভিনয়, পাঠাগার, সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা, আরক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে অগ্রগমনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৪৯-এ গঠিত হয়েছে নবগ্রাম সেবক সংঘ, সমবায় সমিতিরই প্রবর্তনায়। নবগ্রাম সেবক সংঘের রজত জয়ন্তী উৎসব শেষে যথাসময়ে সুবর্ণ জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে।

১৯৪৯ সাল, তখন অবধি সেবক সংঘের নিজস্ব কোন অবস্থিতিই ছিল না। ১৯৫০ সালে কিছু কিছু চোখে পড়ার মতন কাজ শুরু হল। ১৯৫১-য় সেবক সংঘের নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হল। সাধারণ সম্পাদক হলেন বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। বিদ্যাপীঠের মাঠে তখন স্কুলবাড়ি তৈরী হয়েছে। স্কুল প্রাঙ্গণটি সম্পূর্ণ মুক্ত। ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারী ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হল সেবক সংঘের আয়োজনে বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে। সি-ব্লকের নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন সকলের কাছে। ১৯৫১ সালের ২৩শে জানুয়ারী প্রভাতে সাড়ম্বরে নেতাজী

জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হল নবগ্রাম সেবক সংঘের উৎসাহে। প্রভাতফেরি শোভাযাত্রা বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আদিবর্ত্ম হয়ে পশ্চিম দিকে কর-কলোনী (বর্তমান বিধানপল্লী) হয়ে পৌঁছে গেল সি-ব্লক। শোভাযাত্রার গান—

"প্রাচীন প্রাচ্যে পূর্ব গগনে নেহারি অরুণোদয়
হে ভারতবাসী, তন্দ্রা বিলাসী, গাও নেতাজীর জয়।।"

অংশগ্রহণে বিদ্যাপীঠের ছেলেমেয়েরা। সারিবদ্ধভাবে শোভাযাত্রায় চলছে। তখন কুমারী মেয়ের সিঁথির মতন কর কলোনির ভিতর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। ঘোষেদের পুকুর বাঁহাতে। এ রাস্তা পরবর্তীকালে বদলে গেছে, এখন সি-ব্লক যাওয়ার পথে পুকুরটা রাস্তার ডানদিকে পড়ে। তখনকার ভূগোলে সি-ব্লক এত দূরে ছিল না।

নতুন আগ্রহে উৎসাহে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন হচ্ছে ১৯৫১ সালে। বসন্ত দাশগুপ্তর নেতৃত্বে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজিত হল নবগ্রামে। তখন হ্যাজাকের আলো জ্বলত। ইলেকট্রিকের কোন প্রশ্নই ছিল না। কথা, সুর, নাচ ইত্যাদি সহ রবীন্দ্র চর্চার পরিচয় লিপিবদ্ধ করলেন শ্রীমতী সুজাতা দাশগুপ্ত। রীতিমত মহড়া হত গিরীনবাবুর বাড়ির পূর্ব অংশে ভাইপোদের নব নির্মিত ঘরে। ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় উন্মুক্ত আকাশের তলায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর আসর বসল। বসন্ত বাবুর আহ্বানে সভাপতির পদ অলংকৃত করলেন অধ্যাপক জীবনকৃষ্ণ শেঠ, সরকারী কলেজের বাংলার খ্যাতনামা অধ্যাপক। জীবনবাবুর সঙ্গে ৬০-এর দশকে আলাপ হয়েছে। কথায় কথায় ১৯৫১-এর রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে আগমনের কথা তাঁর মনে আছে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত কবিতা 'সামান্য ক্ষতি'-র নাট্যরূপ উপস্থিত করা হল। কাশীর রানির শীত নিবারণার্থে প্রজাদের কুটির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, গৃহহীন প্রজারা দলে দলে রাজার কাছে এসে তাঁদের দুঃখের কথা নিবেদন করছে। এই দৃশ্যে নট ব্যানার্জী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে উদয়শঙ্করের প্রবর্তনায় 'সামান্য ক্ষতি'র নাট্যাভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর থেকে নবগ্রাম সেবক সংঘে সবসময়ই রবীন্দ্র জয়ন্তী বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রবীন্দ্রনাথের উপরে সেবক সংঘে বক্তৃতা করে গেছেন।

নবগ্রাম সেবক সংঘ একটুখানি দাঁড়াবার মতন জায়গা পেল বিদ্যাপীঠের মাঠে। তখন পৌর ভবনের দক্ষিণ অংশে লাগোয়া দুটি ঘর। রাস্তার পাশে বড় ঘরটি সোসাইটির অফিসঘর, সঙ্গে পোস্ট অফিস আগেই বলা হয়েছে। সোসাইটি অফিস আর পৌরভবনের মাঝখানের ডানদিকের ঘরটি নবগ্রাম

সেবক সংঘের। ব্যান্ড পার্টির বাজনাগুলো ওপরে টিনের তলায় টাঙানো, সামান্য 'আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই কোনমতে রাখা হয়েছে। খানিকটা লাইব্রেরীর বই পৌরভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় বাঁদিকে দেওয়াল আলমারিতে। এভাবেই সেবক সংঘের যাত্রা হল শুরু। তখন স্থান ছিল ছোট, কিন্তু মন ছিল বড়। তাই কোন অসুবিধাই অসুবিধা বলে মনে হয়নি। সেবক সংঘ পাঠাগার ইতিপূর্বে জিতেন্দ্রনাথ দাস মশাই-এর বাড়ির দক্ষিণের ভিটিতে একটি ছোট ঘরে চলেছে, সেখানে বই দেওয়া-নেওয়া করতেন বসন্তবাবুর তৃতীয় ভ্রাতা সুবল দাশগুপ্ত। কিছুদিন বিনয় বসু মহাশয়দের বাড়ির রাস্তার পাশের উত্তরের বারান্দার পশ্চিমাংশে। এখানে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হত নিষ্ঠার সঙ্গে। কানু চক্রবর্তীর লেখা এবং পরিচালনায় এই উৎসব হত পুরাতনের বিদায় নতুনের আগমন। পুরাতনকে উদ্দেশ্য করে লেখা হল—

ও বুড়ো তালের নুড়ো
তুমি এখান থেকে সরে পড়, আমরা তোমায় চিনি না।

এই অংশের অভিনয়ে-উজ্জ্বল বকুল চ্যাটার্জী। তারপরই নতুনের আহ্বান।

"হে নতুন দেখা দিক আর বার।"

একটু পেছিয়ে ১৯৪৯-এর পূজার লগ্ন তখনও বিদ্যাপীঠের মাঠ ফাঁকা-জমি। পূজা উপলক্ষে সেবক সংঘের উৎসাহে প্রথম নাটক অভিনীত হল 'কেদার রায়' ঐতিহাসিক নাটক। আদিবর্ত্ম, বাঘাযতীন রোড ঘেঁষে বাঁশ পুতে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হল। তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন অতীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কেদার রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করলেন কলকাতা থেকে যাতায়াতকারী প্রফুল্ল দে। সাহেব কার্ভালোর ভূমিকায় ননীগোপাল পোদ্দার। সেকালের অধিবাসীদের আজও এ অভিনয়ের কথা মনে পড়ে।

'কেদার রায়' অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের জয়যাত্রা শুরু হল। নাটকের যাত্রাপথ এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিদ্যাপীঠের সেকালের স্কুল ঘরে মাঝে মাঝেই নাটকের আয়োজন হত। 'রাতকানা' নাটকের অভিনয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অভিনেতা মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বা মইন্যা দা। প্রমথনাথ বিশীর লেখা হাস্যরসাত্মক নাটক—'পরিহাস বিজল্পিতম'। এই নাটকে মনে রাখার মতন অভিনয় করতেন গিরীনবাবুর মধ্যম পুত্র শচীন ব্যানার্জী বা কালা বাবু। আর একটি সুঅভিনীত নাটকের নাম মনে পড়ে। এটি শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের লেখককৃত নাট্যরূপ 'বিজয়া'। বিজয়ার ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন শিশুরঞ্জন ভট্টাচার্য। আর নায়ক নরেনের ভূমিকায়-উজ্জ্বল জ্ঞান

চৌধুরী। নায়ক-নায়িকার বিবাহের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। অভিনয় যখন শেষ হল তখন আকাশে সূর্য উঠে গেছে। তাতেও দর্শকের অভাব হয়নি।

আবার নবগ্রাম সেবক সংঘের কথায় আসি। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সেবক সংঘের কার্যক্রম বিদ্যাপীঠের মাঠেই আবদ্ধ ছিল। খেলাধুলা, বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হত নিয়মিত, বর্তমান গোলক মুন্সী পাড়ার মাঠে। এই খেলার মাঠে সেকালে 'রাহুমুক্ত' যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে আজ অনেকদিনের কথা। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের স্কাউট দলের কিছু কিছু অনুষ্ঠান এই মাঠে হত। এই মাঠে ফুটবল খেলার উল্লেখযোগ্য রেফারি ছিলেন তখন ঁমহাদেব চট্টোপাধ্যায়, পরে 'চলচ্চিত্রম' সিনেমার ম্যানেজার। এই মাঠে ফুটবল খেলার একজন নিয়মিত দর্শকের নাম মনে পড়ে। তিনি তখন ডাক্তারী ছাত্র, নাম ডঃ দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রবাবু)। খেলতে খেলতে হঠাৎ প্রয়োজন হলে তিনি এগিয়ে এসে আহত খেলোয়াড়-এর পাশে দাঁড়াতেন। তখন এই খেলার মাঠেরই কাছে সুকুমার দত্তর (কেনুবাবু) বাড়ির বিপরীতে ছিল সেবক সংঘের ব্যায়ামাগার। এ সবই বহু পুরনো কথা। এই সময় সেবক সংঘের ক্রীড়াসচিব সুখরঞ্জন বল ছিলেন এক উৎসাহী কর্মী। পাশাপাশি আর একজনের নাম মনে পড়ে অতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী। স্পোর্টস্-এর প্রতিযোগীরা সাজবার জায়গা হিসাবে বেছে নিতেন অনিলবরণ চক্রবর্তীর বাড়ি। তখনকার দিনে এই স্পোর্টস্ দেখতে গোটা নবগ্রামের বহু মানুষ মাঠে উপস্থিত হতেন। স্পোর্টস্-এর ক্রীড়া পরিচালনার ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলীর। তিনি ঢাকা কলকাতার বিখ্যাত 'উয়ারি' ক্লাবের অন্যতম সংগঠক।

১৯৫২-র পরে সেবক সংঘ পাঠাগারটি একটু একটু করে বড় হয়েছে। আরম্ভ লগ্নে ১৯৪৯-৫০-এ বাড়ি বাড়ি ঘুরে বই সংগ্রহ করা হত সেবক সংঘের পাঠাগারের জন্য। বর্তমান বিদ্যাসাগর রোডের পশ্চিম পাশে আশুতোষ মজুমদার-এর বাড়ির ভেতরের উঠোনে এক রবিবার সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের আলোতে জন্ম হয়েছিল সেবক সংঘ পাঠাগারের। মনে পড়ে সেই আরম্ভ লগ্নে পাঠাগারের উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন সুকুমার চক্রবর্তী। এই পর্বে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বই সংগ্রহ করেছেন একজন, তার নাম অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেক প্রতীক্ষার পর সেবক সংঘের নিজস্ব জমি সংগৃহীত হল বর্তমান বিবেকানন্দ রোড, আদিবর্ম্মের মোড়ে। প্রথমে উঠল চালাঘর পূর্বদিক ঘেঁষে। ১৯৬১ সালের সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হল নব প্রাঙ্গণে বেড়ার ঘরের পশ্চিমের বেড়া খুলে দিয়ে। এই অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে আছে।

তখন নবগ্রাম সেবক সংঘের সরস্বতী পূজা কয়েকবছর সংঘ প্রাঙ্গণের বদলে অন্যত্র, যেমন নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ির উঠোনে, পাকড়াশী বাড়ির ফাঁকা জমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেশ কয়েকবছর উমেশ পোদ্দারদের উৎসাহে নবগ্রামের সকল সরস্বতী মূর্তি সেবক সংঘের প্রাঙ্গণে আনা হত। বিচারে পুরস্কার দেওয়া হত। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন বিভিন্ন সময়ে দেবব্রত সুর চৌধুরী, শিবেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য, বিচারপতি আশীসবরণ মুখার্জী, গোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তি।

নবপ্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহে উদ্‌যাপিত হল রবীন্দ্র শতবর্ষ, নবগ্রাম মালটিপারপাস্ কো-অপারেটিভ কলোনির প্রবর্তনায়। সাত দিনের উৎসব। এলেন কাজী আবদুর ওদুদ। নৃত্য পরিবেশন করলেন কলকাতার বালিগঞ্জের 'মলয় গীতিবীথি' সংস্থা। মন্ত্রী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এলেন। ডাঃ রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর নেতৃত্বে শেলী স্যান্যালের প্রবর্তনায় সেই নৃত্য উৎসব খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। এই উপলক্ষে প্রকাশিত 'নবগ্রাম পত্রিকা' বহু উল্লেখযোগ্য লেখকের লেখায় সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দেবব্রত সুর চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অপ্রকাশিত পত্র' এখানে স্থান পেয়েছে। নবগ্রামের অধিবাসীদের কাছে এই নবগ্রাম পত্রিকাটি আদরণীয় হয়ে ছিল।

নবগ্রাম সেবক সংঘের কার্যক্রম সরকারী মহলকে মুগ্ধ করতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে ড. ফুলরেণু গুহর কথা অবশ্য স্মরণীয়। প্রসঙ্গত আসে দুটি নাম যাদের নিত্য যোগাযোগে এবং আর্থিক সহায়তায় নবগ্রাম সেবক সংঘের বর্তমান বাড়িটি তৈরী শুরু হল। এই দু'জনের নাম পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার চক্রবর্তী। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন সংঘের তদানীন্তন সভাপতি রমণীমোহন নাগ।

সেবক সংঘের বিদ্যাপীঠের-পালাপর্ব শেষ হল। পুরাতনকে ছেড়ে নতুনকে গ্রহণ করছে সেবক সংঘ। এক রবিবারের সকালে ঠেলাগাড়ি ভর্তি পাঠাগারের বই সাজিয়ে নব প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হল। পরম মমতায় একটি একটি করে বই ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে রাখা হল নীচের ঘরের পাঠাগারে। পরে এই পাঠাগারটি দোতলায় স্থানান্তরিত হয়। নবগ্রামের অধিবাসী দাতা নিরঞ্জন ভট্টাচার্য পাঠাগারের ব্যবহারের জন্য একটি বড় টেবিল ও একটি আলমারি দান করলেন। কুসুমরঞ্জন দাস মহাশয়ের দানে আরও একটি আলমারি পাওয়া গেল। এই সময় সেবক সংঘের পাঠাগারের বেশ কিছু কর্মীর আনাগোনা ছিল। যেমন উমেশচন্দ্র পোদ্দার, অজিতকুমার ভট্টাচার্য, সুরেশ দে চৌধুরী, সঞ্জিৎকুমার সাহা,

ভাসানচন্দ্র ঘোষ, মলয় সেনগুপ্ত প্রমুখ। আর ছেলেদের সঙ্গে বই বহনে হাত লাগালেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক, নবগ্রাম বি-ব্লকের অধিবাসী ড. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এজন্য কুলি ব্যবহার করতে দেননি।

রবীন্দ্র সংসদ বিবেকানন্দ রোডের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। নবগ্রামে যিনিই যখন আসেন রবীন্দ্র সংসদ দেখে খুশি হন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আদতে ফরিদপুর জেলার মানুষ ড. হুমায়ুন কবীর নবগ্রাম সেবক সংঘ পরিদর্শনে এলেন। গোটা একটা দিন নবগ্রামে ছিলেন। তাঁরই আর্থিক আনুকূল্যে এই 'রবীন্দ্র সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হল। তিল তিল করে যেন এক তিলোত্তমা রচিত হল। এখানে কত মানুষের পদধূলি পড়েছে—ড. ফুলরেণু গুহ, ডাঃ গোপালদাস নাগ, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরকিশোর ঘোষ, মিসেস্ এলেন রায়, বিমল কর, নারায়ণ চৌধুরী, নচিকেতসানন্দ, সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, হরিপদ ভারতী, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী বিজন চৌধুরী, গোষ্ঠ পাল, শৈলেন মান্না প্রমুখ। বিদ্যাপীঠের মাঠে এসেছেন তুলসী লাহিড়ী, ভূপতি মজুমদার, মেহের চাঁদ খান্না, অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন সেন, রীতা পণ্ডিত।

গৌরকিশোর ঘোষ মজার কবিতা লিখে গেছেন সেবক সংঘের ভিজিটর্স বুক-এ 'দুধ খাবি তো ময়ূর পোষ!' খেলাধুলার চর্চার কথা যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ভিজিটার্স বুক ঘাঁটলে। বয়স্ক মানুষরাও এসব খেলাধুলায় এগিয়ে আসতেন। সেবক সংঘের রঙ্গমঞ্চে রাজ্য ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ-ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন কোন্নগর মনসাতলা ব্যায়াম মন্দিরের পশুপতি ঘোষ। বহুদিন সেবক সংঘে ব্যায়ামাগার ছিল, ছেলেরা ব্যায়াম চর্চা করত।

অমল ঘটকের তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষায় সোমনাথ দত্তর (গোরা) সহযোগিতায় সেবক সংঘের 'হবি ক্লাস' সুনাম অর্জন করেছিল। এই হবি ক্লাসের একজন প্রাক্তন ছাত্র কবীর সুর চৌধুরী। বড় হয়ে কবীরের উদ্যোগেও হবি ক্লাস নবগ্রামে চলেছে দীর্ঘদিন।

সেবক সংঘের নাটক একটা দর্শনীয় অনুষ্ঠান। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, ননীগোপাল পোদ্দার, তারাপদ ভট্টাচার্য, সুনির্মল মজুমদার, দেবব্রত সুর চৌধুরী, প্রয়াত শৈলেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অধীরচন্দ্র দে, স্বপনকুমার সেনগুপ্ত, রমাপদ ভট্টাচার্য সেবক সংঘের উজ্জ্বল নাট্যব্যক্তিত্ব। বর্ষীয়ান ষোড়শীরঞ্জন দে চৌধুরীর নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তখনকার দিনে বেশ কয়েকবার বি-ব্লকে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে নাটক অভিনয় হয়েছে। শাহজাহান নাটকে স্মরণীয় অভিনয় করেছেন তারাপদ ভট্টাচার্য

শাহজাহানের ভূমিকায়। নীহাররঞ্জন গুপ্তেব 'উল্কা' নাটকে মনে রাখার মতন অভিনয় করেছেন নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ ভট্টাচার্য। জীবন গাঙ্গুলী সেবক সংঘের অভিনীত নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন দীর্ঘকাল, আর ছিলেন রমেন ভট্টাচার্য, নারায়ণ দাশগুপ্ত, সলিল ঘোষ, সমীর চৌধুরী। এককালে সি-ব্লকের নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত রামের ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছেন। নাটকে অসীম ভট্টাচার্য ভাল অভিনয় করতেন। নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনীত 'মিস্ বিপুলা' অমর হয়ে আছে। নাটকটির নাম 'চিকিৎসা সঙ্কট'। শাহজাহান নাটকে 'দিলদার'-এর ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন দেবব্রত সুর চৌধুরী। সুনির্মল মজুমদারের নির্দেশনায় সেবক সংঘের নাটকে নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-এর 'রামকৃষ্ণ'র ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অর্জুনের ভূমিকায় কৃষ্ণা সুর চৌধুরী এবং চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় ইলা সরকার ভাল অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয়ের আসরে বাঁশি বাজাতেন শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য। শিশুদের নিয়ে সঙ্ঘ মঞ্চে "বাঁশিওয়ালা", "স্বার্থপর দৈত্য", "বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা" ইত্যাদি নাটক উপস্থাপন করেন কবীর সুর চৌধুরী। স্মারক হিসাবে আমরা পেয়েছি পরেশ চন্দ, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী, সত্যরঞ্জন চৌধুরী এবং শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য। সেবক সংঘে নাট্যচর্চায় আর একটি নাম উল্লেখযোগ্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। দর্শক হিসাবে নবগ্রামের মানুষ উৎসাহী কেউ কেউ রৌপ্য পদক দিতেও এগিয়ে এসেছেন। এখনও সেবক সংঘে সু-অভিনয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়—তারাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার, ননীগোপাল পোদ্দার স্মৃতি পুরস্কার এবং অধীরচন্দ্র দে স্মৃতি পুরস্কার। অধীরচন্দ্র দে-এর প্রবর্তনায় নবগ্রাম সেবক সংঘের মাঠে ঠাকুর নিগমানন্দ যাত্রাপালার সুন্দর অভিনয় হয়েছিল। ডাঃ তারাপদ চৌধুরী যাত্রা নাটকে একজন রসজ্ঞ দর্শক রূপে সেবক সংঘে আসতেন। বিদ্যাপীঠের মাঠে সান্ধ্য আসরে হ্যাজাক জ্বেলে অনিলবরণ চক্রবর্তীর গান সেকালের মানুষকে আনন্দ দিত—

আটটা চারের গাড়ি।
সিগ্‌নাল পড়েছে
ছোট তাড়াতাড়ি।
কোন্নগর কলকাতা
৯টি মাইল পাড়ি গো,
৯টি মাইল পাড়ি।

(কথা—অ. ব. সরকার)

অথবা আনন্দিত 'নাচন পাগল'—মুদিত চক্ষু, গায়ক—অনিলবরণ চক্রবর্তী (পিণ্টু)। নবগ্রামের মানুষ এসব শুনেই আনন্দ উপভোগ করতেন।

নবগ্রাম সেবক সংঘের অক্লান্ত কর্মী বি-ব্লকের অজিতমোহন পাল বাড়ি বাড়ি ঘুরে কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশান দিতেন। এরূপ সেবাকার্যে অগ্রণী ছিলেন বি-ব্লকের সুরেশচন্দ্র দে চৌধুরী, শচীন্দ্রকুমার সরকার। কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকা সমাজ-সেবামূলক সংস্থা হিসাবে নবগ্রাম সেবক সংঘের সচিত্র পরিচিতি প্রকাশ করেছিল। বর্তমানকালেও সেবক সংঘের প্রবর্তনায় অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিবিরের সংক্ষিপ্ত খবর মিডিয়ায় স্থান লাভ করেছে। ইতিপূর্বে নবগ্রাম সেবক সংঘে শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবগ্রাম অঞ্চলের চিকিৎসক অনেকেই একাজে সেবক সংঘের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রথম থেকেই ছিলেন বিদ্যাপীঠের পাশের বাড়ির জিতেন্দ্রনাথ দাস। পরে সেবক সংঘের নতুন বাড়িতে হোমিও চিকিৎসায় চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ শ্রীশিশিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামী বালির অধিবাসী ডাঃ কে. এল. আচার্য, ডাঃ অমূল্য গাঙ্গুলী, শিশির বাবুর চিকিৎসা কার্যে কম্পাউণ্ডার ছিলেন সেবক সংঘের সদস্য লাইব্রেরিয়ান অজিতকুমার ভট্টাচার্য।

মহাদেশ পরিষদ

তখন সেবক সংঘের কার্যকরী সমিতির মেয়াদ ছিল এক বছর। ১৯৫১ সালে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, একথা আমরা আগেই জেনেছি। সুকুমার চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক। ১৯৫২ সালে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে এলেন তিনি। বলা বাহুল্য তখন পর্যন্ত সেবক সংঘের কার্যধারায় যাঁরা যাঁরা যুক্ত ছিলেন, নানা কর্মের হোতা ছিলেন সেবক সংঘের জন্ম লগ্ন থেকে, তাঁরাই পা বাড়ালেন ভিন্নতর পথে। দেখা গেল, নতুন একটি সংস্থা নবগ্রামের বুকে সৃষ্টি হল—'মহাদেশ পরিষদ'।

মহাদেশের জন্মস্থান, এখানকার বিবেকানন্দ রোডের বাঁ পাশে রমণী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এই প্রাঙ্গণে ছায়া নৃত্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে, অধ্যাপক সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মনের উপস্থিতিতে মহাদেশের প্রথম অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যথাক্রমে মৃত্যু এবং জন্ম স্মরণে রেখে।

তারপর বিবেকানন্দ রোড থেকে মহাদেশ চলে এল বঙ্কিম রোডে প্রফুল্ল দাসের বাড়ির বিপরীতে ভৌমিকদের জমিতে মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায়। এখান থেকেই মহাদেশ নিজের জমিতে বর্তমান জায়গায় উঠে আসে। মহাদেশ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬১, ইংরাজী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। ওই পত্রিকায় পুত্রহারা কালাচাঁদের মা সুরবালা দেবীর (ঘোষাল-চট্টোপাধ্যায়)

লেখা 'শোকগাথা' প্রকাশিত হয়, নাম—পুত্রশোকে মাতার আত্মবিলাপ। কালাচাঁদের পিতার নাম—লালমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মহাদেশ বিবেকানন্দ রোডের নিজস্ব জমিতে এসে "সরোজ কামিনী হোমিও চিকিৎসালয়" স্থাপন করল মাইকেল রোডের রাধিকামোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত স্ত্রী সরোজকামিনী দেবীর স্মৃতিতে, অর্থ সাহায্য পেয়ে। এখানে চিকিৎসক ছিলেন ধরণীধর চক্রবর্তী, শিশিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং পরে নৃপেশচন্দ্র চক্রবর্তী (শঙ্কর)। ক্রমে বেড়ার ঘর বদলে গেল, হল একটু একটু করে পাকা বাড়ি, রঙ্গ মঞ্চ। বর্তমানে জ্ঞান চৌধুরী মঞ্চ। নাটক চর্চায় মহাদেশের অগ্রণী ভূমিকা আছে। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুরী, মহেন্দ্র গুপ্ত এখানে একবার এসেছিলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে মহাদেশ প্রশংসার দাবি রাখে।

মহাদেশের রজত জয়ন্তী উৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল পুতুল নাচ 'আলাদিন'। সেই রাত এক বীভৎস রাত। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল হঠাৎ সেই শিশু উৎসবকে। কিভাবে কি ঘটে গেল বোঝাই গেল না। বেশ কয়েকজনকে আমরা চিরতরে হারালাম। এই প্রকার দুর্ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে এড়ান যায় সেই উদ্দেশ্যে পাইওনীয়ার্স গ্রুপের সভ্যরা একটি অগ্নিনির্বাপক দল তৈরি করল। তৈরী হল তৎকালীন সিভিল ডিফেন্স। কবীর সুর চৌধুরী তাঁদের আগুন নেভানোর পদ্ধতি শেখালেন। পরবর্তীকালে বহু বৎসর যাবৎ এই দল বিভিন্ন অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত থাকত।

রবীন্দ্রভবন তৈরী হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সাহায্যে। মহাদেশের পাঠাগার, চারু কারু বিদ্যালয়, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ইণ্ডোর গেমস্ প্রশংসার দাবি রাখে। নবপর্যায়ে 'মহাদেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩৮০ সালে, ইংরেজী ১৯৭৩। এই পত্রিকার নবপর্যায়-প্রথমবর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদনায় ছিলেন অমূল্য ভট্টাচার্য।

সত্যভারতী

সমগ্র পৃথিবীতেই ভারতের এক সুসন্তানের নাম প্রায় সকলেরই জানা। ডাকটিকিট বা রাস্তার নামকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই ভারতীয় সন্তানের উজ্জ্বল উপস্থিতির খবর পাই। এঁর নাম 'জাতির জনক' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮)।

১৯৪৫ সালের গান্ধিজির জীবৎকালেই কলকাতার বাগবাজার এলাকার শচীন্দ্রনাথ মিত্র এগিয়ে এলেন সমাজসেবার ব্রত নিয়ে গান্ধিজির প্রদর্শিত পথে। সত্যভারতীর সেই উজ্জ্বল আবির্ভাব। বস্তি উন্নয়ন, সামগ্রিক জীবনযাত্রার

পরিবর্তন, চরকা-কাটা, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথই গান্ধীজির পথ। ১৯৪৫-এ যাত্রা শুরু, ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, স্বাধীনতা লাভ ঘটে গেল। অগণিত মানুষ ছিন্নমূল হয়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গে। এভাবেই নবগ্রামের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এভাবেই পরপর নবগ্রাম-বারাসাত, নবপল্লী-শ্রীরামপুর-রাজ্যধরপুর এই তিনটি জায়গায় সত্যভারতীর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হল। তখন মূল কেন্দ্র ছিল বাগবাজারে।

নবগ্রামে সত্যভারতীর আগমন কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। কেননা আগে বসতি হোক, মানুষজন আসুক, তবে তো প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ। তাই নবগ্রাম সত্যভারতীর নবগ্রামে প্রথম আবির্ভাব ঘটল মহিলাদের মধ্যে। বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন নবগ্রামের প্রথমদিককার অধিবাসিনী গৃহবধূ, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম দিককার শিক্ষাকর্মী শ্রীমতী অনিমা কর। তাঁর লেখা নবগ্রাম মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি অ্যাণ্ড হাউসিং সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় তিনি বিষয়টিকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন।

নবগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরেশচন্দ্র চন্দ নিজে ছিলেন গান্ধিবাদী কর্মী। পরেশবাবু এবং পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় দুজনেই ফরিদপুরের মানুষ। সমবয়স্ক গান্ধিবাদী কর্মী। দু'জনের বন্ধুত্বও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাই সম্পাদক পরেশবাবুর যোগাযোগেই পুষ্পবাবুর নবগ্রামে আগমন। সেই সূত্রে একদা শুধু মহিলা বিভাগ সম্বলিত সত্যভারতী আস্তে আস্তে এখন বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ যেন এক বিরাট মহীরূহ। কত তার শাখা-প্রশাখা। আজ নবগ্রামে কর্মীর বিচার করলে সত্যভারতী সব থেকে বেশী কর্মীর রুটির সংস্থান করে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৯৫০-৫১ সালের পর থেকেই নবগ্রাম কেন্দ্রে সত্যভারতীর কাজ একটু একটু করে বৃদ্ধি পায়। নবগ্রাম কলোনির কর্তৃপক্ষ সত্যভারতীর কাজের উপযোগী প্রথম জমি প্রদান করেন বিদ্যাসাগর রোডের পশ্চিম পাশে। বর্তমানে এটির চলিত নাম পুরাতন সত্যভারতী। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে অনেক দিন হল। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে সঙ্গীত বিদ্যালয়, বালোয়াদী ট্রেনিং সেণ্টার, চাইল্ড স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম, অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র, পারিবারিক সহায়তা কেন্দ্র, সেই সঙ্গে মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র। নবগ্রামের অধিবাসী ননীগোপাল শূরের ব্যবস্থাপনায় এবং সত্যভারতীর সহযোগিতায় অবৈতনিক হিন্দি ক্লাস নিয়মমত অনুষ্ঠিত হয়। কিছুকাল এখানে

মহিলা হোস্টেলও ছিল। প্রথমদিকে সত্যভারতীর প্রবর্তনায় এখানে নানা অনুষ্ঠান হত। সেই সব অনুষ্ঠানে বিখ্যাত ব্যক্তিরা এসেছেন। যেমন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, বিজ্ঞান ভিক্ষু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. ফুলরেণু গুহ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আভা মাইতি, কোন্নগরের বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এইরকম একটি সম্মেলনে সত্যভারতীর পক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিশিষ্ট জননেতা জিতেন্দ্রনাথ কুশারী। পুষ্পবাবুর সুদক্ষ পরিচালনায় এসব কাজ সাফল্যমণ্ডিত হত।

তখন কলোনির সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন শচীন্দ্রকুমার সরকার এবং সুকুমার চক্রবর্তী। নবগ্রামের প্রয়োজন বিচার করে এবার সত্যভারতী বালিকাদের জন্য একটি হাইস্কুল স্থাপনা করার কাজ হাতে নিলেন। কলোনির যোগাযোগে হাইস্কুল করার মত বড় জমি যোগাড় হল, বিদ্যাসাগর রোডের উত্তরাংশ ঘেঁষে। বর্তমানে বলা হয় নতুন সত্যভারতী। সত্যভারতী বালিকা বিদ্যাপীঠ এখন সুনামের সঙ্গে শিক্ষাদান করে চলেছে। পর্ষদের পরীক্ষার ফলাফল বলার মতন। এই বালিকা বিদ্যাপীঠের ছাত্রী বহু দূর দূর জায়গা থেকেও আসে। বিভিন্ন সময়ে শচীন্দ্রকুমার সরকার এবং পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, এখনও করছেন পুষ্পবাবু। নবগ্রামের অধিবাসী (হরিসভা রোড, পূর্ব অংশের) প্রমথরঞ্জন সরকার ছিলেন পুষ্পবাবুর সকল কাজের নীরব নিত্য সঙ্গী, সুদক্ষ লিখনবিদ, সব বিষয়ে যোগ্য মন্ত্রণাদাতা। সত্যভারতীর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব দীর্ঘদিন কুশলতার সাথে পালন করেছেন রিষড়াবাসিনী শ্রীমতী বিভা বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে বহুদিন ছিলেন কৃষ্ণানন্দ গিরি মহারাজ (নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়)। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্বল্প মেয়াদী আবাস শান্তিনীড়, পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী ও পশ্চাৎপদ জনগণের মধ্যে উন্নতির কাজ হয় এবং এ ব্যাপারে হুগলী জেলার প্রধান কেন্দ্র এটি। মহিলা শিল্প বিদ্যালয় থেকে লেডি ব্রাবোর্ন ডিপ্লোমা লাভ সম্ভব। সত্যভারতীর ক্যান্টিন সুরুচি, কর্মরতা মহিলা-আবাসন, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাবাস, আইন সহায়তা কেন্দ্র, উল ও শীতের পরিচ্ছদ বয়ন, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক মিলন মন্দির এই কেন্দ্রটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। বেশ কয়েকবছর সত্যভারতীর দস্তানা তৈরী কেন্দ্রে দুঃস্থ মহিলারা কাজ করে অর্থ উপার্জনের পথ পেয়েছিলেন।

সত্যভারতীর প্রবর্তনায় ১৯৬৯ সালে গান্ধি জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এই উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী, সুব্বা রাও, বিজয় ভট্টাচার্য, নারায়ণ চৌধুরী, সৌরেন বসু। সকলের আগ্রহে গড়ে উঠেছে সত্যভারতীর নবপ্রাঙ্গণে একটি সুন্দর দেবস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির উৎসব পালিত হত সত্যভারতী প্রাঙ্গণে। এই উৎসবে অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

সেকালে নবগ্রামে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মাসিক ডাইরী লেখার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান হয়েছে সত্যভারতীর প্রবর্তনায়। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন জামা কাপড় দানের কাজও করেছে। এই প্রতিষ্ঠান সত্যভারতীর সঙ্গে নবগ্রামের মানুষের সম্পর্ক একান্তই নিবিড়। এভাবেই নবগ্রামে সত্যভারতী গান্ধিচর্চার একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিরাজ করছে।

সত্যভারতী বালিকা বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষিকা

১। মঞ্জুলিকা চ্যাটার্জী
২। মঞ্জরী মুখার্জী
৩। বিভা বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। বাণী ধর (বর্তমানে)

সভাপতি

১। শচীন্দ্রকুমার সরকার
২। সুকুমার চক্রবর্তী
৩। ননীগোপাল শূর (বর্তমানে)

সম্পাদক

পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী

কৃতীছাত্রীদের তালিকা (মাধ্যমিক)

সাল	নাম
২০০৫	সোমা দেবনাথ
২০০৬	স্বপ্না মল্লিক
২০০৭	সঞ্চিতা পাল

নবগ্রামের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান

জাগৃতি সংঘ

নবগ্রাম ক্ষুদিরাম বসু রোডের **জাগৃতি সংঘের** কথা বলা যেতে পারে। জিতেন্দ্রনাথ কুশারী মহাশয়ের পুত্রসদৃশ পরীক্ষিৎ সেনের কেনা-জমি ছিল আদিতে। তিনি কলকাতার কালিঘাট ছেড়ে এখানে এলেন না। সেই জমির রাস্তার দিকের অংশে গড়ে উঠল 'বয়েজ ক্লাব'। জিতেনবাবুর যোগাযোগে গান্ধী স্মারকনিধি ব্যারাকপুরের আনুকূল্যে পাকাবাড়ি তৈরি হল। তারপরে একটু একটু করে দক্ষিণের ডোবা ভর্তি হল। এখন জমি অনেকটা, এককালে কালিদাস কুশারী, প্রবীর দাশগুপ্ত, দিগেন দাস, অমল মুখার্জী, গুরুদাস মুখার্জী, ধীরেশ দে সরকার, বুলু রায়, সুখেন্দু মুখার্জী (মামু) প্রমুখ এই সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। জাগৃতি সংঘের সরস্বতী পূজা সেকালে আকর্ষণীয় হত। কাঠের গুঁড়ো দিয়ে কার্পেট সাজানো এদের বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তীকালে বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, বৈদ্যনাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রবর্তনায় সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনের দায়িত্ব পড়ল জাগৃতি সংঘের উপর।

সোস্যাল স্কোয়াড

সোস্যাল স্কোয়াড নবগ্রামের একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। দশরথ ব্যানার্জীর বাড়ির রাস্তার পাশের দোকানঘরে এর আরম্ভ। বর্তমানে আদিবর্ত্মের পূর্ব অংশে এর অবস্থিতি। সরকারী গ্রামীণ পাঠাগার, ব্যায়াম চর্চা, দোতলায় বিরাট হলঘর, রাস্তার ধার ঘেঁষে বেশকিছু কেনাকাটার জায়গা, দোকান শোভিত এ প্রতিষ্ঠান। প্রধানত স্বপন চট্টোপাধ্যায় (মান্তু)-এর উৎসাহে ও নেতৃত্বে এর অগ্রগতি। এদের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষণীয়। এদের এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

নবগ্রাম ইউথ স্টার

নবগ্রামের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর রোডে **নবগ্রাম ইউথ স্টার**-এর অবস্থান। এদের আরম্ভ লগ্নে ছিল সরস্বতীপূজা উদ্‌যাপন। সাজসজ্জার অভিনবত্বে বিমান সজ্জিত পূজা মণ্ডপে সরস্বতীর অবস্থান, পূজা উদ্বোধনে বিখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ভদ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এসব ছিল তখন বিদ্যাসাগর রোডের পশ্চিমাংশের জমিতে। পরে বিশ্বাস ভবনের জমির পরিবর্তন হলে নবগ্রাম ইউথ স্টারস্ স্থায়ীভাবে চলে এল বিদ্যাসাগর রোডের পূর্বাংশের জমিতে। এখন অল্প জমিতে বিরাট কাজের নানা আয়োজন। এঁদের দুর্গাপূজার একটা বিশেষ পরিচিতি আছে, যা কলকাতার মিডিয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে ও পাচ্ছে। সমাজসেবায় আগ্রহী, তাই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। গুণীজন সংবর্ধনা, সময়োচিত স্মৃতিপূজায় এঁরা অগ্রণী, ক্যাপ্টেন সুমন দাশগুপ্তর এঁরা গুণমুগ্ধ। এঁরই নামাঙ্কিত ওদের অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি। এঁদের দেবাঙ্গণ-এ নানা উৎসব হয়।

নবচক্র

নবগ্রামের বিবেকানন্দ রোডের শেষ উত্তরপ্রান্তে ছিলেন নকুলেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয়। তাঁর অভিনয় কৃতিত্ব মনে রাখার মতন। চাণক্য চরিত্র অভিনয়ে তাঁর যশ ছিল। তিনি নবচক্র নামটা প্রথম বলেন। সেই থেকে **'নবচক্র'** একটি সংস্থা রূপে গড়ে উঠেছে। এঁদের প্রবর্তনায় ক্রিকেটখেলা জমে ওঠে। দুর্গাপূজার আয়োজনে এঁরা তৎপর।

এছাড়াও পাইওনিয়ার্স গ্রুপ, নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব, বিবেকানন্দ সংঘ, আদর্শ ব্যায়ামাগার (সি-ব্লক), কলেজ পল্লী, রামকৃষ্ণ সংঘ, নবীন কৌশিকসংঘ, অশনি ও নেতাজী সংঘ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নবগ্রামে আপন ক্ষেত্রে কাজ করে চলছে।

সারদামণি প্রতিষ্ঠান

সি-ব্লকের সারদামণি প্রতিষ্ঠান একটি বহু পরিচিত নাম। নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত শিশু বয়সে মা সারদামণির (১৮৫৩-১৯২০) স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছেন। তাই সারদামণি প্রতিষ্ঠানের নাম। নিখিলবাবুর প্রসঙ্গ উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ড 'মায়ের কথা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এঁদের তৈরি রঙ্গমঞ্চ সি-ব্লকের গৌরব। সি-ব্লকের নানা সমাজ সেবার কাজ এঁদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। অনতি অতীত কালে নবগ্রাম সেবক সংঘ, মহাদেশ পরিষদও সারদামণি প্রতিষ্ঠান একযোগে নাটক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী, জ্ঞান চৌধুরী, নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় একত্রে অভিনয় করেছিলেন।

নবগ্রামের গ্রন্থাগার

টেক্সট বুক লাইব্রেরী

একদল প্রত্যয়ী ও কিছু শিক্ষাব্রতী মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং এ অঞ্চলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নবগ্রাম টেক্সট বুক লাইব্রেরি'। এটি কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছাত্রসমাজের বহুদিনের লালিত এক স্বপ্নের সফল রূপায়ণ। এই পাঠ্যবই-এর লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধানশিক্ষক প্রমেশচন্দ্র কর। শুরুতে লাইব্রেরির আস্তানা ছিল সহৃদয় শ্রী সৌগত রায়বর্মনের ১০, বাঘা যতীন রোডের বাড়ির একখণ্ডে। লাইব্রেরির প্রথম পরিচালন সমিতির সদস্যরা হলেন—

সভাপতি	ঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক	ঃ শিলাদিত্য সেনগুপ্ত
সহসম্পাদক	ঃ সত্যজিৎ চৌধুরী, সুমিতা রায়
কোষাধ্যক্ষ	ঃ সুব্রত রায়
সহ কোষাধ্যক্ষ	ঃ কল্লোল ঘোষ
সদস্য	ঃ সুদীপ্ত বর্মন, তন্ময় ব্যানার্জী, তরুণ মান্না, সুদীপ ভট্টাচার্য

সূচনা লগ্নে নবম ও দশম শ্রেণী, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের বিজ্ঞান কলা ও বাণিজ্য বিভাগের প্রায় দেড় হাজার পাঠ্যবই এবং একশ ত্রিশ সদস্য নিয়ে লাইব্রেরির কাজ শুরু হয়। বই এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এলাকার বহু মানুষ। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বেড়েছে লাইব্রেরির বই-এর ভাণ্ডার আর সদস্য সংখ্যা। বিস্তৃত হয়েছে কাজকর্ম। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর স্তরের বই এসেছে। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য যুক্ত হয়েছে নানা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই, বিশ্বকোষ, শব্দকোষ, সাধারণ জ্ঞানের বই ও মাসিক পত্র পত্রিকা।

শুরুর প্রায় এক দশক পরে ১৯৯৬ সালে তৈরী হয় রবীন্দ্র রোডে লাইব্রেরির নিজস্ব ভবন। শ্রদ্ধেয় দেবরঞ্জন ভট্টাচার্যের দান করা জমিতে অল্প পুঁজি, অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহু মানুষের সহযোগিতায় তৈরী এই ভবনের স্থাপনা লাইব্রেরির এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন সময়ে অর্থ, বই ও আসবাব দান করেছেন রামমোহন ফাউন্ডেশন, পঞ্চায়েত সমিতি ও নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রোটারি ক্লাব এবং এলাকার সহৃদয় নাগরিকবৃন্দ।

লাইব্রেরিতে আজ বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সংখ্যা চার হাজারের বেশি। সদস্য সংখ্যা তিনশ। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রায় পনের জন নির্বাচিত

দুঃস্থ ছাত্রকে সকল পাঠ্যবই বছরের জন্য সরবরাহ করা হয়। এলাকার বহু কৃতী ও প্রতিষ্ঠিত ছাত্র লাইব্রেরির প্রাক্তন সদস্য।

শুধুমাত্র পুঁথিনির্ভর শিক্ষায় বিশ্বাসী নয় লাইব্রেরি। প্রথাগত শিক্ষালাভের পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাও একান্ত প্রয়োজন। তাই লাইব্রেরির পরিচালনায় বিভিন্ন সময়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, আলোচনা ও সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শিত হয়েছে বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালিত নানা নাটক। নবগ্রাম বইমেলা ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে লাইব্রেরির সংগঠকরা।

বিগত আঠার বছরের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী হল—

১। ১৯৮৯ সালে নবগ্রামে প্রথম বইমেলার পরিচালনায় লাইব্রেরি প্রধান ভূমিকা নেয়।

২। ১৯৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ রোডে স্থাপিত হয় লাইব্রেরির নিজস্ব ভবন।

৩। ২০০২ সালে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক সহযোগিতায় তৈরী লাইব্রেরি ভবনের দ্বিতলে চালু হল পাঠগৃহ।

৪। ২০০৩ সালে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নির্বাচিত হয়ে লাইব্রেরি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা পান। অনিল মজুমদারের অর্থদান স্মরণীয়।

তরুলতা পাঠগৃহ

(একটি বহুমুখী অধ্যয়ন কেন্দ্র)

প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ ২৫শে বৈশাখ ১৪০৬, (৯মে, ১৯৯৯)

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ এলাকার বেশ কয়েকজন গ্রন্থপ্রেমীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের হাজার দশেক গ্রন্থের সম্মিলনে পাঠগৃহের কাজকর্ম শুরু। বইগুলি অধিকাংশ তাঁদের গৃহেই আছে। গ্রন্থের তালিকা পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই আনিয়ে পড়তে দেওয়া হয়। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা, ভূগোল, ইতিহাস, সহজবোধ্য বিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মূল ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই পাঠগৃহে রক্ষিত আছে এবং প্রধানত গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য এই সব গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠগৃহের একটি সক্রিয় শাখা হল 'বীণা দে স্মৃতি ভ্রাম্যমাণ শিশু গ্রন্থাগার'। এই গ্রন্থাগার থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে, বিশেষত যে সব বিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার নেই তাদের নিয়মিত পাঠ্য বহির্ভূত বই দেওয়া হয়ে থাকে।

পাঠগৃহের অন্যান্য বিভাগগুলি হল ঃ

ক) প্রকাশনা ঃ ইতিমধ্যে দুইটি বই প্রদীপ দাশগুপ্ত লিখিত 'শিশু শিক্ষার সহজ কথা' এবং সুবোধচন্দ্র দাশশর্মার কাব্যে অনূদিত শ্রীমদ্ভগবত গীতা'—প্রকাশিত হয়েছে। ড. দুলাল বাগ প্রণীত 'নবগ্রাম কানাইপুরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়েছে।

খ) নিয়মিত আলোচনা চক্র ঃ সাহিত্যের আসর, গুণীজন ও বিদ্বানগণের সংবর্ধনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

গ) পাঠন ঃ পাঠগৃহের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান ও বিদ্যার বিস্তার। জ্ঞান পিপাসা জাগ্রত করা ও শিক্ষিত মানুষকে বইয়ে অনুরাগী করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে 'নবগ্রাম টেক্সট্ বুক লাইব্রেরি এবং 'বিকল্প বার্তা' পত্রিকার সহযোগিতায় তরুলতা পাঠগৃহ ২০০৩ সালে 'নবগ্রাম বইমেলা কমিটি, নামে একটি ব্যাপক ভিত্তির কমিটি গঠন করে তারই পরিচালনায় 'নবগ্রাম বইমেলা'র আয়োজন করে। ২০০৪ সালে ছিল এই মেলার দ্বিতীয় বর্ষ। উভয় বৎসরই মেলা ছিল বিপুল পরিমাণে উৎসাহব্যঞ্জক ও সার্থক।

ঘ) বর্তমানে পরিচালক সমিতির সদস্যদের নাম ঃ তুষার দে (সভাপতি) ও বিষ্ণুপদ ব্যানার্জী-(সম্পাদক)।

বীণা দে স্মৃতি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারও চলছে। তুষার দে-র প্রবর্তনায় এর জন্ম।

সাহিত্য মন্দির

মহাদেশ পরিষদ ও সাহিত্য মন্দির কাছাকাছি সময়ে গড়ে উঠেছিল। এক কালে এর গৌরব ছিল। সেকথাটা প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে সাহিত্য মন্দির নবগ্রামের শ্যামাপ্রসাদ রোডের নিজস্ব জমিতে কোনমতে বেঁচে আছে। আরম্ভ লগ্নে সাহিত্য মন্দির ছিল নবগ্রাম হরিসভা রোডের মধ্যভাগে অমিয় সেনদের বাড়ির বারান্দায়, সামনে খোলা জমি এবং রাস্তা। প্রধানত পাঠাগার রূপেই এটি স্থাপিত হয়। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ়, ইংরাজী ১৯৫২ সাল। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন উত্তর কলকাতার বিখ্যাত স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, নারায়ণচন্দ্র দে, অমূল্যচন্দ্র চ্যাটার্জী (বিধানপল্লী), কুমুদরঞ্জন চ্যাটার্জী, ডাঃ শিশিররঞ্জন চ্যাটার্জী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রন্থাগারিক ছিলেন নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য মন্দির পাঠাগার হিসাবে তখন সুনাম অর্জন করেছিল। ১লা আষাঢ়

প্রতিষ্ঠা দিবসটি শ্রদ্ধার সাথে পালিত হত। সাহিত্য মন্দিরের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন সাহিত্যিক গজেন মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, সুমথনাথ ঘোষ, বিজয় সিং নাহার, ব্যায়ামবীর কেশবচন্দ্র সেন এবং শ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞানের কৃতী অধ্যাপক, পরে একাধিক বার সাংসদ বিমলকান্তি ঘোষ, হুগলী উইমেনস কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষা, অঙ্কের ঈশান স্কলার শান্তিসুধা ঘোষ, কানাইপুরের রোহিণীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (রামবাবু) সাহিত্য মন্দিরে আসতেন। সি-ব্লকের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার কার্ত্তিক গাঙ্গুলী, শিশুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ সাহিত্য মন্দিরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তরুণ কর্মী হিসাবে সাহিত্য মন্দিরে ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য, বাদল বসু, সুনীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (দুলাল), সুরেশ ব্যানার্জীর দ্বিতীয় ছেলে এবং সুনীল পাল। সাহিত্য মন্দিরে একটু আধটু নাটক হত। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। একবার শ্রীরামপুর টকীজে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে D.G.-র 'পথ ভুলে' সিনেমার আয়োজন হয়েছিল।

হরিসভা রোডের অমিয় সেনের বাড়ি ছেড়ে সাহিত্য মন্দির উঠে এল শ্যামাপ্রসাদ রোডের নিজস্ব জমিতে। সেই সঙ্গে পাশাপাশি কয়েকটি প্লট সংগ্রহ ও বিলি ব্যবস্থা করে কিছু আর্থিক সংস্থানও হল। এসময়েই বাদল চট্টোপাধ্যায়-এর নির্দেশনায় অভিনেত্রী বাণী গাঙ্গুলীর অভিনীত বিসর্জন নাটক হল; শ্যাম ঠাকুরের কন্যা আলো করেছিল অপর্ণার চরিত্র। তরুণ কুশলী অভিনেতা পরিচালক জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটক অভিনীত হয় সাহিত্য মন্দিরের প্রবর্তনায়।

"নবগ্রামের কলোনীতে আমি আজ এসেছিলাম, সময়াভাবে সমস্ত আমি দেখতে পেলাম না। তবু আমি যতদূর দেখলাম ও শুনলাম তাতে এদের কার্য্যকরীতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এই কলোনীতে একটি সুন্দর নাটমঞ্চ আছে— অবশ্য বিদ্যালয় ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ত আছেই—কিন্তু নাটমঞ্চ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রত্যেক সভ্যদেশে এমনি সব গ্রামে গ্রামে অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে। বিদ্যালয়ে বা গির্জায় তারা যে শিক্ষালাভ করে তারই সাকার উদাহরণ তারা দেখতে পায় নাটমঞ্চে— তাই সকল সমাজ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাটমঞ্চ একটি প্রধান প্রয়োজনীয় সংস্থা—ইহার স্থাপনায় আমি পরম আনন্দ পেয়েছি।"

অহীন্দ্র চৌধুরী

নবগ্রামের পত্র-পত্রিকা

নবগ্রামে হাতে-লেখা পত্রিকার কথা আমরা জেনেছি। সকলের আগ্রহে এরপর একটা ছাপানো মাসিক পত্রিকা বের হল। নাম 'নবগ্রাম'। আকার অনেকটাই দেশ পত্রিকার মতন। নবগ্রামের অধিবাসী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগাযোগে 'দি ইণ্ডিয়ান কেবল কোম্পানী'-র বিজ্ঞাপন রইল প্রচ্ছদে। সম্পাদক হলেন মুরারিপ্রসাদ গুহ, বাণিজ্য সম্পাদক হলেন সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, সহ-সম্পাদক বাসুদেব রায়। বাসুদেব বাবুর প্রবর্তনায় ছোটদের আসর এই পত্রিকায় শুরু হয়েছিল। নবগ্রাম সোসাইটির সদাব্যস্ত সম্পাদক পরেশচন্দ্র চন্দ এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নবগ্রামের ইতিহাস লিখছিলেন। লোকে আগ্রহ নিয়ে সে ইতিহাস পড়ত।

প্রয়াত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা-লেখায় আগ্রহী ছিলেন। নবগ্রাম মাসিক পত্রিকায় তাঁর লেখা সনেট কবিতা নাম 'নবগ্রাম' প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতায় তিনি নবগ্রামকে তাঁর মানস কন্যা রূপে সম্বোধন করেছেন।

এই পত্রিকায় বি-ব্লকের যতীশ মজুমদার কবিতা লিখতেন। কলকাতার প্রতিষ্ঠিত লেখক হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মণিকা মিত্র আত্মজীবনীর আঙ্গিকে 'ডাঃ বাড়ির বউ' নামে ছোট গল্প লিখেছিলেন। ছাত্র (১৯৫৪) নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখলেন—

হিমালয় দাদু ঃ "আমাদের ক্লাসে আছে হিমালয় দাদু
মুখখানি ইয়া বড় বড় ডাকনাম হাঁদু।"

পরবর্তী সংখ্যায় নীরদরঞ্জন উপনিষদের বাণীকে অবলম্বন করে গদ্যের আধারে পদ্যরস বিধৃত রচনা প্রকাশ করেছিলেন। এই রচনাটির পেছনে ধরণীধর চক্রবর্তী মহাশয়ের অবদান ছিল।

এই পত্রিকা প্রকাশে অগ্রণী ছিলেন প্রয়াত শচীন্দ্রকুমার সরকার। তিনি একহাতে নবগ্রাম পত্রিকার বাণ্ডিল নিয়ে হাওড়া স্টেশনের ক্যাব রোড দিয়ে নেমে আসতেন গাড়িতে কোন্নগর আসবেন বলে। নবগ্রাম পত্রিকার কাগজ, ছাপা সবই প্রশংসার যোগ্য ছিল। প্রচ্ছদপত্রের ছবি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেত। কাগজটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ঠিকই তবু যে-কটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা 'নবগ্রাম'-এর একটা ইতিহাস।

হাতে লেখা দেওয়াল বা 'প্রাচীর পত্র' সেবক সংঘে নিয়মিত বেরিয়েছে। শৈলেন ঘোষ ও ছাত্র নীরেন সেনগুপ্ত-র অঙ্কণে শোভিত 'প্রতিধ্বনি' (১৯৫১), পরে ছাপা ত্রৈমাসিক 'উত্তর সাহিত্য' স্মরণীয়। দুর্গাপূজায় হরিসভা প্রাঙ্গণে 'পাইওনীয়ার পত্র' হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা ১৯৭৩ থেকে একটানা ১২ বছর প্রকাশিত হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ

হরিসভা

বাংলা ১৩৫৯ সালে হরিসভা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইংরেজী বছরের হিসাবে ১৯৫২ সাল। বিবেকানন্দ রোড এবং হরিসভা রোডের সংযোগে এটি অবস্থিত। পূর্ব-দক্ষিণে খোলা জমি, দুর্গাপূজার সময় বেশ ভিড় জমে যায় এখানে। রাস্তায়ও দুধারে লোক দাঁড়িয়ে যায়।

হরিসভার আরম্ভ লগ্নের স্থান কিন্তু এখানে নয়। বিবেকানন্দ রোড হরিসভা ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলে রাস্তার ডানদিকে সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়িতে হরিসভার প্রথম জন্ম।

দেখা যাচ্ছে নবগ্রামেই নতুন বসতি স্থাপিত হয়েছে, তাই জীবনযাত্রার জন্য সবই চাই এবং সেখানে হরিসভার মতন একটি ধর্মস্থানেরও প্রয়োজন ছিল। একথা মনে রেখেই হরিসভার যাত্রা হল শুরু।

"নবগ্রাম সংবাদ" পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৯৭) দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য নবগ্রাম হরিসভার কথা লিখেছেন—

নবগ্রামের জীবনে হরিসভা একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বাড়িতে কোন নতুন অতিথি এলে একবার হরিসভা তিনি দেখবেনই। হরিসভার আরম্ভ বাংলা ১৩৫৯ সালে (ইংরাজী ১৯৫২)। আরম্ভ লগ্নের স্থান ছিল বিবেকানন্দ রোড এবং রবীন্দ্রনাথ রোডের মধ্যবর্তী সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়িতে। সেই সময় নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের পণ্ডিত মশাই যতীন্দ্রমোহন ব্যাকরণতীর্থ, প্রিয়মোহন চক্রবর্তী, অনন্তকুমার পুততুণ্ড প্রমুখ কয়েকজনের আন্তরিক আগ্রহে হরিসভার প্রতিষ্ঠা হয়। তখনকার নবগ্রামের অনেকেই যেমন গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র চন্দ, গোপালচন্দ্র দাস, প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর, মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ কর (বিধানপল্লী), চন্দ্রভূষণ ভট্ট, মনোরঞ্জন সরকার, জীতেন্দ্রনাথ দাস, বিনয়ভূষণ দত্ত, পরেশনাথ বিশ্বাস, অক্ষয় দেবনাথ, ধরণীধর চক্রবর্তী প্রমুখ হরিসভার কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

কেউ কেউ এই সভাটির নাম ধর্মসভা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা শাক্ত-বৈষ্ণব ব্যাপার ছিল। হরিসভা নামটিই সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে।

বিবেকানন্দ রোডে বর্তমান হরিসভা স্থাপিত। বিবেকানন্দ রোড উত্তর-

দক্ষিণে প্রলম্বিত। আর পূর্ব-পশ্চিম ভূ-খণ্ডে হরিসভা এই নামাঙ্কিত রাস্তার পাশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। স্থানটি নবগ্রামের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। আরম্ভ লগ্নে এই জমিটি ছিল তখনকার নবগ্রামের এক অনাবাসী ব্যক্তির। সেই ব্যক্তির দু'জন আত্মীয় পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। এক ইন্দ্রমোহন মুখার্জীর বাড়ি। দুই গিরীন্দ্রকুমার ব্যানার্জীর বাড়ি। জমিটির উত্তরের ভিটিতে শশাঙ্ক চ্যাটার্জী মশাই-এর বাড়ির ঠিক সম্মুখে ওপারে টালি, মুলি বাঁশের বেড়া-দেওয়া মাটির ঘর ছিল। সেই ঘরেই প্রথম হরিসভার ঠাকুর আসীন হলেন। এ নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝির পালা ছিল, সময়ে তা মিটে গেছে। এবং এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি কর্তৃপক্ষ। তাই আজও প্রতিষ্ঠাতা রূপে সোসাইটির স্বীকৃতি নিয়েই হরিসভার কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সোসাইটি সাধ্যমত হরিসভাকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন।

হরিসভার বিগ্রহদাতা নবগ্রাম শ্যামাপ্রসাদ রোড নিবাসী সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষাকর্মী, নিঃসন্তান, জগদিন্দুনারায়ণ ভট্টাচার্য (বেণুবাবু)-র মাতুল; তাঁর নিকট-আত্মীয় প্রতিবেশী ধরণীধর চক্রবর্তীর আগ্রহেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর নবগ্রাম হরিসভার বিশ্বস্ত কর্মী, প্রাণপুরুষ বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠার মূল স্থপতি প্রিয়মোহন চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায়, গোপালচন্দ্র দাস এবং তাঁর স্ত্রী ও দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য বাংলাদেশ দর্শনা সীমান্তে গিয়ে পূর্ববঙ্গাগত বিগ্রহ গ্রহণ করে সযত্নে হরিসভায় নিয়ে আসেন।

তখন ১৯৪৯-এ নবগ্রামের একমাত্র সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত বিদ্যাপীঠের মাঠে। তারপর ক্রমে ক্রমে নবগ্রামে কয়েকটি সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। নানা অসুবিধা হেতু এই সর্বজনীন একাধিক পূজা একত্রে নবগ্রাম হরিসভাকে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি হেমঠাকুর মশাই-এর তৃতীয় পুত্র বিনয় চক্রবর্তী। অতঃপর নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিসভাতেই নবগ্রাম সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে কিন্তু কোন কোন সর্বজনীন দুর্গাপূজা হরিসভাকে অগ্রাহ্য করেই উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

হরিসভার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সমন্বিত পাঠাগারটি অনেকেরই প্রিয় হয়ে উঠেছে। নবগ্রাম হরিসভা নতুনভাবে সজ্জিত হয়েছে। দোলমঞ্চ প্রস্তরশোভিত হয়ে নতুন জায়গায় এসেছে, মন্দিরের অভ্যন্তর নতুন হয়ে গেছে ভক্তদের

আনুকূল্যে। এ বিষয়ে হরিসভাকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ শিশিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। নবগ্রাম রাণী রাসমণি রোড নিবাসী জীতেন্দ্রনাথ দাসের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী রেবা কুশারীর দানের কথা স্মর্তব্য। এককালীন দাতাদের নামের তালিকাও ক্রমবর্ধমান।

বাসুদেব বিগ্রহ

নবগ্রামের ১৪ নম্বর হরিসভা রোডের রায়বাড়িতে কয়েকশ বছরের পুরানো কষ্টি পাথরের বাসুদেব বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়ে থাকে। হরিসভার ঠিক পিছনেই এই বাড়ি। বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার জয়শ্রী গ্রামের স্বর্গীয় মধুসূদন ঘোষালের (রায়) পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়ে আসছে। ওই অঞ্চলে সেকালের প্রভাবশালী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন কবিরাজ নারায়ণ গুপ্ত। তিনি 'শিববাড়ি' থেকে 'তারা বাড়ি' খাল খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সময় রায় বাড়ির এক বংশধর স্বপ্নাদিষ্ট হন যে "এই খালে বাসুদেব বিগ্রহ শায়িত আছে। তোমরা আমাকে নিয়ে তোমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠা করো।" খাল খননের সময় সত্যি সত্যি বাসুদেবের বিগ্রহ পাওয়া যায় এবং সেই সময় থেকে রায়দের বাড়িতে বাসুদেব ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। হরিসভার নিকটবর্তী এই দেবস্থানটিও নানা কারণে নবগ্রামের মানুষদের আকর্ষণ করে।

দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ রায় জয়শ্রী গ্রাম থেকে নবগ্রামে বাসুদেব বিগ্রহ আনয়ন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই থেকে ঠাকুরের পূজার্চনা চলছে। বৎসরান্তে দোল পূর্ণিমার উৎসব হয়। সম্প্রতি বর্তমান বংশধরেরা এবং আত্মীয়বর্গ বাসুদেবের নতুন মন্দির পুনঃ নির্মাণ করেছেন। জয়শ্রী গ্রামের মানুষ অমূল্যকুমার সরকারেরই যোগাযোগে এই রায় পরিবার নবগ্রামে এসেছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে মূর্তিটি অতি মূল্যবান। সেনযুগের কালাপাহাড়ী ধ্বংসলীলা এই বিগ্রহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তার চিহ্ন বিগ্রহের দেহে বর্তমান। প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বিচারে বাসুদেব বিগ্রহের ঐতিহ্য নবগ্রামকে প্রাচীন গৌরবে অভিষিক্ত করেছে। হরিসভার বিগ্রহ চুরি যাওয়ায় নতুন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে কিন্তু বাসুদেব বিগ্রহের বেলা তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির

৩৩/বি, রবীন্দ্রনাথ রোড,
নবগ্রাম (কোন্নগর), হুগলী-৭১২২৪৬

রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ অনুমোদিত হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অনুমোদিত। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য এই প্রতিষ্ঠান শিবজ্ঞানে জীব সেবা এবং প্রত্যেকটি মানুষের মনে ধর্মভাব জাগরিত করে অধ্যাত্ম জীবন সাধনে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় এক শান্তির স্থল রূপে পরিগণিত। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় নিয়মিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, আরাত্রিক এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী মা সারদামণি, স্বামী বিবেকানন্দ-এর শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের আবির্ভাব তিথি, মহাষ্টমীর দিন দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি এবং প্রতি একাদশী তিথিতে রামনাম সংকীর্তন হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ভারত সরকার ঘোষিত ''জাতীয় যুব দিবস'' হিসেবে পালিত হয়। বার্ষিক আধ্যাত্মিক শিবিরে ভক্ত সম্মেলন আধ্যাত্মিক উন্মেষে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বার্ষিক স্বাস্থ্য শিবিরে সবরকমের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় প্রতি সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার ৪টা থেকে ৬টা এ্যালোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। মাত্র দশ টাকা প্রণামী দিয়ে সকলেই এই পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে।

এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। ভক্তদের আর্থিক সাহায্যেই মন্দির গড়ে ওঠে ৫৪ নম্বর বিদ্যাসাগর রোডে। এই প্রতিষ্ঠানের ভক্তরা কেবলমাত্র ধর্মচর্চাই করে না, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজও করে থাকেন বলে দাবি রাখেন। নবগ্রাম হরিসভার সাথে যোগাযোগ রেখে এই প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় কাজ করে থাকে। ১৯৯১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি খুবই আকর্ষণীয়।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নবগ্রামে বি-ব্লকে হীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে স্থাপিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ হিন্দু মিলন মন্দির অনুমোদিত। এটি কোন্নগর নবগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। চিকিৎসা, যোগব্যায়াম, অঙ্কন ইত্যাদি সমাজসেবামূলক

নানা কাজও এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কোন্নগরের ডাক্তার নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রাস্ট পরিচালনায় ভ্রাম্যমান গাড়িতে চিকিৎসার ব্যবস্থা চলছে। আর্তের সেবা, দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল দান এদের অন্যতম কাজ। এখানে সন্ধ্যায় নিয়মিত পূজা আরতির আয়োজন হয়, ভক্ত সমাগম ঘটে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ হয়। এদের প্রবর্তনায় মাঝে মাঝে আকর্ষণীয় ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

নবগ্রামে প্রথম ভারত সেবাশ্রম সংঘের আগমন ঘটে এ-ব্লকের বিবেকানন্দ রোডের মধ্যাংশে বীণাপাণি চক্রবর্তীর সাদর আহ্বানে। তখন সভা হত শিব ব্যানার্জীর বাড়ীর প্রাঙ্গণে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ-ব্লকের একাধিক জায়গায় মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে। পরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সেনের বদান্যতায় বি-ব্লকের বর্তমান বাড়ীতে এর স্থায়ী আসন হয়েছে। শ্রীমতী সেন স্বামীর পরলোকগমনের পর হিন্দু মিলন মন্দিরের কাজে সবসময় সহযোগিতা করে চলেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ

প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী—কল্পতরু উৎসবের দিন। ভক্ত দম্পতি শ্রীমতি ঊষা চক্রবর্তী এবং ডাঃ বিধুভূষণ চক্রবর্তী মন্দির নির্মাণকল্পে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘকে এক খণ্ড ভূমি অর্পণ করেন এবং ভক্তদের আর্থিক সাহায্যেই মন্দির গড়ে ওঠে নবগ্রামের ৫৪ নম্বর বিদ্যাসাগর রোডে। এই প্রতিষ্ঠানের ভক্তরা কেবলমাত্র ধর্মচর্চাই করেন না, বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজও করে থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ ইতিমধ্যেই নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় নিবেদিতা বিদ্যানিকেতন নামে একটি বিদ্যালয় বড়বহেড়ায় শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ দত্ত মহাশয়ের প্রযত্নে চালিয়ে আসছে। ১৯৯১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হয়।

সৎসঙ্গ বিহার ঠাকুরবাড়ী

পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মানুষ, পরে স্বাধীনতার আগেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সদলবলে চলে এলেন দেওঘর। দেওঘরে আজও তাঁর আশ্রম বিদ্যমান। ঠাকুরের পরমভক্ত নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের প্রথম দিক্‌কার শিক্ষক গোপীবল্লভ সাহার মাধ্যমেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কথা ছড়িয়ে পড়ল নবগ্রামে। এ অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও

ঠাকুরের অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। এক পুত্রশোকাতুর পিতা পরমাশ্রয় খুঁজে পেল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে। ইনি নবগ্রাম বঙ্কিম চ্যাটার্জী রোডের অধিবাসী কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়। ক্রমে কৃষ্ণলাল বাবু, হারান দাস, গোপীবল্লভ সাহা, হরিপদ কর প্রমুখের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল দৃষ্টি নন্দন এক মন্দির। কোন্নগরের তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত জমিতে মন্দির তৈরী হল। স্থানটি শিশুভারতী বিদ্যালয়ের বিপরীতে। এটি আজ নবগ্রামের একটি দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভক্ত, প্রখ্যাত, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এখানে এসে ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচনা করে খুশী হন।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর মন্দির ও অন্যান্য মন্দির, মঠ, পূজা ও মেলা

ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামানিক গ্রামের মানুষ রামঠাকুর সমগ্র বাংলায় একটি বহু পূজিত নাম। দেশভাগের পরে নবগ্রামে বহু মানুষের কাছে আজও তিনি পরম পূজনীয়। বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এর মধ্যে নোয়াখালিতে ঠাকুর রামঠাকুরের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

নবগ্রামে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রী রামঠাকুরের সমবেত উৎসব আরম্ভ হয় যামিনীকান্ত ঘোষাল চৌধুরীর বাড়িতে। বার্ষিক এ উৎসব নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ভক্তদের আগ্রহে সাম্প্রতিককালে রামঠাকুরের মন্দির নির্মিত হয়েছে নবগ্রাম সেবক সংঘের পশ্চিম পাশে আদিবর্ত্মের ধারের জমিতে। জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদের জমি ক্রয় করে এই মন্দির স্থাপিত হয়েছে। এখানে এখন নিয়মিত নিত্যসেবা পূজা-অর্চনা হয়। প্রতি পূর্ণিমায় বিশেষ উৎসব প্রতিপালিত হয়। আর বার্ষিক উৎসবের জন্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথি নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

নবগ্রাম এবং আশেপাশে কিছু কিছু মন্দির এবং এক দেবস্থান গড়ে উঠেছে। নৈটি রোডের উত্তর পাশে **দেবসঙ্গ মঠের** কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এছাড়া **মা আনন্দময়ী, ঠাকুর স্বরূপানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, বিজয়কৃষ্ণ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, ঠাকুর নিগমানন্দ, ওঁ হরি, বালক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নবগ্রামে ভক্তজনের কাছে সদা পূজনীয়।** নবগ্রামের বোসপুকুর অঞ্চলে, নতুন বাজার অঞ্চলে এবং ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় দেবতার স্থানে পূজা পার্বণে, চড়ক মেলায় স্থানীয় উৎসবে সকল মানুষ অংশগ্রহণে তৎপর

হন। বোসপুকুরের অদূরে হসপিটাল রোডের পূর্বপার্শ্বে স্থাপিত **কৃষ্ণকালী মন্দির** নানাবিধ কল্যাণকর কর্মে মগ্ন হচ্ছে। এখানে বৃদ্ধ বয়সে ভক্তজন নিশ্চিন্ত অবস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। ছোটবহেড়া গ্রামের বহুপূর্বের দেবস্থান নতুন মাত্রা পেয়েছে একালে। চড়ক মেলা এবং রক্ষাকালী মাতার এখানে বৈশাখ মাসে পূজায় সকলে অংশগ্রহণ করে। নতুন নতুন শিবমন্দিরও স্থাপিত হয়েছে একালে। প্রসঙ্গত নবগ্রাম সি-ব্লকের হরিসভার কথা বলা যেতে পারে। সি-ব্লকের মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহে এটি তৈরী হয়েছে সি-ব্লকের পূর্বদিকে নবগ্রাম হাইস্কুলের কাছাকাছি। অনিল চৌধুরী মশাই এই হরিসভার একান্ত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। বর্তমানে এই হরিসভাকে কেন্দ্র করে সি-ব্লকের মানুষের উৎসব আয়োজন চলে।

নবগ্রামে স্কাউট আন্দোলন

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম স্কাউট আন্দোলনের সূচনা হয় নবগ্রামে। পরে ভূদেব রায়ের তত্ত্বাবধানে নবগ্রাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ চলতে থাকে। এই গ্রুপ থেকে প্রথম রাষ্ট্রপতি স্কাউট পদক ও শংসাপত্র লাভ করেন কবীর সুর চৌধুরী, অশোকরঞ্জন দাস, শিবপ্রসাদ দে, ত্রিবেণী ধর আরও অনেকে। এছাড়া ট্রুপ লীডার কবীর বিবিধি বিষয়ে ৫১টি মেরিট টেস্ট পাশ করে যে রেকর্ড স্থাপন করেন আজও তা অম্লান। আরও ১৯৭১ সালে জাপান সরকার তাকে ভারতের চারজন স্কাউট লীডারের মধ্যে অন্যতম নির্বাচিত করেন ও জাপান সফরের আমন্ত্রণ জানান। নবগ্রাম ওপেন স্কাউট গ্রুপ ছাড়াও নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ স্কাউট দল, সুব্রত মজুমদারের নেতৃত্বে ম্যাগনোলিয়া স্কাউট গ্রুপ অনেকদিন সক্রিয় ছিল। স্কাউটিং-এ উৎসাহ প্রদানে শিক্ষক ভূদেব রায় ও কালিদাস কুশারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি নবগ্রাম সেবক সংঘের স্কাউটদল গঠিত হয়েছে শিক্ষক পুরন্দর ব্যানার্জীর নেতৃত্বে।

স্মরণীয় যাঁরা

গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বাংলা ১৩০০ সালে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ভড্ডা গ্রামে গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম। জমিদার বংশের পরিচিতি ছিল তাঁর চেহারায়, চলনে বলনে। আইন পরীক্ষার সময় মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি ফরিদপুর জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় এবং পঞ্চপল্লীগ্রামে পঞ্চপল্লীগুরুরাম উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে কোন্নগর স্টেশনের নিকট বসত জমির সন্ধান পান, যার নামকরণ করা হয় 'নবগ্রাম'। ওপার বাংলা থেকে চেনা অচেনা বহু পরিবার এপার বাংলায় এসে যখন একটু বসতি খুঁজছেন তিনি তখন মাত্র নিজের জায়গাটুকু পেয়ে খুশি ছিলেন না। আরও জায়গা চাই আরও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে পেলেন তদানীন্তন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পরেশবাবুকে। দুজনে অক্লান্ত পরিশ্রমে সৃষ্টি করেন নবগ্রাম। গিরীন্দ্রকুমারের স্বপ্ন সমবায়ের ভিত্তিতে একটি আদর্শ পল্লী স্থাপন করা। পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট যখন এই জায়গা অধিগ্রহণ করে নিজেদের উপনিবেশ তৈরীর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে, সেই সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নবগ্রামের পরিস্থিতি জানতে এলে গিরীন্দ্রবাবুর তৎপরতাও ছিল বিশেষ উল্লেখ্য।

গিরীন্দ্রবাবু ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৩৬৪ সালে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

পরেশচন্দ্র চন্দ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ ইং ১৯১৪ সালে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুলকুড়ি গ্রামে জন্ম। চাঁদপুরে বেশ কিছুদিন পারিবারিক আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারীর সাথে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা আসার পরে উনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিয়ে আরও পড়াশুনা করেন। ইং ১৯৩৫ সালে আয়ুর্বেদ মেডিসিন এবং সার্জিকেলের উপর 'ভিষজ্ রত্ন' পাশ করেন। ছোটখাটো মানুষটি সবসময়ের জন্য কর্ম্মমুখর ছিলেন এবং বরাবরই লক্ষ্য ছিল সৃজনশীলতার উপর। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ বাংলা বিভক্ত হওয়ার সাথে সাথে বহু পরিবার একটু

আশ্রয়ের খোঁজে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসে। কিন্তু কোথায় সেই বাসস্থান? পরেশবাবু তখন চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। কলিকাতায় ৪৪/১ গ্রে স্ট্রীটে বসে একটা সুরাহার পথ খুঁজে পেলেন। সাক্ষাৎ হয় গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। দুই জনেই দায়বদ্ধভাবে নবগ্রাম গড়ার কাজে এগিয়ে এলেন। সৃজনশীল পরেশবাবু নবগ্রামের রূপরেখায় ব্যস্ত। সে এক বিরল ইতিহাস। তারই ফলন 'নবগ্রাম' যেখানে আজ কয়েক হাজার লোকের বাস। পরেশবাবু নবগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে বহুদিন নবগ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৯৭৮ সালের ১৪ই অক্টোবর ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

অমূল্যকুমার সরকার

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার জয়শ্রী গ্রামে ১৯০৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন অমূল্যকুমার সরকার, তাঁর পিতা বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, মাতা সরলাসুন্দরী সরকার। গ্রামের পাঠশালায় শৈশবে পাঠগ্রহণের পর ভোলা মহকুমার হাইস্কুলে তার স্কুলজীবন অতিবাহিত হয়। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি স্নাতক স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন, এরপর কলকাতা থেকে আইন পরীক্ষায় ফার্ষ্টক্লাস সেকেণ্ড হয়ে বরিশাল কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু কিছুদিন পর তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রোহিণীকুমার সরকারের অসুস্থতার খবর পেয়ে পুনরায় তিনি কলকাতায় আসেন এবং একপ্রকার বাধ্য হয়েই পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেন। রোহিণীকুমার সুস্থ হলে তিনি তাঁর সঙ্গে কলকাতার হাতিবাগানে গ্রে-স্ট্রীটের আয়ুর্বেদ ভবনে ঔষধ ব্যবসায় নিযুক্ত হন। ওই সময় রাজনৈতিক নেতা অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাথে তার মধুর সম্পর্ক ছিল।

বর্তমানে হুগলী জেলার কোন্নগর রেল স্টেশনের পশ্চিম তীরবর্তী আজকের যে 'নবগ্রাম' - ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে গ্রে-স্ট্রীটের আয়ুর্বেদ ভবন-ই তার প্রসুতিগৃহ। ওই সময় তিনি গিরিন ব্যানার্জী, পরেশচন্দ্র চন্দ-র সাথে পরামর্শ করে পূর্ববঙ্গের বাস্তুচ্যুত পরিবারবর্গের জন্য কলকাতার কাছাকাছি একটি স্থান নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। পরে ওনার প্রদত্ত নাম "নবগ্রাম" যা

সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সেই সময় থেকে বহু বাধা অতিক্রম করে আজও নবগ্রামের চলা অব্যাহত। জন্মলগ্ন থেকে নবগ্রামের সাথে যোগাযোগ থাকলেও ১৯৫৬ সালে তিনি নবগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ''নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি''-র প্রথম কার্য্যকরী সমিতিতে তিনি ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন, পরবর্ত্তী সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদটিও তিনি অলংকৃত করেন। নবগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ''নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ'' ও ''নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ের'' সভাপতির পদেও তিনি আসীন ছিলেন। একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী হিসাবে এলাকায় তাঁর পরিচিতি ছিল। ১৯৭১ সালের ২৮ শে এপ্রিল তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা হারাই একজন স্বজন, কর্মবীর, বিদগ্ধ মানুষকে।

মনোরঞ্জন সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর অঞ্চলের মশুরা গ্রামে ১৯১৫ সালের ৮ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর মশুরা হাইস্কুলে শিক্ষা শুরু হয় এবং ১৯৩১ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবতীকালে ঢাকায় কলেজে, আই.এস.সি-তে ভর্তি হন। এবং সসম্মানে আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর পারিবারিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। বার্মা যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী ত্যাগ করে ফিরে আসেন। এর পরের বছর উত্তরবঙ্গে র একটি চা বাগানের করণিকের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু এই চাকুরী ভাল না লাগায় সেই চাকুরী ত্যাগ করেন। এরপর কানুরিয়াদের জুটমিলের হেড অফিসে কলকাতার নেতাজী সুভাষ রোডে যোগ দেন। সেখানে তিনি আমদানি ও রপ্তানী বিভাগটিতে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে ঐ বিভাগের প্রধান হন। দীর্ঘদিন ঐ সংস্থায় ছিলেন। নবগ্রামে আসার আগে হাওড়া জেলার শিবপুর অঞ্চলের বিপ্রদাস চ্যাটার্জ্জী লেনে থাকতেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নবগ্রামে আসেন। কিছুদিন বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকার পর এরপর নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নবগ্রামের উন্নতির কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য হন। পরবর্তীকালে নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য হন। সেই সময় থেকে নবগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের

জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকেন। নবগ্রাম হরিসভার উন্নতির জন্য তাঁর অবদান নবগ্রামবাসী কোনদিনই ভুলতে পারবে না। তাঁর শেষ কাজ নবগ্রাম জলট্যাঙ্ক ও ডিপ টিউবওয়েলের কাজ। যে সংস্থাটি ঐ ডিপটিউবওয়েলের কাজ করছিল তাদের সঙ্গে বহুদিন রাত্রি জেগে নবগ্রাম সেবক সংঘের বারান্দায় থেকে তাদের কাজ সরেজমিনে দেখেন। কাজটি ঠিক সময়ের মধ্যে শেষ করতে নানারকম সাহায্য করেন। এরপর ১৯৬৫-৬৬ সালে কানোরিয়াদের সংস্থায় যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালের ৯ই মে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় চন্দননগর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনায় মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—১৯১৯ ফরিদপুর জেলার কুলকুড়ি গ্রাম (বর্তমানে বাংলাদেশ)

মৃত্যু—১৯৮৯, ২রা মে (৭০ বছর বয়সে, নবগ্রামে)

শিক্ষাগত যোগ্যতা —ম্যাট্রিক প্রথম বিভাগে ময়মনসিং স্কুল থেকে ও পরে Surveyership পাশ ময়নাগুড়ি থেকে।

চাকুরি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারে Collectorate এ, বিভিন্ন জেলায়।

বিবাহিত— ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে।

বিভিন্ন প্রকার সমাজ সেবামূলক কাজে নিযুক্ত থাকতেন।

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, নবগ্রাম হরিসভার সাথে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। নবগ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘের অন্যতম শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

তৎকালীন নবগ্রামবাসীদের অতি পরিচিত ব্যক্তি। প্রত্যেকটি লোককে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। নবগ্রামের অন্যতম রূপকার। অভিনয় কুশল ব্যক্তি।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন।

নবগ্রাম সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা ও সংঘের আজীবন সদস্য থাকা, নবগ্রাম মাল্টি-পারপাস কো-অপারেটিভ কলোনির প্রতিষ্ঠা, নবগ্রাম সত্যভারতীর নির্মাণ কল্পের সহযোগী যোদ্ধা ছিলেন।

নবগ্রামের বহু বাড়ি ঘরের নির্মাতা, বহু রাস্তা ঘাটের নির্মাতা এক অক্লান্ত ব্যক্তিত্ব।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত ফরিদপুর জেলার মেঘচামী গ্রামে ইং ১৯০৯ সালের ১১ই মার্চ শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্ম। কলকাতার আসার পর ১৯৩০ সালে এম. এ. পড়তে পড়তে কলকাতা হাইকোর্টে চাকুরী পান এবং ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল হাইকোর্টের সহকারী রেজিস্ট্রার পদ থেকে অবসর নেন। সংগ্রামী জীবনে সদা ব্যস্ত লোক। ১৯৪৯ সালে নবগ্রামে স্থায়ী বসবাস এবং ঐ বৎসরই নবগ্রামে নানা সামাজিক কাজে উদ্যোগ নেন। ১৯৫৬ থেকে ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি এবং হাউসিং সোসাইটির সভাপতি সহ নানা পদে ছিলেন। তারই মধ্যে তিনি নানা ধরনের ৩টি পুস্তক রচনা করেছেন এবং নিজের আত্মজীবনী লিখেছেন।

রঙ্গলাল দত্ত

রঙ্গলাল দত্ত মহাশয়ের জন্ম ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার দেহেরগতি গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন সূর্যকুমার দত্ত। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের বরিশালের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। মা বিলাসবাসিনী দেবী।

খুব অল্পবয়সেই তাঁর পিতা তাকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেন। পরে তিনি বরিশালের বিখ্যাত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর যখন তিনি অনার্সসহ বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন এক ভয়াবহ বন্যায় তাঁর জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুড়মার হয়ে যায়। এমনিতেই বরিশাল জেলা খাল, বিল, নদী নালার দেশ। এই প্রলয়ংকরী বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহুলোকের বসতবাড়ী। মৃত্যু অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের ওপর। কোনক্রমে রক্ষা পায় তাঁদের পরিবার।

এমনিতেই সাংসারিক অবস্থা কোন সময়ই সচ্ছল ছিল না। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়েই তাঁকে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়।

শুরু হয় এক নতুন জীবন। প্রথমে চাকুরী পান বরিশাল জেলারই বাখরগঞ্জ কালেক্টরীতে। করণিক পদে চাকুরি শুরু করেন। পরে নিজের কর্মকুশলতার গুণে তিনি বিভিন্ন উচ্চ পদে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে এই কর্মসূত্রেই তিনি কলকাতায় বদলি হন। প্রথমে চন্দননগরে পরে ১৯৫২ সালে তিনি নবগ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সরকারী চাকুরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন।

মানবজাতির সেবাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি ছিলেন সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। অল্পবয়স থেকেই বরিশালের নানান গঠনমূলক কাজে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বরিশাল জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাঠান এবং তিনি এই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। বন্দুকে ছিল তাঁর পাকা হাত। যে বাড়িতে কোন সাপ বের হত তখনই তিনি ছিলেন রক্ষাকর্তা।

নবগ্রামে আসার পর তিনি নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি, নবগ্রাম সেবকসংঘ, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, নবগ্রাম সত্যভারতী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৯৪ সালের ১০ই অক্টোবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রমথরঞ্জন সরকার

[নবগ্রামের জন্মলগ্ন থেকে একটি নাম—নিষ্ঠায়, কর্তব্যে ও ভালবাসার প্রতীক]

অখণ্ড বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় জন্ম ও পড়াশুনো হলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বহুপূর্বেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা শহরে প্রমথরঞ্জন সরকারের তাঁর পরিবারের সঙ্গে আগমন।

যদিও উনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু সাংসারিক দায়বদ্ধতার কারণে তখনকার দিনের ম্যাট্রিক পাশ ভালভাবে করার পরেই তাঁকে চাকুরি জীবন বেছে নিতে হয়েছিল। চাকুরি থাকা অবস্থায় উনি একদিকে যেমন নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটি র উন্নতির জন্যে বিশেষ ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি মানব সেবার কাজে আরও নিজেকে নিয়োগ করিবার জন্যে শ্রীযুক্ত পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী মহাশয়ের পরামর্শ ও সহযোগিতায় "সত্যভারতী" নামক

এক প্রতিষ্ঠান তৈরী করায় তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রমথরঞ্জন সরকারের একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি যদিও অনেক কঠিনতর কাজের মাধ্যমে মানবসেবা করার চেষ্টা করেছেন, তাহা ছিল কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে গভীরভাবে ভালবেসে ও নীরবে। তিনি কোন সময়ই নিজেকে কিছু করছি বলে জাহির করার বিপক্ষে ছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

যে কেহ নতুন আলাপ করতে তাঁর সাথে এলে, তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করতেন যে, যেন তিনি তাঁর অতি পরিচিত এবং সকলেই খুশী হয়ে তাঁর কথা অথবা উপদেশ গ্রহণ করতেন।

নবগ্রাম সৃষ্টির গোড়ায় এমনও হয়েছে যে তিনি আর পাঁচজন শুভানুধ্যায়ীদের মতো নিজে রাস্তায় নেমে নবগ্রামের রাস্তা তৈরীতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন।

আজকের প্রজন্মের অনেকে হয়তো তাঁকে চেনে না কিন্তু নবগ্রামের উন্নতি বিধানে এবং সত্যভারতীর নানান শাখা বিস্তারে তাঁর অবদান প্রবীণ ব্যক্তিদের অজানা নয়। ইহা ছাড়া উনি Red Cross-এর সঙ্গে জড়িত থেকে নানান সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োগ করতেন।

Society-র যে কোন স্তরের মানুষের দুঃখে তিনি আগে থেকে এগিয়ে যেতেন, নিজের স্বার্থ ও শরীরের অবস্থা না দেখে, এমনই ছিল তাঁর কর্তব্যজ্ঞান।

উনি অমৃতলোকে চলে যাওয়ার আগে, কি বাহিরের সমাজের লোকেদের, কি নিজের আত্মীয়পরিজনদের যেন নিঃস্ব করে চলে গিয়েছিলেন।

এমন চরিত্রের লোক আজ অতীব বিরল।

শচীন্দ্রকুমার সরকার

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

কর্মমুখর জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত। নবগ্রামে আসার পর শুধু সমাজ সেবা নয় সমাজের উন্নতির মূলে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত এক বীর সৈনিক। নবগ্রামের প্রতিটি কর্মযজ্ঞে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাঁর নেতৃত্বে এবং সুযোগ্য পরিচালনায় বহু প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে—নবগ্রাম সোসাইটি, নবগ্রাম সেবক সংঘ, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ, সত্যভারতী, রেডক্রশ, গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল

নবগ্রামে একটি বেসরকারী ডেণ্টাল কলেজ এবং রিসার্চ সেণ্টার স্থাপন করা। এই জন্য অনেকটা কাজ তিনি এগিয়ে রেখে গেছেন। তাঁর সেই স্বপ্ন আজ সার্থক রূপ নিতে চলেছে।

কর্মযোগী, বন্ধুবৎসল, নির্ভীক, উদার হৃদয়, তিনি ছিলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে জনসাধারণের অকৃত্রিম বন্ধু, অভিভাবক ও পরামর্শদাতা। সমাজকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এই প্রিয় মানুষটি গত ১লা জানুয়ারী, ২০০২ সালে আমাদের ছেড়ে চলে যান।

সাদা ধবধবে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরা, সদা কর্মময়, মিষ্টভাষী মানুষটি চলে গেলেও, তাঁর কর্মময় জীবন, তাঁকে অমর রাখবে নবগ্রামের উন্নয়নের সঙ্গে। নবগ্রামের প্রতিটি কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছিলেন মুকুটবিহীন রাজার মত, সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত সদা কর্মব্যস্ত। সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে সত্য ভারতীর অন্যতম প্রধান হিসেবে, নবগ্রামের প্রতিটি কর্মযজ্ঞের তিনি ছিলেন যাজ্ঞিক।

চাকুরি জীবনে তিনি আর. এম. এস.-এর (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিভিসন) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। অসবর গ্রহণের পরও দীর্ঘদিন তাকে ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। সমস্ত কাজে স্ত্রী রেণুকা সরকারের সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। নবগ্রাম আজ পশ্চিবঙ্গের মানচিত্রে সুপরিচিত জনপদ আর তার অন্যতম স্থপতি নির্লোভী, সৎ, অক্লান্ত কর্মী মানুষটি কালজয়ী হয়ে থাকবে সবার কাছে।

সম্ভবতঃ ট্রেডইউনিয়ন জীবনই তাঁকে নিয়ে যায় রাজনীতিতে। হুগলী জেলার গান্ধিবাদী নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিমোহন রায়ের সহযোগী হিসাবে তাঁর কর্মময় জীবন হুগলী জেলায় বিশেষ পরিচয় বহন করে। তিনি দল, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রিয় ছিলেন।

১লা জানুয়ারী, ২০০৮, প্রয়াণ দিবসে এই কর্মনিষ্ঠ জননেতার স্মরণে নবগ্রাম মালটিপারপাস কলোনি অ্যাণ্ড হাউসিং সোসাইটির উদ্যোগে নবগ্রাম গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদনে এক মর্মর আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। চিকিৎসক ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী মর্মর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

শৈলেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শৈলেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজী ১৯১৪ সনের ২৮শে নভেম্বর সাবেক পূর্বপাকিস্তানের চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার কয়েকবছর আগে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং সমাজসেবী পরেশচন্দ্র ও গিরীন্দ্রকুমার ব্যানার্জী মহাশয়ের সান্নিধ্যে এসে ইংরেজীর ১৯৫০ সনে নবগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে আসেন। তারপর থেকেই সঙ্গীত, নাটক, চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পরেন। কখনো হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে তৎকালীন নবগ্রামে প্রভাতফেরিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, কখনো বা নাটকে পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে নাটকের মহড়ায় সদা ব্যস্ত থাকতেন, আবার কখনো তৈলচিত্র অঙ্কনে গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। আবার কখনো দেখা যেত ঠাকুর তৈরী করছেন। নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘের জন্মলগ্ন থেকে প্রায় ৮৫ শতাংশ নাটকে তিনিই পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আঁকা তৈলচিত্রগুলি আজও সেবক সঙ্ঘ ভবনে সংরক্ষিত রয়েছে। এক কথায় তিনি ছিলেন মা সরস্বতীর 'বরপুত্র'। সেবক সঙ্ঘ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, মহাদেশ সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ এই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন। মাত্র কয়েকবছর আগেও ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সঙ্গীতের ক্লাস নিয়েছেন। একটি কথা শুনে অনেকেরই অবাক হওয়ার কথা। তা হল তিন প্রজন্মকে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন মা, মেয়ে, নাতি। তাই তিনি মার কাছেও শৈলেনদা, মেয়ে ও নাতির কাছেও শৈলেন দা। জিতেন্দ্রনাথ কুশারী মশাইয়ের তাঁর আঁকা চিত্র, মহাজাতি সদন-এ রক্ষিত আছে। (১৯৬৭)

সূর্য চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ ফুটবল খেলার জগতে এক দিকপাল। তিনি ঢাকা বিক্রমপুরের কাইচা গ্রাম নিবাসী কুমিল্লার উকিল ললিতমোহন চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর জন্ম ১৬ই আগস্ট, ১৮৯৬ সালে। শান্তিনিকেতনে পড়তে এসে স্কুল টীমে ফুটবল খেলার সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নজরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে ফুটবল জগতে প্রবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, ''কালে তুই খেলায় ভাল নাম করবি'। বাঙালি খেলোয়াড়দের মধ্যে সেই সময় এরকম ধুরন্ধর খেলোয়াড়-এর আগে একমাত্র গোষ্ঠ পাল ও শিবদাস ভাদুড়ীর নাম করা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর

সমকক্ষ কেউ ছিল না। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বাছাই করা ভারতীয় টীমে তিনি স্থান পেয়ে এসেছেন। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সাথেই যুক্ত ছিলেন। এরিয়ান্স ক্লাবের দুখীরাম বাবুর কাছে তিনি ফুটবল খেলার শিক্ষা পান। এরিয়াঙ্গের হয়েই তিনি প্রথম কলিকাতার ফুটবল মাঠে নামেন। খালি পায়ে বলের উপর কন্ট্রোল ছিল। এবং সুযোগ সন্ধানী হিসাবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ১৯৩৩ সালে গোষ্ঠ পালের নেতৃত্বে তিনি ভারতীয় একাদশের হয়ে সিংহলে সফর করেন। তিনি ফরওয়ার্ড লাইনে খেলতেন। বহুদিন আই. আর. লোকো শেড (লিলুয়ায়) তিনি কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি নবগ্রামে বাড়ী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। নবগ্রামের ফুটবল মাঠে তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত খেলোয়াড়দের খেলার প্রশিক্ষণ দিতেন।

গত ৩১শে মার্চ ১৯৭২ সালে তিনি প্রয়াত হন।

শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

পিতা ৺নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ৬.১০.১৯১৭ পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরে

মৃত্যু ১৭.৮.১৯৯৫ (B.R. Singh hospital)

পূর্ববঙ্গে ঢাকা রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন। দেশভাগের পর Option দিয়ে হাওড়া DRM-এ কাজে যোগ দেন। Welfare I—হয়ে ১৯৭৭ অবসর নেন।

১৯৫০ সালে নবগ্রাম সি. ব্লকে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেই সময় নবগ্রামের—প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি নবগ্রাম মহাদেশ পরিষদ এবং নবগ্রাম সেবক সংঘের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত ছিলেন। এই দুই ব্লকের মধ্যে নাটক এবং খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরোপকারী এবং সাহসী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। শুধু নবগ্রামের খেলাধুলার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না, কলকাতার উয়াড়ী ক্লাবেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা উয়াড়ী ক্লাবের কার্য্যনির্বাহক সমিতিতে তিনি বহুকাল ছিলেন। হাস্যরসিক ব্যক্তি, সু-অভিনেতা। শ্যামাকান্তের ভাই আর. কে. গাঙ্গুলী ফুটবল রেফারী হিসেবে বিখ্যাত।

জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী

প্রয়াত জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে। জ্ঞানবাবুর ডাক নাম ছিল পানস। ১৯৪৭ সালে রাজশাহীর বি.বি. হিন্দু একাডেমি থেকে জ্ঞানবাবু প্রথম ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশবিভাগের পরে রাজশাহীর বিশাল সম্পত্তি তাঁর পিতার শারীরিক সমস্যার কারণে হস্তান্তরিত হতে না পারায় মহেন্দ্রবাবুর বংশধরেরা বিশেষ অসুবিধের মধ্যে পড়েন এবং ভাগ্যান্বেষণে কোলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে অর্থাভাবের কারণে জ্ঞানবাবু আর.জি.কর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারীতে ভর্ত্তি হয়েও শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া আর চালিয়ে যেতে পারেন নি। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর বরাবরই সুনাম ছিল এবং ভাষা, সাহিত্য ও গণিতে তাঁর সাবলীলতা পরিচিত জনেরা চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। চাকরিরত অবস্থাতেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে প্রাইভেটে স্নাতক হন। নবগ্রাম পদার্পণের পর জ্ঞানবাবুর নতুন জীবন শুরু। নবগ্রামের গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই তাঁর যৌবনশক্তির পূর্ণ বিকাশ। নবগ্রামের স্কুলগুলি, কলেজ, রেডক্রস সোসাইটির শাখা, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি (যা এখন কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মর্যাদায় ভূষিত)সেবক সংঘ, মহাদেশ পরিষদ, সারদামণি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন অগ্রণী সেনানীর ভূমিকায়। নবগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যতগুলি নির্বাচনে তিনি সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন, সবগুলিতেই তিনি জয়লাভ করেছেন। সর্বাধিক সমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেছেন অথচ জনপ্রিয়তার কোনদিনই তিনি বিশেষ পরোয়া করেন নি। তিনি নাটক ও অভিনয় ভালোবাসতেন। নাট্যজগতের মহৎ ব্যক্তিত্বরা তাঁর আরাধ্য ছিলেন। জ্ঞান চৌধুরীর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মজীবনও অত্যন্ত বর্ণময় ছিল। তিনি তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়ে পদোন্নতির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতে পারেন নি কারণ তাহলে তাঁকে নবগ্রাম ছাড়তে হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু গুরুতর দায়দায়িত্ব অনিবার্যভাবে তাকেই বহন করতে হয়েছে তাঁর বিশেষ টেকনিকাল ও প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে। রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মী সংগঠনের তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির মানুষ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা।

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

পিতা ঃ সৌরাংশু রায়চৌধুরী

জন্মস্থান ঃ বরিশাল জেলার কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি।

রোহিনী রায় চৌধুরীর পরিবারের বড় পুত্র।

শিক্ষা ঃ রাজশাহী কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেছিলেন।

অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন রাজনীতিতে প্রবেশ, অনুশীলন পার্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন জীবনে তিনবার জেলবন্দী জীবন যাপন করেছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তর কালে 1947, Animal Husbandry & Dairy Development Department-এ চাকুরীরত ছিলেন।

কীর্তিপাশার জমিদার পুত্র হিসাবে নিজে বিধবা বিবাহ করে বিধবা বিবাহ প্রথার দৃষ্টান্ত নিজ গ্রামে স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে চাকুরীতে অবসর নেন। ১৯৭৬ সালে বোসপুকুর অঞ্চলে জমি কিনে বাড়ী করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ক্যাপ্টেন সুমন দাশগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ জন্ম ১৯৭১-এর ২৯শে জানুয়ারী
পিতা ঃ ডাঃ সুখময় দাশগুপ্ত
মাতা ঃ স্বপ্না দেবী

পড়াশুনা, খেলাধুলা, দেশের এবং দশজনের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

বি. এসসি. পরীক্ষার ফল বেরুবার পর সুমন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। উদ্দেশ্য একই। দেশের সেবা। ১৯৯৫-এর ৫ই ডিসেম্বর সেকেণ্ড লেফ্‌ট্যানেণ্ট পদে উন্নীত হন। ১৯৯৭-এ কনফার্মড ক্যাপ্টেন। এই সময়টুকুর মধ্যেই সাহসিকতম সৈনিকের স্বীকৃতি হিসাবে পেল তিনটি ব্রেভারী অ্যাওয়ার্ড। ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের দুর্গমতম সীমান্ত সিয়াচেনে সুমনের পোস্টিং হল। ১৯৯৮-এর ১লা এপ্রিল ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সিয়াচেনের উচ্চতম সুট 'অমর ক্যাম্পে'। সমতল থেকে ২৩,০০০ ফুট উচ্চতায়। শুধু বরফে ঢাকা ক্যাম্প। তাপাঙ্ক মাইনাস ৪০ ডিগ্রির নীচে।

৬ই জুন ১৯৯৮ বরফে ঢাকা রাতে সীমান্ত প্রহরী সুমন বাংকার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল হানাদারদের হাত থেকে ভারত সীমান্ত রক্ষার দায় মাথায় নিয়ে। সেটাই ছিল যোদ্ধা সুমনের জীবনে শেষ এবং সাহসিকতম যুদ্ধ। ১১ই জুন ১৯৯৮ সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা পরম ঐতিহ্যময় সামরিক মর্যাদায় প্রয়াত শহীদ সুমনকে নিয়ে এল তার নবগ্রামের বাড়ীতে।

১৯৯৮-এর ২৬শে জানুয়ারী ভারত সরকাররের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হল সুমনের প্রতি, মরণোত্তর 'বীরচক্র' উপাধিতে ভূষিত করা হ'ল তাঁকে।

পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত ফরিদপুর জেলার কানেশ্বর গ্রামে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম। ১৯২৯ সালে নবম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগাযোগ করেন। ১৯৩০ সালে লবণআইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরে ঘাটালে লবণ আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে, ছয় মাসের জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহী হিসাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুনরায় তিনি তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন।

১৯৪২ সালে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পুলিশি অত্যাচারের জন্য তাঁর মেরুদণ্ডে একটি স্থায়ী আঘাত সারাজীবন ধরে বহন করতে হচ্ছে।

স্টার সহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করা সত্ত্বেও, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের অপরাধে কলেজ থেকে নির্বাসিত হওয়ায়, তাঁর প্রথাগত শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

স্বাধীনতার পরে তিনি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সত্যভারতী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি কোন্নগর-নবগ্রাম, বারাসাত-নবপল্লী ও শ্রীরামপুর-রাজ্যধরপুরে তিনটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিনটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং বিয়াল্লিশটি ক্রেশকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠায় দুটি অঙ্গনওয়াড়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দুটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, একটি উল-বয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সত্যভারতীর মাধ্যমে পরিচালিত সংসারে অনাদৃত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য একটি বৃদ্ধাবাস, 'কর্মরতা মহিলা'দের জন্য দুটি কর্মরতা মহিলা আবাস, ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রীআবাস, সামাজিক ভাবে বিপন্না মহিলা ও কিশোরীদের জন্য একটি

আবাস এবং অনাথ বালিকাদের জন্য একটি শিশু-আবাস (চিলড্রেন্‌স্‌ হোম) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পারিবারিক বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি পারিবারিক সহায়তা কেন্দ্রও সত্যভারতীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

সত্যভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এ ছাড়াও বাংলার গান্ধি স্মারকনিধির সভাপতি, যক্ষ্মা নিবারণ এ্যাসোসিয়েশনের সহঃ সভাপতি, শিশু বিকাশ প্রচেষ্টার সহঃ সভাপতি, হরিজন সেবক সঙেঘর সহঃ সভাপতি, ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙেঘর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদের সম্পাদক, নবগ্রাম গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যান্ড সরলা মাতৃসদনের সভাপতি। আরও অনেক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত আছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে তাম্রপত্র প্রদান করেন। ১৯৯৭ সালে রাজভবনে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্ত্তৃক নেহরু ফেলোশিপ গান্ধী সেবক পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৯৮ সালে তিনি প্রাক্তন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডী কর্তৃক গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০০ সালে কলকাতার রোটারি ক্লাব তাঁকে মহাদেওলাল সারোগী পুরস্কার প্রদান করে। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন প্রাপক।

ডঃ চিত্তরঞ্জন বশিষ্ঠ

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ ডঃ চিত্তরঞ্জন বশিষ্ঠ বিদ্যানুরাগী মহলে সুপরিচিত এক ব্যক্তিত্ব। তিনি দীর্ঘদিন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বর্দ্ধমান রাজ কলেজে দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নবগ্রামে নির্মিত স্বীয় বাসভবনে বসবাস করেন।

তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বেজনীসার গ্রামে ১৯২০ সালের ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় কালিদাস বশিষ্ঠ কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ শাস্ত্রী। ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই চিত্তরঞ্জন অতীব মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি পিতার ইচ্ছানুসারে কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং এম. এ. পরীক্ষায় এ-গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেছেন। সেই সময় থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সমাজের ছাত্রদের মধ্যে সমানভাবে আদৃত হন। ধর্মের

বন্ধন কখনই তাঁকে একমুখো করে তোলেনি। বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষক এবং ছাত্ররা তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি জীবনভর বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এখনও করেন। যার ফলে তিনি অনেক মৌলিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে দেশ বিদেশে পরিচিতি লাভ করেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ বৈদগ্ধের জন্য ভারতের একমাত্র কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপতি বিদ্যাপীঠ থেকে রাষ্ট্রীয় খেতাব National title বাচস্পতি (সাম্মানিক ডি.লিট.) এর জন্য মনোনীত হন। সম্প্রতি তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, উপাচার্য প্রমুখরা নবগ্রামে উপস্থিত হয়ে তাঁকে 'বাচস্পতি' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে তিনিই এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম শিক্ষা বিভাগে এই রাষ্ট্রীয় খেতাবের অধিকারী।

তাঁর তিনখানি প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়া আরো কয়েকখানা নতুন গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য তিনি বর্তমানে পরিশ্রম করে চলেছেন। তিনি যে কেবল বই নিয়েই থাকেন এমন নয়—জনহিতকর কাজেও তিনি একইভাবে উৎসাহী। নবগ্রামবাসীর তিনি আপনজন হিসাবে পরিচিত।

পরেশনাথ ঘোষ
স্মৃতিচারণ

আমি পরেশনাথ ঘোষ। আমার পিতা স্বর্গীয় নফরচন্দ্র ঘোষ। পিতামহ স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র ঘোষ। প্রপিতামহ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।

বড়বহেড়া গ্রামে আমাদের বাস ২৩০/২৩৫ বৎসর যাবৎ; আমার পূর্বপুরুষ বর্তমান ২৪ পরগনার ঘোষপাড়া অঞ্চলের নিকটের এক গ্রামের মানুষ।

বর্দ্ধমানের রাজার উচ্চতম এক কর্ম্মচারীর সাহায্যে—এই অঞ্চলে আমার পূর্ব পুরুষেরা ৭৫ বিঘা জমি ৭৫ পয়সা বার্ষিক খাজনা হিসাবে প্রাপ্ত হন। ঐ কৃষিজমির উপর নির্ভর করে এখানকার জলা ভূমিতে স্থানে স্থানে পুকুর ও ডোবা কেটে তার মাটিতে বসবাসের এবং কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী করে নেন। কয়েক পুরুষ ঐ জমি ভোগ করার পর দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজের [Sun-set Law]-এর প্রভাবে সে জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্ত্তী যুগে ঐ সমস্ত জমি ছোট ছোট জমিদারদের হাতে গেলে তাদের কাছ থেকে বার্ষিক অধিক খাজনা

বিলি বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষিকার্যের দ্বারা জীবন যাপন করতে থাকেন। এইভাবে বর্তমানে আমরা সপ্তম পুরুষে পৌঁছেছি।

এই অঞ্চলে অর্থাৎ বড়বহেড়া ছোট বহেড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষই অন্যত্র হতে এসে এখানে বসবাস শুরু করে। এই অঞ্চল এককালে 'ডানকুনির ষোল ক্রোশী' জলার অন্তর্গত ছিল। ''মোল্লাবেড়ের'' জলা নামেও পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে গঙ্গা এবং সরস্বতী নদীর অনেক ছোট ছোট জলধারা প্রবাহিত হত। শোনা যায় এখানকার কৃষিজীবী অধিবাসীগণের কৃষির সাহায্যের জন্য বৈদ্যবাটীর বিখ্যাত মুখার্জ্জী (জমিদার) পরিবার ''বৈদ্যবাটী ডানকুনি'' খাল খনন করে জল নিকাশীর ব্যবস্থা করেন।

আমার স্মৃতিপটে দেখেছি এ গ্রামে ৩/৪টি পরিবার ব্যতীত সমস্তই কৃষিজীবী মানুষ। এই বড়বহেড়া গ্রামের মোট ১১৫ ঘর লোকের বাস, তার মধ্যে এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ, এক ঘর কুমোর, এক ঘর নাপিত, এক ঘর কর্ম্মকার, ৬ ঘর আদি বাসিন্দা ডোম, বাকী সমস্তই সদ্‌গোপ। শিক্ষা বা আক্ষরিক জ্ঞান এদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। গ্রামবাসীদের মধ্যে নাম সই করতে পারতো ১০/১২ জন লোক। এটা বলছি বিংশ শতাব্দীর 'তৃতীয় দশকের কথা। আমার বয়স তখন ৭/৮ বৎসর। বড়বহেড়া, ছোটবহেড়া গ্রামে বিদ্যাচর্চ্চার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার আট বছর বয়সে কানাইপুর স্কুলে আমাকে ভর্ত্তি হতে হয়। চারিদিকে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে একা অত্যন্ত ভয়ের সহিত বিদ্যালয় যেতে হত। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী ১৯৪০ সালে শেষ করি। ফাইন্যাল পরীক্ষা তখন শ্রীরামপুরে হত।

১৯৪০ সালে শেষের দিকে প্রায় সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে, শত শত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তখনও এ গ্রামের মানুষ কিছুই জানে না- শুনে না। অবশেষে কলকাতার জাপানী বোমার আতঙ্ক ইংরেজরা প্রচার করতে লাগল। তার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে হাজার হাজার লোককে পালিয়ে যেতে দেখল। তখন ২/১ জনের জানবার ইচ্ছা হল একখানি খবরের কাগজের। আমার কাছে তা থাকায় তা শোনবার জন্য অনেকেই আমার কাছে ভিড় করতে লাগল। এই সুযোগে তাদের ছেলে-মেয়েকে আমার কাছে লেখা পড়া শেখার প্রস্তাব দিলাম। ২/১ জন রাজী হল। এইভাবে আমার প্রথম শিক্ষকতা শুরু হল।

১৯৪১ সালে কোন্নগর ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হলাম অনেক বিরুদ্ধাচরণ করে। গ্রমের পুরোহিত মশাই আমার গুরুজনদের বললেন ইংরাজী পড়লে চাষের কাজকর্ম করতে পারবে না, পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে ইত্যাদি।

গ্রামের আবার ২/১ বয়স্ক লোকই অক্ষর পরিচয় করবার জন্য আমাকে অনুসরণ করলেন। গ্রামে বৃন্দাবন ঘোষের বাড়ীতে যুদ্ধের খবর শোনা এবং তার সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত পড়ার ব্যবস্থা হল। রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত রামায়ণ পড়ে শুনাতাম। ১০/১২ জন শ্রোতা হত। এমনি ভাবে জনগণকে একত্রিত করার চেষ্টা করলাম। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেকে চার আনা/ আট আনা বেতনে পড়ানোও শুরু করলাম। তাদের মধ্যে এখনো ২/১ জন বেঁচে আছে। যেমন গোপাল ঘোষ।

১৯৪২ সাল, যুদ্ধের জন্য জিনিষপত্রের দাম খুব বেশী হল। কৃষিতে দুই বৎসর অজন্মা হল। সংসারে অভাব দেখা দিল। স্কুলে পড়া ছেড়ে কি করে পয়সা উপায় করা যায়, তার জন্য পারিবারিক চাপ আসতে লাগল। চারিদিকে খাদ্য অভাবের কান্নার সুর লাগল। এল প্রকৃত খাদ্যাভাব। এখানে ওখানে খাদ্যাভাবে লোক মরে পড়ে থাকতে লাগল। সে এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। বৃদ্ধা মায়ের শরীর খুবই খারাপ। এমন সময় আমার মেজদির শ্বশুর মারা গেলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর একমাত্র পুত্র আমার ভগ্নিপতি পাগল হয়ে গেল। তিনি ছিলেন ফরাসী আইনজীবী। চন্দননগর থেকে যুদ্ধের তাড়নায় সমস্ত ফরাসী সাহেব চলে গেল। ফরাসী কোর্ট প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি পণ্ডীচেরি কোর্টে প্র্যাকটিস করতে গেলেন। ওখান থেকে সাময়িক রোগগ্রস্ত হয়ে ফিরে এলেন। সংসারে দ্বিতীয় কেহই ছিল না। অসুস্থা মায়ের কাতর আবেদনে আমাকে প্রতি শনিবার চন্দননগর যেতে হত, তাদের সংসারে চলার মত ব্যবস্থা করতে হত। এমনিভাবে দীর্ঘ চার বৎসর চলল।

১৯৪৬ সালে আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। সহৃদয় যোগেশবাবু বললেন আগামী কাল রিষড়া খেয়া ঘাটে ৯/৯-৩০ টায় যেন আমি দেখা করি। উনি রিষড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাবেন। সেই মত পরদিন যোগেশবাবুর সাথে রিষড়ায় প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করে রিষড়া হাই স্কুল থেকে টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমি আজীবন ঐ যোগেশবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে বার হল ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল। আমি ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। এই সময়ে নবগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা গিরিনবাবুর সাথে পরিচয়। গিরিন ব্যানার্জ্জী প্রথমে ১৯৪৬ সালের পূজার সময় এখানে জমি ও বাড়ীর সন্ধানে আমার বড়দা কানাইলাল ঘোষের কাছে আসা যাওয়া শুরু

করেন। প্রথমে কোন্নগর শহরে জমি ও বাড়ী দেখেন। সেগুলি নানা কারণে ক্রয় করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে দীর্ঘদিন যাতায়াতের পর ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাস নাগাদ এই গ্রামে বোসপুকুরের পূর্ব দিকে বর্ত্তমান গিরিন বাবুর বাড়ীর সংলগ্ন জায়গা পঞ্চাশ টাকা কাঠা দরে ক্রয় করেন।

১৯৪৮ সালে আগষ্ট মাসের প্রথম কিংবা জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে গিরিশবাবু টিনের চালাঘরে বসবাস শুরু করেন। এরপর পার্শ্ববর্ত্তী জায়গা প্রথমে নিজের নিকট আত্মীয়দের ক্রয় করতে সাহায্য করেন। অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটা চালাঘর উঠল।

তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য গিরিনবাবু আমাকে অনুরোধ জানালে আমি সাদরে সম্মত হলাম। গিরিন বাবুর চালাঘরে (শোবার ঘরে) বিদ্যালয়ের শুরু ১০/১২ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

১৯৪৯ সালে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হল। নভেম্বর মাস থেকে ছেলেমেয়ে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়ে ৩০/৪০ জন হল। ছোট ছোট শিশুদের জন্য কাদম্বিনী দাসী নামে এক বিধবা বয়স্ক মহিলাকে আমার সাহায্যকারী হিসাবে ১০ টাকা বেতনে রাখা হল। শিশুশ্রেণী হতে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত কাদম্বিনী দেখাশুনা করত। আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত। এই নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের প্রথম সূচনা অক্ষয় বসু মশাইয়ের নব নির্মিত খালি বাড়িতে।

ডাঃ কান্তিভুষণ বক্সী

জন্মতারিখ ঃ ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৮

ঠিকানা ঃ এই-২০৮, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম. বি. বি. এস. - ১৯৫০ (আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ থেকে) হৃদরোগ চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ ১৯৬১ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) এম. ডি (সাধারণ ঔষধ) ১৯৬২ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

বিশেষ যোগ্যতা অর্জন ঃ

১। ১৯৫০-১৯৫৩ সময়কালে আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে মেডিসিন ও হৃদরোগ চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত।

২। হৃদরোগ চিকিৎসাবিজ্ঞানে ট্রেনিং ও গবেষণা, ১৯৫৮-৬১ সময়কালে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ কলকাতা, থেকে এম. ডি. গবেষণা পত্র রচনা।

৩। ১৯৬৭ - ৬৮ সময়কালে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হার্ট হসপিটাল এণ্ড হেয়ারফিল্ড হসপিটাল কার্ডিওলজি বিভাগে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত।

ফেলোসিপ প্রাপ্তি ঃ

১৯৭৫ সালে আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি থেকে।

১৯৭৫ সালে আমেরিকান কলেজ অব চেস্ট ফিজিসিয়ানস।

ইন্ডিয়ান কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অব A.P.I. এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

ব্রিটিশ কার্ডিয়াক সোসাইটির সভ্য।

রোটারি ইনটারন্যাশনালের পল হ্যারিস ফেলো।

কর্মক্ষেত্র ঃ আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন ও কার্ডিওলজি বিভাগের হাউস ফিজিসিয়ান এবং রেজিস্ট্রার ছিলেন ১৯৫০- ১৯৫৩ পর্যন্ত।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ও কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন I.C.C.U. ও কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেশন পরীক্ষাগার স্থাপন (১৯৫২ - ৭১)।

বেলভিউ ক্লিনিকের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও I.C.C.U. বিভাগের মূল পরিচালক (১৯৭১ - ৮৪) (নার্সিংহোমের পরিবেশে এই ধরনের সুব্যবস্থা তাঁরই দ্বারা প্রথম প্রবর্তিত হয়।)

কার্ডিওলজি বিভাগে সম্মানীয় সহযোগী নির্দেশক হিসবে তাঁর অবদান ছিল যে যে প্রতিষ্ঠানে ঃ

ক) বি. এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার।

খ) কোঠারী মেডিকেল এ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার।

গ) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট হসপিটাল।

বর্তমানে হৃদরোগঘটিত সমস্যার চিকিৎসায় কর্মরত।

সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড ঃ

বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সংঘের সভাপতি। এই সংঘটি গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ১৯৮৪ সাল থেকেই নিবেদিত প্রাণ।

ল্যাসওয়েব (LASWEB) পেসমেকার ব্যাঙ্কের সভাপতি। ভারতের এই স্বীকৃত সংস্থাটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষের হৃদযন্ত্রঘটিত সমস্যায় পেসমেকারকে পুনর্ব্যাবহার করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া হার্ট কেয়ার এ্যাণ্ড রিসার্চ ফাউণ্ডেশন (ন্যূনতম খরচে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে) এর মাননীয় সভাপতি।

পুরস্কার ও বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি ঃ

১৯৭৫ সালে কার্ডিওলজি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি।

অধিকর্তা ঃ ইন্টারন্যাশনাল আকাডেমি অব চেস্ট ফিজিসিয়ানস্ এ্যাণ্ড সার্জেনস্ (আমেরিকান কলেজ অব চেস্ট ফিজিসিয়ানস্, পূর্বভারত বিভাগ (১৯৮৬ - ৯০)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার (কার্ডিওলজি বিভাগ) হিসাবে অসামান্য সেবামূলক অবদানের স্বীকৃতিতে 'মিনিস্ট্রি অব রেলওয়েজ' থেকে শংসা পত্র ও বিশেষ আর্থিক পুরস্কার লাভ।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য 'কলম্বো প্ল্যান স্কলারশিপ' লাভ।

১৯৭৬ সালে 'আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি' কর্তৃক সম্মানিত হন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাসপাতাল, বেলভিউ ক্লিনিক এবং অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে I.C.C.U. প্রচলনে তার অগ্রণী ভূমিকা।

২০০০ সালে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালে 'ডাঃ বি. সি. রায় স্মারক বক্তৃতা দান।

কার্ডিওলজি বিভাগে তাঁর অসামান্য অবদান ও সমাজ সেবামূলক কর্মযজ্ঞের স্বীকৃতিতে ১৯৯৯ সালে 'হেল্পেজ ইণ্ডিয়া' কর্তৃক তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৯৫ সালে যক্ষ্মা এবং বক্ষদেশ সংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে (পশ্চিমবঙ্গের এই বার্ষিক সম্মেলনে) ডাঃ পি. কে. ঘোষ স্মারক বক্তৃতা দান।

গবেষণাপত্র রচনা ঃ

নানান সভা পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্র আলোচিত ও প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ কয়েকটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

১৯৬৫ সালে বাংলায় সম্ভবতঃ এই প্রথম তিনিই হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর ওপর পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ নির্ভর আলোচনা উপস্থাপন করেন, বিষয় ছিল ঃ 'মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস্' (ডাইলেটেড কার্ডিও মায়োপ্যাথি)

১৯৭৩ সালে তিনি প্রথম দেখালেন বিশেষ যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে 'ট্রান্সথেরাসিক কার্ডিয়াক পেসিং ইন ভেনট্রিকুলার অ্যাসিসটোল' পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা কত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭৩ সালে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা থেকে পুনরুজ্জীবন লাভ (C.P.R.) 'স্ট্যামার সিকোয়েন্স'র ক্ষেত্রে তার গবেষণা।

১৯৭৯ সালে 'প্রোলংগড' রিপোলারাইজেসন সিনড্রোম সেকেণ্ডারী টু অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইসকিমিয়া গবেষণাপত্র রচিত হয়।

১৯৭৯ সালে হৃদপিণ্ডের পেশীর ক্ষত চিকিৎসায় গ্লুকোজ ইনসুলিন পটাসিয়াম থেরাপির ওপর তাঁর গবেষণা পত্র রচিত হয়।

'আনস্টেবল অ্যানজাইনার সঙ্গে স্প্যাজম অব রেটিনাল আর্টারিজ'-এর ওপর গবেষণা (১৯৮৪)।

নতুন সহস্রাব্দে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাবনা নিয়ে (হেলথ্ কেয়ার ডেভলপ্‌মেন্ট) তাঁর অসামান্য ভাবনা প্রচার ও প্রসার (১৯৯৯)। তিনি ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের চিকিৎসক।

ননীগোপাল শূর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ ইংরাজী ১৯৩৫ সালে অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর বিভাগের সহকারী কমিশনার পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। উনি হিন্দি সাহিত্যের প্রতি শুধু অনুরাগী নন, হিন্দি শিক্ষার প্রসার এবং বিকাশের জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থায় অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে হিন্দি-শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন। অনুবাদ প্রিয় ননীবাবু প্রায় শতাধিক গল্প এবং একখানা উপন্যাস হিন্দি এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় এবং বাংলা হতে হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। হিন্দি গল্প সাহিত্যিক প্রেম চন্দের অনেকগুলো গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন যা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি তাদের প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহে প্রকাশ করেন।

কিষণচন্দর ঃ উর্দু সাহিত্যে একজন প্রবাদপুরুষ। আবেগদীপ্ত ভাষায় তিনি তার গল্পে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের শোষণের কথা তুলে ধরেছেন আর সেই সঙ্গে বলেছেন পারস্পরিক সম্প্রীতি-সহমর্মিতার কথা। এ সবই গল্পগুচ্ছকে ননীবাবু সুললিত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং সাহিত্য একাদেমি অনুবাদ বইটির নামকরণ করেছেন 'কৃষণ চন্দের নির্বাচিত গল্প' সাহিত্য একাদেমি এই বইটিকে বাংলায় অনুবাদের একখানা চমৎকার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ১৯শে আগষ্ট ২০০২ নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল সেণ্টারে সাহিত্য একাডেমী ননীবাবুকে এই পুস্তকটির জন্য 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কারে ভূষিত করেন। নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি অ্যাণ্ড হাইসিং সোসাইটি লিমিটেডের সহঃ সম্পাদক।

মাননীয় বিচারপতি আশীসবরণ মুখোপাধ্যায়

নবগ্রামের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। ১৯৩৬ সালে বরিশাল জেলার কুলবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। কলিকাতায় শিক্ষালাভ (১৯৪৩-১৯৫৯) ১৯৫৩ থেকে নবগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বিচার বিভাগে যোগদান করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারকের পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। নবগ্রামের উন্নতির জন্য তার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

বি. এস. সি. স্পেশাল বি. এ. এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬২তে ডব্লু. বি. সি. এম. (জুডিসিয়াল) পরীক্ষায় কৃতকার্য হন এবং ১৯৬৩ সালে জুডিসিয়ল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৮১তে হায়ার জুডিসিয়াল পদে উন্নীত হন। চাকুরী জীবনে প্রেসেডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ, জয়েন্ট সেক্রেটারী (ল) হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এবং এক্স-অফিসিও সেক্রেটারী জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, লিগ্যাল রিমানবেরেন্স মেট্রোরেল প্রমুখ আইন বিষয়ক বিভাগে এবং সবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদে ব্রতী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরেও সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ মত তিনি আইন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে চেয়ার পার্সেন হয়ে নবগ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করছিলেন।

জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানীয় পদে থেকেও তার অমায়িক এবং সহজ সরল ব্যবহারে জনপ্রিয় হয়ে আছেন।

ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য পিতা অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, পূর্বনিবাস গ্রাম ও পোস্ট অফিস রুদ্রকর, জেলা ফরিদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ। বর্তমান ঠিকানা ১৯, আদিবর্ত্ম, নবগ্রাম, জেলা হুগলী। জন্ম ১.৩.২৮ সনে উপরোক্ত বাংলাদেশের ঠিকানায়। ১৯৪৮ সালে বর্তমান ঠিকানায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে নবগ্রামের প্রাথমিক গঠনকাণ্ডে এবং এখানকার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এখানকার বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে বিশেষত ১৯৫০ সালে নবগ্রামে সোসাইটি কর্তৃক নবগ্রাম Health and Welfare

Committee গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে তা নবগ্রাম দাতব্য চিকিৎসালয় হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। এই Committee-তে সহঃ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই চিকিৎসালয় গড়ে তোলার পেছনে তৎকালীন সভাপতি প্রয়াত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক প্রয়াত পরেশচন্দ্র চন্দ, প্রয়াত হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, প্রয়াত ক্যাপ্টেন ডাঃ সত্যেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আছে উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁদের সহযোগিতায় ১৯৫১ সনের মে মাসে—ভাড়া বাড়ীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে নিয়মিত ওষুধপত্রাদির ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে বর্তমান ২২ নং আদিবর্ম্মে সোসাইটির নিজস্ব বাড়ীতে এটা স্থানান্তরিত করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে Indian Red Cross Society এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ঐ সালেরই আগস্ট মাস থেকে চিকিৎসকের দায়িত্বভার এককভাবে ডাঃ ভট্টাচার্য গ্রহণ করেন।

নবগ্রাম সেবক সংঘের সামাজিক বিভাগে সম্পাদক হিসেবে এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সেবক সংঘের চিকিৎসালয়ের চিকিৎসার দায়িত্বভার পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে অধ্যাপক ডাঃ হিমাংশু চক্রবর্তী এম.ডি. যুক্ত ছিলেন।

T.R.A. প্রতিষ্ঠানের সাথে আংশিক সময়ের চিকিৎসক হিসাবে ১৯৫৪ সনে নিযুক্ত হন। বর্তমান 'সত্যভারতী'র জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। উল্লেখ্য ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সেই সময় বর্তমান সত্যভারতীর কর্ণধার পুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের-এর সঙ্গে পরিচয়। এছাড়াও অঙ্গনওয়ারী, বালোয়াড়ী, হোম প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

বিশুবাবু নামে উনি সর্বজন পরিচিত। সহজ, সরল, নিরহংকারী সেবাব্রতী মানুষটি দিনে রাতে নবগ্রামের মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। আজকের সমাজে ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য এক ব্যতিক্রমী চরিত্র।

গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত বরিশাল শহরে ১৯২১ সালে গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম। পরিবারের নিবাস—ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁও গ্রামে। কৈশোরেই তিনি অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হন।

১৯৩৫-৩৬ সালে ছয়গাঁও গ্রামের বাড়ীতে দুই বৎসরের জন্য তাঁকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এবং মাঝে মধ্যে পুলিশ গ্রামে ঢুকে অকথ্য অত্যাচার চালায়। দুই বৎসর পরে ছাড়া পেলেন। পুনরায় রাজদ্রোহী হিসাবে বন্দী হন। অনুশীলন সমিতির একটি বিরাট অংশ জেলেই নতুন দল গঠন করে "বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল"। উনি এই নতুন দলের সদস্য হন।

১৯৪২ সালে তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হন। ৪ বৎসরের জন্য কারাবাস হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে ১৯৭২ সালের ১৫ই আগস্ট তাম্রপত্র প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা প্রাপক। তাঁর ভাই ̐দশরথ ব্যানার্জীও স্বাধীনতা সংগ্রামী।

অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত বরিশাল জেলার কলসকাঠি গ্রামে ১০ই ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম। ইং ১৯২৬ সালে পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে আবগারী শুল্ক বিভাগের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ এবং শাড়ীক ভাণ্ডারের লবণ গোলার নিকট আন্দোলন। এই সব আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। কলকাতায় বরিশাল সেবা সমিতির কাজে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। জীবনের পথ প্রদর্শক হিসাবে তাঁর মায়ের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ইং ১৯৭৪ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি তাম্রপত্র গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ভাতা প্রাপক সুবক্তা, সৎ এবং রাজনৈতিক জীবনে নিষ্ঠাবান এই গান্ধিবাদী বৃদ্ধ আজও পুরানো কথা শুনতে ও শোনাতে ভালবাসেন।

ডাঃ শিশিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লাতে ইং ১৯২২ সালের ১৩ই জুলাই ডাঃ শিশিররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম। ১৯৩৫-এ তাঁর কলকাতায় আগমন। ১৯৪৩-এ হাইকোর্টে চাকরী শুরু করেন এবং

পরবর্তীকালে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৯৮৪-তে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী ক্ষেত্রে উঁচু পদে থাকা সত্ত্বেও ১৯৬০ সালে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এবং সার্জারিতে ডিপ্রোমাপ্রাপ্ত হন। নিজের অফিস ব্যতিরেকে বহু জায়গায় বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করে জনমানসে তিনি সম্মান এবং বিশ্বাস অর্জন করেছেন। ১৯৫১ সালে তিনি নবগ্রামে এসে বহু জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত হন। এখনও তিনি খুব অল্প খরচে বহুজনের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে থাকেন। হরিসভা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে সবার অলক্ষে অর্থদান করে থাকেন।

শম্ভুনাথ দাশচৌধুরী

শম্ভুনাথ দাসচৌধুরীর জন্ম ১০ জানুয়ারী, ১৯৪১ সালে। পিতা অবিনাশ চন্দ্র দাশচৌধুরী, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের অধিবাসী। ১৯৫৬ সালে স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬১ সালে এল. ই. ই. এবং ১৯৬৫ সালে বি. এ. পাস করেন।

১৯৬১ সালে ইলেকট্রিক্যাল চার্জম্যান হিসাবে রেলওয়েতে ইলেকট্রিফিকেশনের কাজে যোগদান করেন। তিনি বিদ্যালয়-জীবন থেকেই ফুটবল জগতে গোলকিপার হিসাবে প্রবেশ করেন। হাওড়া জেলার শ্রেষ্ঠ গোলকিপারের শিরোপায় ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে কলেজ জীবনে গোল রক্ষকের বদলে লেফট আউট হিসাবে মাঠে নামেন। এই প্রথম তিনি কলকাতা মাঠের হদিশ পান। হাওড়ায় থাকাকালীন তিনি সেখানকার একটি আঞ্চলিক দলে খেলার সুবাদে ফুটবল জগতের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। ১৯৫৯ সালে তিনি হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবে যোগদান করেন এবং কলকাতার প্রথম ডিভিশনের ফুটবল জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত উয়াড়ী ক্লাবে খেলার সুবাদে ফুটবল জগতে স্বীকৃতি পান। ১৯৬৩ সালে ইষ্টার্ন রেলে খেলার পর ১৯৬৪ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন। ১৯৬৪-৬৫ এই দুই বছর ইষ্টবেঙ্গলে খেলার পর পঁচিশ বছর বয়সে কাষ্টমসে চাকরীর 'এ' গ্রেড প্রিভেন্টিভ অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। কাষ্টমস টীমের চতুর্থ বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উন্নয়নে শম্ভুবাবুর অবদান অনস্বীকার্য্য।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফিতে রেলওয়ের নিয়মিত ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে শ্রেষ্ঠ লেফট আউটের স্বীকৃতি পান কিন্তু ভারতীয় দলে যোগদানের সুযোগ পাননি। ১৯৬৪ সালে ভারত ভ্রমণকারী তাতাবানিয়া

ক্লাবের বিপক্ষে এবং ১৯৬৬ সালে ভারত ভ্রমণকারী রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতের সঙ্গে যোগসূত্রের সন্ধান পান।

১৯৬৪ সালে নবগ্রামে নিজ বসত বাড়ি তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ২০০1 সালে জানুয়ারীতে কলিকাতা কাষ্টমস এ ডেপুটি কমিশনার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্থানীয় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সোস্যাল স্কোয়াডের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি বিভিন্ন সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে সেবক সঙ্ঘের ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন (১৯৭৭)।

মনোজ ভট্টাচার্য্য (সাংসদ)

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ জন্ম ২৯.১১.১৯৪৯। মনোজ ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের মনোনীত আর. এস. পির সদস্য হিসাবে ২০০০ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যসভায় ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। মনোজ ভট্টাচার্য্যের পিতা প্রয়াত মাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় এম. এ. ক্লাসে দর্শন শাস্ত্রে পঠন পাঠনের সময় সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন অমায়িক, বিনয়ী এবং মৃদুভাষী পণ্ডিত মানুষ। মনোজ ভট্টাচার্য্যের পিতামহ প্রয়াত অমর চন্দ্র স্মৃতি সাংখ্যাতীর্থ মহাশয় ছিলেন দিনাজপুরের জমিদার রাজা শরদিন্দু নারায়ণ রায়ের রাজসভার সভাপণ্ডিত। বিক্রমপুরের বামাইল গ্রামের মানুষ। প্রয়াত মাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবগ্রামে জমি ক্রয় করে বাড়ি তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মনোজ ভট্টাচার্য্য ছাত্র জীবন থেকেই সক্রিয়ভাবে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে আর. এস. পি দলভুক্ত হন। বর্তমানে তিনি এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। রাজ্যসভায় তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। নবগ্রাম এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষদের জন্য তিনি এম. পি.-র জন্য নির্দ্ধারিত তহবিল থেকে একটি বাতানুকুল এ্যাম্বুলেন্স স্থানীয় সমাজসেবী সংগঠন সোস্যাল স্কোয়াডকে পরিচালনার দায়িত্ব দেন। শ্রী মনোজ ভট্টাচার্য্য সদালাপী, বিনয়ী এবং সজ্জন মানুষ। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নবগ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

দেবব্রত সুর চৌধুরী

বিশিষ্ট নট, নাট্যকার পরিচালক ও নাট্যগবেষক নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা দেবব্রত সুর চৌধুরীর জন্ম ১৪ই মার্চ ১৯১৮, উজিরপুর, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। মৃত্যু ২৪শে অক্টোবর ২০০০। তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে সপরিবারে নবগ্রামের বাসিন্দা।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সক্রিয় অনুগামী স্বাধীনতা সংগ্রামী র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং পরবর্তীকালে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য মানবতাবাদী দেবব্রতবাবু ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁ ইনস্টিটিউটের সাথেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ থিয়েটার আর্টসে তিনি ছিলেন সাম্মানিক অধ্যাপক। সেবক সঙ্ঘের পরিচালকমণ্ডলীতেও তিনি সদস্য ছিলেন।

নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ দেবব্রতবাবু ১৯৪২ সালে ক্যালকাটা রেনেসাঁ ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যা পরে 'নবনাট্যম' নামে পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে আজও বর্তমান। প্রচলিত নাট্যধারার বাইরে বাস্তবানুগ নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁরা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন'রও পূর্ববর্তী, দেবব্রত তাঁদের অন্যতম।

নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কর্মজীবনে দেবব্রতবাবু জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদ থেকে ১৯৭৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি গিরিজাশংকর ব্যানার্জীর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা নেন। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি সহযোগী গায়ক ছিলেন।

দেবব্রতবাবু তাঁর দেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সহায়তা কল্পে দান করে গেছেন। গণদর্পণ সংস্থার সহযোগিতায় তার দেহটি কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমী বিভাগে অর্পণ করা হয়।

নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম ১৯৩৮ সালে বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায় ভড্ডাগ্রামে। শ্রী চট্টোপাধ্যায় একদিকে কর্মজীবনে যেমন সফল, প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে বিপুল কর্মের ভার সত্ত্বেও সমানভাবে সমাজ সেবার কাজেও ব্রতী। বর্তমানে তিনি নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি অ্যাণ্ড হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড-এর সভাপতি। নবগ্রাম 'সেবক সংঘের' জন্মলগ্নের কিছুকাল পর থেকেই আজ পর্যন্ত তিনি তার সদস্য। এক সময় এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে সভাপতি ছিলেন। তরুণ প্রজন্মকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে এখন তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে এই সংগঠনের সাথে জড়িত। সেবামূলক কাজে তাঁর হাতেখড়ি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। তাই

তাঁর ভাষায় সেবক সংঘের স্থান তাঁর মনের মধ্যে এক স্বর্ণাসনে। নবগ্রাম গোলক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য। শ্রী চট্টোপাধ্যায় নবগ্রাম ইউথ স্টার নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন।

শ্রী চট্টোপাধ্যায় সারা জীবন সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে লাভ করেছেন দেশে ও বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বহু পুরস্কার।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'বিজয়রত্ন' পুরস্কার (১৯৯৬), 'এক্সেলেন্স' পুরস্কার (১৯৯৬), 'বিজয় শ্রী' পুরস্কার (১৯৯৭), 'গ্লোরী অফ ইণ্ডিয়া' (১৯৯৭), 'ভারতীয় উদ্যোগ রত্ন' (১৯৯৭), 'বেস্ট সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া' পুরস্কার (১৯৯৮), 'জহরলাল নেহেরু লাইফ টাইম এচিভমেন্ট' পুরস্কার (১৯৯৮), 'ইন্দো-নেপাল ফ্রেণ্ডশিপ' পুরস্কার (১৯৯৮), 'ইন্টারন্যাশনাল গোল্ডস্টার' পুরস্কার (১৯৯৯), 'ভারতজ্যোতি' পুরস্কার (২000), 'মাদার টেরেসা এক্সেলেন্স' পুরস্কার (২০০২) এবং 'রাষ্ট্রীয় গৌরব' পুরস্কার (২০০৩)। লেখক হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ গ্রন্থগুলি হল 'কোন অজানার টানে', 'ভেলোরের পথে', 'সাক্ষী অগ্নি তুমি আমি' প্রভৃতি।

রেবতীমোহন দাস

জন্ম ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৯। গ্রাম চালিতাতালি, পোঃ হরিনা, জেলা ত্রিপুরা। রেবতীবাবু ১৯৫৪ সালে সপরিবারে নবগ্রামে আগমন করেন। তিনি কর্মজীবনে ব্রেথওয়েট এণ্ড কোম্পানীতে চাকুরী রত ছিলেন। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে বেরতীবাবু কারাবরণ করেন। নবগ্রামের বিবিধ উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে রেবতীবাবুর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৬ থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অদ্যাবধি তিনি নবগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্যকরী সদস্য হিসাবে শ্রমদান করে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে সোসাইটির সম্পাদক পদে আসীন। নবগ্রাম সেবক সংঘের তিনি সদস্য এবং সাধারণ সম্পাদক পদেও কাজ করেছেন। নবগ্রাম সভ্যভারতীর কার্য্যকরী সমিতিতে তিনি যুক্ত। তিনি সম্পাদক এবং পরে সহ সভাপতির পদেও ছিলেন। C.M.W.S.A.-র আগমনের পূর্বে নবগ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থাপনায় রেবতীবাবুর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

রেবতীবাবু সারা জীবনের সমাজ সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'ভারত জ্যোতি' সম্মানও লাভ করেছেন।

নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৭, খয়েরাবাদ, বরিশাল, বাংলাদেশ। নবগ্রাম-এ বসবাস শুরু ১৫ আগস্ট, ১৯৪৯ থেকে। নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের উত্তীর্ণ প্রথম বছরের ১৯৫৪-র ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী চাকুরী ১৯৫৬-৫৮। ১৯৫৮-৬৬ গুপ্তিপাড়া হাইস্কুল, কোন্নগর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যাপীঠ এবং নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ এর শিক্ষক। ১৯৬৬-৯৭ নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজে অধ্যাপনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা ও প্রধান পরীক্ষক। আকাশবাণী, কলকাতার বিদ্যার্থীর আসরে নিয়মিত পাঠ দান, সেই সূত্রে 'বেতার জগৎ' এর লেখক।

Studies in Modern Bengali Poetry–Ed by নির্মল ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে ইংরেজি প্রবন্ধের লেখক। R. K. Mission, Gol Park-এ স্বামী প্রভানন্দজীর আহ্বানে বক্তৃতা দান, পরে 'শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন জীবন ও সাধনা' গ্রন্থ রচনা; আনন্দবাজার এ বইকে বলেছেন, "বিস্মৃত ব্যক্তিত্বের তথ্যনিষ্ঠ জীবনী'। উদ্বোধন পত্রিকার লেখক। 'বরিশালের অতীন্দ্রনাথ' ছোট্ট বইটি পড়ে সাধুবাদ দিয়েছেন ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। আনন্দবাজার পত্রিকার অল্প স্বল্প লেখক। স্ত্রী অপর্ণা সহ ঢাকা-বরিশাল-চট্টগ্রাম কক্সবাজার ভ্রমণ ২০০৬ এর পূজায়। সেই ভ্রমণ কথা Statesman ছেপেছেন ছবিসহ রবিবার ১০ই জুন, ২০০৭-এ। হুগলীজেলার ইতিহাসকার জেজুরের সুধীর মিত্রের সাহিত্য সঙ্গী। বর্গির হাঙ্গামা বিষয়ে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃত গ্রন্থের সমসাময়িক চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ লেখক। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০) বিষয়ে 'ভারত কোষ'-এর লেখক। সুবক্তা, গবেষক, সমাজসেবক, নবগ্রাম সেবক সংঘ-এর একদা সাধারণ সম্পাদক ১৯৭৭-৮০। অধুনা চন্দননগর-রিষড়ার অধিবাসী হলেও নবগ্রামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

চিত্তরঞ্জন চন্দ

চিত্তরঞ্জন চন্দর জন্ম ২১ জুলাই, ১৯৩৭ সালে নোয়াখালি জেলার রফিকপুর গ্রামে। পিতা প্রয়াত মহেশচন্দ্র চন্দ। চিত্তরঞ্জন চন্দ বাঙালীর প্রিয় খেলা ফুটবল জগতের একজন দীপ্তিমান ব্যক্তি। অদম্য ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ফুটবল জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে প্রথম খিদিরপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে কাটিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ১৯৫১ সালে হাওড়ায় এসে হাজির হলেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হলেন। পেটে

খাবার থাক বা না থাক অদম্য আগ্রহ নিয়ে নিজের মেধা এবং দু-পাকে সম্বল করে খেলার মাঠের গোলের পিছনে দাঁড়িয়ে মাঠের বাইরের বলগুলিকে চমৎকার শটে মাঠের ভিতর পাঠিয়ে দেন। প্রবাদ আছে সাচ্চা গুরুর সাচ্চা শিষ্য পেতে দেরি হয় না। হাওড়া ইউনিয়নের কোচ মাননীয় দাশু মিত্রের দৃষ্টিগোচরে আসেন চিত্ত চন্দ। তিনি চিত্তবাবুর আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে তাঁকে নিজের শিষ্য করে নিলেন। দাশুবাবুর প্রচেষ্টায় চিত্ত চন্দর স্থান হল খেলার মাঠে এবং হাওড়া ইউনিয়নের খেলোয়াড় হিসাবে যোগ দেন ১৯৫৬ সালে। সাতান্ন সালে প্রথম রোভার্সে ডিভিশন লিগে বড় দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন অদম্য সাহসিকতা ও মনোবল নিয়ে। সাতান্ন সালেই ইষ্টবেঙ্গল দল যখন ডি. সি. এম খেলতে নয়া দিল্লী গেল চিত্ত চন্দকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। ছোট্ট একটি দলে খেলে ভারতের শ্রেষ্ঠ এক দলের ডাক পেয়ে তিনি অভিভূত হন এবং ফাইনালে সেই ম্যাচে চিত্তবাবু খেলেন এবং ইষ্টবেঙ্গল টিম জয় যুক্ত হয়ে ট্রফি লাভ করে। ১৯৫৮ সালে তিনি ইষ্টবেঙ্গল টিমে যুক্ত হন লাল হলুদ জার্সি গায়ে চড়িয়ে। চিত্তবাবুর কথায় দাশুদাই আমাকে মানুষ করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি রাইট ব্যাকে খেলতেন। তিনি ডুরান্ডে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল-এর বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সাথে খেলেন। চিত্তবাবু ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগ্যতার সাথে খেলে ১৯৬৩ সালে ইষ্টার্ন রেলের মত গ্লামারশূন্য এক ক্লাবে যোগ দিতে বাধ্য হন চাকুরীর সুবাদে। কারণ তিনি রেলে চাকরী করতেন। রেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলা চলবে না। রেলে অ্যাপ্রেনটিস হয়ে ঢুকলেন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ইষ্টার্ন রেলে খেলে মাঠ থেকে একদম বিদায় নেন এবং নবগ্রামে নিজ বসত বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৬১ সালে দলের অধিনায়ক ছিলেন বলরাম, চিত্তবাবু ছিলেন সহ অধিনায়ক। ১৯৬২ সালে ইষ্টবেঙ্গল দলের অধিনায়কের গুরুদায়িত্বভার আসে চিত্ত চন্দের উপর। শারীরিক কারণে তিনি বর্তমানে খেলার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। চিত্ত চন্দ রক্ষণ বিভাগের একটা প্রাচীর হিসাবে নিজের পরিচয় রাখেন। তিনি নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

জনরঞ্জন সেন

পিতা ঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, কলকাতার সিটি কলেজের সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক। সংস্কৃত গ্রন্থের ছাত্র পাঠ্য টীকাকার। বড় ভাই গান্ধিবাদী গঠনমূলক কর্মী, নোয়াখালির গ্রামের গান্ধি আশ্রমের আজীবন সেবক। মাঝে মাঝে

নবগ্রাম আসতেন। জনরঞ্জন বাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদস্থ কর্মী হিসেবে তালগুড় মহাসঙ্ঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা, সংগঠক। তিনি নবগ্রামের বহু মানুষের অন্নদাতার ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। একদা আফ্রিকার লিবিয়া রাজ্যে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নাম স্মরণীয় করে রেখেছেন। তাঁর পরামর্শে লিবিয়া তালগুড়ের কার্যে সফল হয়েছে। তাঁর বাড়ি নবগ্রাম পোস্ট অফিসের উত্তরে জগদীশ বসু রোডে।

ডঃ বিমলকান্তি সমাদ্দার

জন্মসূত্রে বরিশাল বাগধা গ্রামের মানুষ। কলকাতায় পড়াশুনা। ফজলুল হক্ সাহেব প্রতিষ্ঠিত বরিশাল চাখার কলেজের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ-এ অধ্যাপনা করেন। হাওড়া বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজে বাংলা বিভাগীয় প্রধান হন। তাঁর থিসিস গ্রন্থ "রবীন্দ্র কাব্যে কালিদাসের প্রভাব" গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির দীর্ঘ দিন সদস্য ছিলেন। শেষ বয়সে কবিতা রচনায় যশ অর্জন করেছেন। নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘের "উত্তর সাহিত্য" পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন।

দিলীপ দাস

প্যারিসে রেনোয়ার কাফে গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনী ২০০৪ (মে-জুন) হয়েছিল। এখান থেকে গিয়ে একক প্রদর্শনী করা সহজসাধ্য নয়।

লণ্ডনে প্রদর্শনী/টায়েনবী হলে ১৯৯৮ সালে/প্রদর্শনী করতে গিয়ে শিল্পকলার উপরে বি. বি. সি. সাক্ষাৎকার নিয়েছিল।

ভারতের বড় বড় জাতীয় চিত্রকলা-প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী বহুবার হয়েছে। কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্য।

The Economic times 03.08.1996

'Suggestive daubs and blobs, hazy blurs of paint, breezy strokes give the watercolour landscapes of Dilip Das a lyrical grace..... But it is n't only watercolour that brings out the artists intimacy with Nature with such lucid economy. He is equally at ease mixing media.

Hindustan Times, June, 2004.

It's a tale of hardship and toil that ultimately got paid his dream came true when 22 of his water colours and mixed me paintings were exhibites at Renoir Cafe gallery in Paris.

আনন্দবাজার ২৪ আগস্ট '৯৬

গাছপালা অধ্যুষিত ছায়াঘন সায়াহ্নের মেঘলা আকাশ, সজল প্রান্তর, গ্রামীণ বাড়িঘর, পথচলতি দু-একটি মানুষ-এইসব নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর নিসর্গ। নিজেরই রোমান্টিক চেতনার প্রতিফলনে এক বিষণ্ণ সৌন্দর্যের অন্বেষণ রূপ পায় প্রকৃতির অনুষঙ্গময় তাঁর জলরঙের বিস্তারে।

The Telegraph, 19 July, 1996— Dashes and dauls, breezy broad sweeps of lucid or opaque washes and a few finer detailed strokes are all that flesh out the landscapes of Dilip Das in water colour recently mounted at the Academy of Fine Arts.

নব ভারত টাইমস, ৮ আগস্ট ১৯৯৩......... দিলীপকে চিত্রোঁসে জলরঙ্গোঁ কী সামর্থ্য কা আভাস মিলতা হ্যায়। ওয়ে ঔর ছায়াকে উতার চড়াও কো মন কী তরঙ্গোঁ কী তরহ্ ইস্তেমাল করতে হ্যাঁয়। যদ্যপি ইয়ে চিত্র ল্যাণ্ডস্কেপ হ্যাঁয় পর দৃশ্যকে মাধ্যমসে মন কী ডাতরী পরতেঁ খোলনে কী ক্ষমতা হ্যায়।

পিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ দাস

জন্ম ঃ ফরিদপুর, মাদারীপুর, বাংলাদেশ।

পাঙ্গাশীয়া গ্রাম

১৯৫০ সালে জন্ম। নবগ্রামের অধিবাসী।

স্মৃতিতে নবগ্রাম

আমার দেখা নবগ্রামের সেকাল-একাল

বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়—
সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।"
—রবীন্দ্রনাথ

নবগ্রামের পুরানো সেই দিনগুলির কথা লিখিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। যে ঘটনাগুলি চোখে দেখা, কোনদিনই ভুলিবার নহে, তাহা বোধ করি সহজেই লেখা যায়—কিন্তু যেগুলি স্মৃতিনির্ভর, প্রাণের কথা—অর্থাৎ ভাবিয়া লিখিতে হয়, সেগুলিতে অনেক রং চড়াইয়াও রসোত্তীর্ণ করা কঠিন—বিশেষ করিয়া আমার মত অশীতিপর এক বৃদ্ধের পক্ষে, সে যাহাই হউক, যখন লিখিতেই হইবে, সময় ও পরিসর খুবই সীমিত এবং আমার এখন বিস্মরণের পালা চলিতেছে এবং বিশেষ করিয়া (আমার এই বিবরণ) 'নবগ্রামের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক বৃত্ত ও বৃত্তান্তের শেষে ইহা সংযোজিত হইবে বলিয়া বিদগ্ধ সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন—কাজটি আমার অত্যন্ত দুরূহ মনে হইতেছে, কিন্তু নিরুপায়, অতএব লিখিতে শুরু করি। (কি লিখিলাম, কি বলিলাম তাহা পাঠকের বিচার্য—) অনবধানতাবশতঃ ত্রুটি হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

নবগ্রামের জন্মলগ্ন ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে। অতএব অঙ্কের হিসেবে ২০০৮ সালে এই জনপদের ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবে। যখন আমি নবগ্রামে আসি তখন আমি ২৫ বছরের যুবক। বর্তমানে আমার বয়স ৮৩ বৎসর। অর্থাৎ আমি প্রায় ৫৮ বৎসর যাবৎ নবগ্রামের অধিবাসী। বিবরণের সুবিধার্থে এই ৫৮ বৎসর সময়কালের প্রথম ২০ বৎসরকে (১৯৫০—১৯৭০) সেকাল, মধ্যভাগের ২৮ বৎসরকে (১৯৭০—১৯৯৮) মধ্যকাল এবং শেষ ১০টি বৎসরকে (১৯৯৮—২০০৮) আমি একাল বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি। ইহার পরে আমি নিজেই অতীত কালের একজন হইয়া যাইব। সে কথা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল।

সেকাল ঃ ১৯৫০—'৭০ ঃ—আমি নবগ্রামে প্রথম পদার্পণ করি ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে শীতের এক অপরাহ্নে। সেদিনের সেই সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে এই অঞ্চলের যে রহস্যময় অপরূপ রূপ ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

লাভ করিয়াছিলাম তাহার বিশদ বর্ণনা স্থানীয় মহাদেশ পত্রিকার প্রথম মুদ্রিত সংখ্যায় (আষাঢ়—১৩৬১) 'আমার দেখা নবগ্রাম' শীর্ষক একটি রচনায় লিপিবদ্ধ আছে। সেই বিবরণের কিয়দংশে সেকালের এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং গ্রাম্য জনপদ সম্বন্ধে আমার তরুণ দৃষ্টিতে যে মোহময় চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেইরূপ বর্ণনা দেওয়া আজ আমার অতি বার্ধক্যে অসম্ভব। সুতরাং বর্তমান প্রজন্মের জনমানসে সম্যক ধারণা জন্মাইবার জন্য নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

'ইংরাজী ১৯৫০ সাল। জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনের একটি লোকাল ট্রেনে চলিতেছিলাম। গাড়িতে চাপিয়াছিলাম হাওড়া স্টেশনে, গন্তব্যস্থল ছিল চুঁচুড়া। কলিকাতা শহরে একটা আধা সরকারী অফিসে কেরানীগিরি করি। কি কারণে, ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না, তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি হইয়া গিয়াছিল। বাসায় ফিরিতেছিলাম। গাড়ি কোন্নগর স্টেশনে থামিতেই হঠাৎ নামিয়া পড়িলাম। সেদিনকার সেই নামা যে আমার প্রতিদিনের ওঠা-নামায় দাঁড়াইবে তাহা তখন বুঝি নাই। সেই কথাই বলিতেছি।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া গেলে আমি রেললাইন ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। শীতের অপরাহ্ণ। বেলা তখনও খানিকটা আছে। একটু শীত অনুভূত হইতেছিল। বরাবর উত্তর দিকে হাঁটিতেছিলাম। লাইনের পূর্ব দিকে কিছু বসতি নজরে পড়িল, কিন্তু পশ্চিম দিকটায় শুধু ঘন বাঁশবন—লোকালয়ের চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয় না। প্রায় ১ মাইল পথ পার হইলে পশ্চিমদিকে ঘন বাঁশবনের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা সদ্য নির্মিত কোঠাবাড়ি দেখিলাম, আমার লক্ষ্য ছিল ঐ গৃহে উপনীত হওয়া। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছানো সহজসাধ্য হইল না। উঁচু রেল লাইনের পার হইতে নীচে নামিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু লাইনের পার্শ্বস্থিত খাল অতিক্রম করিতে পারিলাম না। খালে জল খুব বেশী ছিল না—প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, তবুও এত কাদা যে জুতা হাতে লইয়াও পার হওয়া দুঃসাধ্য। কাদায় পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিলাম। কেমন একটা জিদ মাথায় চাপিয়া গেল, যেমন করিয়াই হউক খালটি পার হইতে হইবে। এদিকে বেলা প্রায় যায় যায়। অতি ধীরে শীতের আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার দিনের শেষ আলোটুকুও গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন অন্ধকারে চারিদিক বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যদিও গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারি, কিন্তু এই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে, তদুপরি দারুণ শীতে ফিরিব কি করিয়া এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু তবুও হতাশ হইলাম না। নিতান্ত দুঃসাহস করিয়া আবার রেললাইন ধরিয়া উত্তর দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হইলাম। দিনের আলোয় শেষ রেখাটি তখনও একেবারে দিগন্তের বুকে মিলাইয়া যায় নাই, সেই স্তিমিতালোকেই পথ চিনিয়া চলিতে লাগিলাম। সম্মুখে এক বৃহৎ বাগান নজরে পড়িল। দেখিলাম একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বাগানের ভিতরে গিয়া মিশিয়াছে। আর অন্য কোন পথ দৃষ্ট না হওয়ায় ঐ পথ ধরিয়াই বাগানের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

বাগানটা প্রকাণ্ড। অসংখ্য আম ও লিচু গাছ গা জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভিতরটা এত অন্ধকার যে দুই তিন হাত দূরের বস্তুও স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। মনে হইল বাগানের ভিতরে ঢুকিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু ফিরিয়া যাইতে সাহস হইল না, কাজেই পুনরায় চলিতে লাগিলাম। কোন প্রকারে বাগানটা পার হইলাম, কিন্তু এবারে বিপদ হইল আরো বেশী, যে পথ ধরিয়া এতক্ষণ চলিতেছিলাম তাহা হঠাৎ একটা ধানক্ষেতের সম্মুখে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম সামনের কিয়দংশ জমি লইয়া ধানের ক্ষেত এবং তাহার পরেই আবার ঘন বাঁশবন আরম্ভ হইয়াছে। এই বিস্তৃত বনের শেষ কোথায় কে জানে! প্রথমে যে উৎসাহ লইয়া আসিতেছিলাম, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাহা ক্রমশই হ্রাস পাইতে লাগিল। যে গৃহটিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম তাহাও আর নজরে পড়িতেছে না। তবে কি পথ ভুল করিলাম? শঙ্কিত হইয়া যে পথ ধরিয়া আসিয়াছি সেই পথ ধরিয়া ফিরিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছিলাম; এমন সময় কিছুদূরে একটা ক্ষীণ আলো নজরে পড়িল। মনে হইল আলোটা যেন আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। সাহসে ভর করিয়া আলোটি লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম, নিকটে আসিতেই আলোহস্তে ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নবগ্রামে যাবার পথ কোন দিকে বলতে পারেন?" উত্তর হইল, "বাঙ্গালদের বাড়ি? ঐ তো হোথা। সোজা ধানক্ষেত পেরিয়ে ঐ যে বাঁশবন—ওর ওপারেই। তা আপনি এ পথে এলেন কেন?" বলিলাম, "পথঘাট তো চিনতাম না, তাই.......।" লোকটি কহিল, "এই আঁধারে, অজানায় একা কি আপনি যেতে পারবেন? আপনি একটু দাঁড়ান আমি গরুটাকে নিয়ে আসি।" গরু লইয়া আসিয়া লোকটি কহিল,—"কাদের বাড়ি যাবেন?" কহিলাম, "আমি তো কাউকে চিনি না—যে কোন একটা বাড়ি পেলেই হল।" আমার কথা শুনিয়া লোকটি কি জানি ভাবিল—বোধহয় অবাক হইল, তারপর বলিল—"চলুন।"

ক্রমে ধানক্ষেত অতিক্রম করিয়া বাঁশবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাঁশের

সংখ্যা এত অধিক যে পথ করিয়া যাওয়াই কষ্টসাধ্য। যাহা হউক, কোন প্রকারে বাঁশবনও অতিক্রম করিলাম, দেখিলাম স্থানটি একেবারে ফাঁকা। আবছা আলোকে সম্মুখে কয়েকটি গৃহ নজরে পড়িল। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটি প্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া ছোট্ট পায়ে হাঁটা পথটা শেষ হইয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বেশ কিছু ব্যবধান রাখিয়া কয়েকটি গৃহ বিরাজমান। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অর্দ্ধনির্মিত অবস্থায় রহিয়াছে। লোকটি কহিল, "এই পথ ধরে সোজা চলে যান—শেষ মাথায় সেক্রেটারীর বাড়ি।" লোকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম।

এইবার পথ চিনিতে কোন কষ্ট হইল না। রাস্তার শেষ প্রান্তে অবস্থিত বাড়িটির সম্মুখে আসিয়া অধ্যয়নরত একটি ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কি সেক্রেটারীর বাড়ি?" উত্তর পাইলাম, "হ্যাঁ, আপনি কাকে চান?" বলিলাম, "তিনি কি এখন বাড়িতে আছেন?" মেয়েটি উত্তর দিল, "বাবাতো বাড়িতে নেই ; আপনি গিরীনবাবুর বাড়িতে যান। ঐ যে বাড়ি'—বলিয়া একটি দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। কিন্তু আমার আর কষ্ট করিয়া ঐ গৃহে যাইতে হইল না। নিতান্ত কৌতুহলবশেই আমি এস্থান দেখিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু ইহা যে এতদূর গড়াইবে তাহা ভাবি নাই।.......

যাহা হউক, ভাগ্যদেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মেয়েটির নির্দেশে আমি গিরিনবাবুর গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেই এক যুবক ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে খুঁজছেন?" কহিলাম, "সেক্রেটারী বা চেয়ারম্যান যে কোন একজনকে পেলেই চলবে।" তখনও ভদ্রলোকটির মুখের দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ তিনি কহিলেন, "আরে বসন্তবাবু না, কি ব্যাপার!—এখানে? দেখিলাম আমার সহপাঠী অমরবাবু—বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়িতাম। অকূলে কূল পাইলাম। কহিলাম, "আপনি এখানে?" "এখানেই তো আমার বাড়ি। তা আপনি কি মনে করে?" আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কহিলাম—"শুনলাম এখানে নাকি জমিটমি বিক্রী হচ্ছে—তাই দেখতে এসেছিলাম।" শুনিয়া অমরবাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "চলুন আমাদের বাড়ি।" মেয়েটিকে কহিলেন, "চাঁপা, ম্যাপটা দাও তো।" ছোট মেয়েটি একটি ম্যাপ আনিয়া দিলে অনতিদূরে অমরবাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে অমরবাবুর আরো একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অমরবাবু নবগ্রামের প্রথম অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম। নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনির তদানীন্তন একজন ডিরেক্টর এবং সহ-সম্পাদক।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত পিতৃপুরুষের ভিটার মায়া সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া আসিয়া সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নিজের আস্তানা তৈরী করিবার জন্য ঘুরিতেছি শুনিয়া অমরবাবু কহিলেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন-সভ্যতার আদর্শকে ভিত্তি করে নবগ্রামের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা এখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবো নয়া গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার, যা ভারতভূমি থেকে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। আমরা এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে এমন একটা গ্রাম সৃষ্টি করার সঙ্কল্প নিয়েছি যা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা ভারতের দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে।"

রোমাঞ্চিত হইলাম। চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল সেই বৈদিক ভারতবর্ষের রূপ। কল্পনার চোখে দেখিতে লাগিলাম সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের ছবি।

নবগ্রামের জন্য যে অঞ্চলটি ইহার স্রষ্টারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন তাহাকে মানুষের বাসোপযোগী করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু একদল ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় অন্য কোন উপায়ান্তরও ছিল না। তখন দেশ সবেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ক্ষমতাসীন ভারত সরকার তখন অর্থে ও সামর্থ্যে অত্যন্ত দুর্বল। ভারতবর্ষের ন্যায় একটি নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা ধর্ম ও নানা বর্ণে অধ্যুষিত একটি উপ-মহাদেশ নিরন্ন, দারিদ্র্য-পীড়িত, মেরুদণ্ডহীন, ছন্নছাড়া মানবকুলের পক্ষে অসংখ্য সমস্যার সমাধান করা, বিশেষ করিয়া খণ্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্রের কোনরূপ সুষ্ঠ ব্যবস্থা একেবারেই সম্ভব ছিল না। এই পরিস্থিতি হইতে উদ্ভূত অবস্থার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ—যাহা নবগ্রামের স্রষ্টাগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা নবগ্রামের হীরালাল পাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা (৩-১-৫৭) উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে একটি স্মরণীপত্রে 'আমাদের কথা'য় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম (ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি)।

"পেছনে চাওয়ার পালা শেষ হয়েছে—শুরু হয়েছে শুধু এগিয়ে চলা। দিনের পর দিন মাটির গড়া দেবী মূর্তি রং, সজ্জা ও আভরণে শোভিত হয়ে উঠছে—গড়ে উঠছে ছোট বড় নানাপ্রকার সেবা প্রতিষ্ঠান—পারস্পরিক সাহায্য আর সহানুভূতিকে ভিত্তি করে তৈরী হচ্ছে এক অপূর্ব সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ। শুধু পথ আর আশ্রয়স্থলই যথেষ্ট নয়—যথেষ্ট নয় স্বাস্থ্য, বল আর মুক্ত বায়ু। শুধু আঁধারভাঙা ক্ষীণ প্রদীপালোকই যথেষ্ট নয়—শেষ নয় প্রাথমিক থেকে শুধু

মাধ্যমিকে। চাই আনন্দোজ্জ্বল পরমায়ু—চাই জ্ঞানের রং মশালের আলোকের ছটায় ছটায় উদ্ভাসিত প্রাণ-মন-দেহ।

তাই এগিয়ে চলল সংগঠন আর সংস্কার—ধাপের পর ধাপে, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে আমরা আমাদের উত্তরসূরিদের জ্ঞানরাজ্যের দরজায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি মাত্র, কিন্তু ভিতরের মণিকোঠার কোষে কোষে সঞ্চিত সম্পদ আহরণের পথের নিশানা এখনও রুদ্ধ। তাই পথ চলতে গিয়ে এক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব গত কয়েক বছর ধরেই আমরা অনুভব করেছি।

এতদঞ্চলের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা সম্প্রতি অত্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করেছে। নিকটবর্তী অত্যল্প সংখ্যক কলেজগুলির পক্ষে প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলানের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি রেললাইন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যাতায়াত খুবই কষ্টকর বোধ হয়। তাই প্রয়োজন হয়েছে এই অঞ্চলে এক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার, যার কল্যাণময় পীযূষ ধারায় অবগাহন করে শুচি হবে নতুন গড়ে ওঠা গ্রামের ভাবী সন্তানের দল—যার মুক্ত ধারা পূত মন্দাকিনী স্রোতে ধুইয়ে দেবে আশেপাশের অজ্ঞান কলুষ।

কিন্তু কোথায় অর্থ, কোথায় সমার্থ্য? নবগ্রামবাসী নিজেদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়েছে নিজেদের আশ্রয় গড়তে, তাই উচ্চতর শিক্ষায়তন গড়ে তোলার আশা তাদের কাছে আকাশ-কুসুম রচনার নামান্তর।

কিন্তু হার মানিনি আমরা। যে শিক্ষার অভাবে জীবন কেবল মাত্র প্রকৃতির এক ক্রীড়নক, দিনযাপন শুধুমাত্র এক সাধারণ নিয়মের আবর্ত্তন—যার অভাবে গণমানস আঁধারে ঢাকা কূপমণ্ডুক— সেই আলোকবর্ত্তিকা আমাদের জ্বালতেই হবে।

নিরাশা আর চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শুধুমাত্র আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলেন একদল দুঃসাহসী কলেজ স্থাপনের এক পরিকল্পনা নিয়ে। নূতন গড়ে ওঠা গ্রামের প্রাণে সঞ্চারিত হল নূতন কর্মস্রোত। এঁরা অর্জন করলেন অনুপ্রেরণা, উৎসাহ আর নতুন কর্মশক্তি। সৃষ্টি হল নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের, যা এ অঞ্চলের গর্ব।

সেকাল বলিয়া উল্লিখিত (১৯৫০—৭০) ২০ বছরের মধ্যে আমি প্রথম দশ (১০) বছর (১৯৫০—৬০) প্রত্যক্ষভাবে নবগ্রামের সমস্ত সৃজনধর্মী কাজের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আর পরের দশটি বছর (১৯৬০—

৭০) আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত আর্থিক পরিকল্পনা পরিচালনা ও তদ্জনিত পরিকাঠামো গঠনের কাজে নিযুক্ত হওয়ায় আমাকে প্রতিদিন নবগ্রাম হইতে কলকাতায় যাতায়াত করিতে হইত। কাজটি অত্যন্ত কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় আমি অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে বাধ্য হই। তথাপি নবগ্রামের বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের সহিত পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিতে চেষ্টা করি।

অবসরে, একদা আমার যৌবনের উপবনে, বার্ধক্যের বারাণসীতে নবগ্রামে আমি স্থায়ী অধিবাসী। জীবনের বাকি অংশটুকুও এইখানেই অতিবাহিত করিব বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। আজ নবগ্রামবাসের প্রতিটি মুহূর্ত— দিনযাপনের সুখ ও গ্লানি অনুভব করিতে করিতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া চলিতেছি তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল হইবে যে আমার এই 'দ্বিতীয় শৈশবে' আগেকার সেই দৃষ্টি অথবা দূরদৃষ্টি কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্মরণশক্তি ও 'চলন-বলনে'র ক্ষমতাও ক্রমেই ক্ষীণ ও মন্থরপ্রায়—তদুপরি আমি কোন রাজনৈতিক কিংবা সমাজসেবামূলক ব্যক্তিত্বও নহি—সুধী ও বিদগ্ধ পাঠক আমার এই অংশের বক্তব্য ও অভিমতকে আমার একান্ত নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিলে আমি বাধিত হইব।

এই নবগ্রামের মাটিতে প্রথম পদার্পণের সন্ধ্যায় আমার সেই অভূতপূর্ব ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং তদপ্রসূত এক লীলাময় স্বপ্নের আবেশ, যাহা আজও আমার মনে মাঝে মধ্যেই এক ঝলক আলোর মত উদয় হয়, তাহার পরিবর্তে আজিকার আমার এই ক্ষীণ নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে নবগ্রামের চতুষ্পার্শের প্রাকৃতিক পরিবেশ, এখানকার পথঘাট, মানুষজন এবং আমাদের বর্তমান সমাজ-সংসারের আকৃতি ও প্রকৃতি, যাহা একদা 'নবগ্রাম এক পরিবার' বলিয়া আমাদের গর্বের বস্তু ছিল ও এই অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষয়িষ্ণু জন-সমাজের ঈর্ষার বিষয় ছিল, সেগুলির পরিণতি লক্ষ্য করিয়া বড় বেদনা অনুভব করি। মনে হয় যেন নতুন গড়িয়া ওঠা একটি জনপদের অত্যুজ্জ্বল প্রাণস্পন্দন ধীরে ধীরে কোন এক অশুভ শক্তির কবলিত হইয়া নিরাশার গভীর আঁধারে ডুবিয়া যাইতেছে—এবং অচিরেই সেই রাক্ষসী মহা-অন্ধকার আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার সর্বশেষ আলোটুকুও গ্রাস করিয়া লইবে।

আজিকার নবগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করিবার দায় ও তাহার সংশোধনের দায়িত্ব আমার নহে এবং আমার পক্ষে তাহাতে সচেষ্ট হওয়া বাতুলতা মাত্র।

একেবারে তলাইয়া যাইবার পূর্বে বর্ষীয়ান ও নবগ্রামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমার মতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা সহায়ে নবগ্রামের সংকট মোচনে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে বলি, কিছুদিন পূর্বে মহাদেশ পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে স্থানীয় 'মহাদেশ' পত্রিকায় কয়েকটি কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কাজগুলি সরকারী অনুমোদন ও ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া (ইচ্ছা সত্ত্বেও) তাহাদের পক্ষে সেগুলি এককভাবে কোন প্রকারেই সম্পন্ন করা সম্ভব নহে বলিয়া কার্যকর করার চেষ্টা হয় নাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নবগ্রামের স্রষ্টা এবং সেই কাজগুলি নিজেদের করণীয় ও আয়ত্বাধীন মনে করিয়া যদি নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপঃ কলোনি এণ্ড হাউসিং সোসাইটি—এই ধরণের একটি সর্বব্যাপক বর্ষব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে তবে আবার নবগ্রামের নূতন প্রাণ সঞ্চার হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা। শুধুমাত্র নেতৃত্বের অভাবেই একটি বিরাট সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া একটি শুভ-স্বপ্নের মৃত্যু ঘটাইতে উদ্যত, ইহা হইতে বেশী দুঃখের আর কি হইতে পারে?

উল্লিখিত কর্মসূচীটি নবগ্রাম সোসাইটির বিবেচনার জন্য নিম্নে পুনরাবৃত্তি করিলাম।

নবগ্রামের ও এতদ্ অঞ্চলের উন্নতির প্রয়াসে বিশ দফা কর্মসূচী :

১. প্রধানমন্ত্রীর "গ্রামীণ সড়ক যোজনা" পরিকল্পনা ও নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় নবগ্রামের পথঘাটের উন্নতি সাধন।

২. সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জল নিষ্কাশনের ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কারের ব্যবস্থা।

৩. চতুষ্পার্শ্বের অনুন্নত ও উন্নতিশীল গ্রামগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি পৌর এলাকা গঠন।

৪. কোন্নগর ও রিষড়া রেলস্টেশনের মধ্যস্থলে 'নবগ্রাম হল্ট স্টেশন' তৈরীর প্রচেষ্টা—যাহাতে ঐ অঞ্চলের অধিবাসী বিশেষ করিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীদিগের যাতায়াতের সুবিধা হয়।

৫. যত শীঘ্র সম্ভব নবগ্রাম ও চারিপার্শ্বের অরক্ষিত মুক্তাঞ্চলের পরিবেশ ও শান্তিরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ পুলিশথানা গঠন এবং বর্তমান কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করা।

৬. বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য একটি কনজিউমার্স ফোরাম তৈয়ারী করা।

৭. প্রস্তাবিত 'নবগ্রাম হল্ট' রেল স্টেশন হইতে দিল্লী রোড পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করা।

৮. নবগ্রামের স্রষ্টা 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' ও 'নবগ্রাম উচ্চ শিক্ষা পরিষদ' পুনর্গঠিত করিয়া আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধানে ও এই অঞ্চলের সর্বপ্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে তৎপর হওয়া এবং তৎসহ স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন।

৯. বৃহৎ জলাশয়গুলির সংস্কারসাধনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে রিজার্ভ ট্যাঙ্কে পরিণত করা এবং সেগুলিতে মৎস্যবিভাগের সাহায্যে মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করা।

১০. একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার, আউট-ডোর, ইনডোর স্টেডিয়াম ও আধুনিক সুইমিং পুল নির্মাণ করা।

১১. নবগ্রাম অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নবগ্রামের সামগ্রিক উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণে সরকারী অর্থ সাহায্যের চেষ্টা করা।

১২. নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপাঃ কলোনি এণ্ড হাউসিং সোসাইটির নেতৃত্বে স্থানীয় স্বেচ্ছা-সেবী সংস্থাগুলি লইয়া একটি সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা এবং তাহার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে নবগ্রাম ডেভলপমেন্ট ফাণ্ড নামে একটি তহবিল গঠন করা যে অর্থ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লোকাল ম্যাচিং গ্রান্ট সরবরাহের সহায়ক হইবে।

১৩. কো-অপরেটিভ হাউসিং-এর আইন অনুযায়ী সরকারী সাহায্যে এই অঞ্চলটিকে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করা এবং যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরী নিয়ন্ত্রণ করা।

১৪. নিয়মিতভাবে নবগ্রামের বর্তমান কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সংক্রান্ত বিষয় 'নবগ্রাম বার্ত্তা' নামে একটি 'মাসিক' পত্রিকায় প্রকাশ করা।

১৫. রেড-ক্রশ ও গোলোক মুন্সী হসপিটাল অ্যাণ্ড সরলা মাতৃসদনের উন্নতি সাধন করিয়া এই অঞ্চলে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

১৬. বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি চিলড্রেন্স পার্ক ও বৃদ্ধদের ভ্রমণোপযোগী সিনিয়র সিটিজেন্স পার্ক তৈয়ারী করা।

১৭. রোজগারহীন অশিক্ষিত দরিদ্র মহিলাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা, কর্ম-সংস্থান ও উপার্জনের ব্যবস্থা করা এবং কয়েকটি মহিলা পরিচালিত 'সমবায়িকা' স্থাপন করা।

১৮. একটি মহিলা কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করা।

১৯. যাহাতে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও উদার সমবায়ী চেতনা গড়িয়া ওঠে সেই মানসে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির জন্য একটি কর্ম সমিতি গঠন করার চেষ্টা করা এবং

২০. নবগ্রাম পিপলস্ কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্কের পরিষেবার উন্নতি করা ও গ্রামের সকল শ্রেণীর সাক্ষর-নিরক্ষর, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য ব্যাঙ্কে বিশেষ কাউন্টারের ব্যবস্থা করা যাহাতে স্বচ্ছন্দে তাহারা নিজেরাই অর্থের লেনদেন করিতে পারে।

লেখাটির প্রারম্ভেই বিমূর্ত্ত এক কল্পলোকের স্বপ্ন পরিস্ফুট আছে। স্বপ্নটি আসলে ভবিষ্যৎ নবগ্রামের একটি আদর্শ চিত্র—যাহা সেকালে নবগ্রামের স্রষ্টাদের মনে বাসা বাঁধিয়াছিল—কিন্তু তাহাকে বাস্তবায়িত করিতে জন্ম মুহূর্ত হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছিল সেগুলি কালের যাত্রায় যে কি ভীষণ আকার লইতে পারে তাহা সেদিনের সেই সাহসী ও ক্লান্তিহীন অভিযাত্রীগণই কেবল অনুভব করিয়াছিলেন—সেগুলির কিছু ভাল কিছু মন্দ, কিছু সংঘাত কিছু মিলনব্যঞ্জক—কিছু শুভ কিছু অশুভ—কিন্তু সে এক অন্য ইতিহাস। শুধু এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সেকালে নবগ্রাম সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ইহার স্রষ্টাগণের অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইয়াছে, অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে—এবং তাহারই পরিপক্ক ফলটি আমাদের উত্তরসূরিগণ ভোগ করিতেছেন। একথা মনে রাখিতেই হইবে যে আজিকার নবগ্রাম বসবাসের জন্য যতই দুর্বিষহ স্থান বলিয়া মনে হউক না কেন—তাঁহারা আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

এইসব স্রষ্টার পুরোভাগে যাঁহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে নবগ্রাম মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ কলোনি লিঃ এর তদানীন্তন সভাপতি গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক পরেশচন্দ্র চন্দ মহাশয়দের মধ্যে প্রথমোক্ত মানুষটিকে আমি 'নবগ্রামের পিতা' এবং শেষোক্ত মানুষটিকে 'নবগ্রামের প্রাণ' বলিয়া অভিহিত করিতে চাই। আজ এই সুযোগে সমগ্র নবগ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে এই দুজনকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তৎসহ বর্ত্তমান সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীকে অনুরোধ জানাব তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাহাদের যে রাস্তায় বাসগৃহ ছিল সেই রাস্তাগুলো উহাদের স্ব স্ব নামে চিহ্নিত করা হউক।

গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে পশ্চিমবাংলার কোন গ্রাম বা জনপদ আজ "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" কেন নয়—ইহার কারণ খুঁজিতে খুব বেশী গবেষণার বা অধিক দূরে বিচরণ করিবার প্রয়োজন নাই। আজ আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য বাঙালী জাতি যে নিজেদের ঐতিহ্য ভুলিয়া ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া—আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতালোভী ও কলহপ্রবণ, দলাদলিতে সিদ্ধহস্ত ও নির্জীব, কাপুরুষ, মৃতপ্রায় একটি জাতি—তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কোন সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এতগুলি গুণসমৃদ্ধ (?) হয় তবে তাহাদের গঠিত সমাজ-সংসার কি ধরণের হইবে সহজেই অনুমেয়!

এতক্ষণ যাহা লিখিলাম তাহা আপাতদৃষ্টিতে বিদগ্ধ পাঠকগণের অনেকের মনেই 'নেতিবাচক' প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে সন্দেহ নাই এবং তাহাই স্বাভাবিক—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে যে ইতিবাচক ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি আমার দীর্ঘ প্রবন্ধটির উপসংহার টানি।

উপসংহার ঃ

যে স্বপ্ন নবগ্রামে প্রথম পদার্পণের সন্ধ্যায় দেখিয়াছিলাম তাহা অদ্যাবধি সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। আজো আমি স্বপ্ন দেখার সাহস করি। আজো আমি নূতন কর্মোদ্যোগের সংবাদে যৌবনোচিত আনন্দের শিহরণ অনুভব করি। স্বপ্ন দেখি নবগ্রামের নিদ্রিত ও সুপ্ত প্রাণশক্তি, সমস্ত ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ণোদ্যমে জাগ্রত হইতেছে এবং আগামী দিনের যুব-মানসে ভর করিয়া নির্ভয়ে শুভ কর্মপথে অগ্রসর হইতেছে এবং অচিরেই সমস্ত অশুভ কলুষ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া দিক্‌বিদিক্ আলোয় আলোকময় হইয়া সেই বহু কাঙ্ক্ষিত হিরণ্যগর্ভ সৌরদ্যুতি উদ্ভাসিত হইতেছে—নবগ্রাম চলিতেছে—সমস্ত বাধাবিঘ্ন উড়াইয়া জয়ধ্বজা তুলিয়া সে চলিতেছে প্রভাত সূর্যের পানে—নূতন রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে।

সবশেষে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের দুইটি শ্রদ্ধেয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করিয়া আমার এই নিবন্ধটির শেষ করি।

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম

করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

—রবীন্দ্রনাথ

"আমি এমন একটি ধর্ম চাই যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার এবং আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সকল দুঃখ বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তবে মানুষের সেবা কর।"

—বিবেকানন্দ

পরিশেষে সমগ্র নবগ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণতি জানাইয়া আমার একান্ত অনুভবের স্পর্শকাতর বিষয়টি সমাপ্ত করিলাম।

নবগ্রাম ও আমি

ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী

১৯৫০ সালে আমি M.B.B.S. পাশ পরি। তার প্রায় এক বৎসর আগে থেকে আমার কাকা শ্রীযুক্ত স্নেহাংশুভূষণ বক্সী নবগ্রামে বসবাস শুরু করেছেন দেশ ভাগ হওয়ার পর। আমি ডাক্তারী পাশ করার পর Hostel থেকে নবগ্রামে এসে তাঁর সঙ্গে থাকতে শুরু করি। ছাত্রজীবনে আমি কলকাতায় তাঁর কাছে থেকেই পড়াশুনা করেছি।

কয়েক বৎসর আগে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনী স্থাপিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রচেষ্টায়। ১৯৫০ সালে প্রায় ৩/৪ শত পরিবার নবগ্রামে বসবাস শুরু করেছেন। আমরা তখন একটা ভাড়াবাড়ীতে থাকি। সেই সময় বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে একাত্মবোধ ছিল— প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন।

আমার সঙ্গে যাদের হৃদ্যতা হয়েছিল তার মধ্যে ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (বিশুবাবু), প্রয়াত শচীন সরকার, সুকুমার চক্রবর্ত্তী, বিনয় বোস প্রভৃতি কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে মনে আছে—চিরকাল মনে থাকবে। তা'ছাড়া গুরুজনরা অনেকেই এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। ছোট-বড়ো সমবয়সী সকলের কাছ থেকে এত স্নেহ প্রীতি ভালবাসা পেয়েছি যে সেটা আমার কাছে সুখের স্মৃতি হয়ে থাকবে সারাজীবন। নবগ্রামের সঙ্গে একটা 'গভীর টান' সর্বদাই অনুভব করি।

নবগ্রামে তখন কোনরকম স্বাস্থ্য পরিষেবা ছিল না অথচ সর্বরকম সংক্রামক রোগের রাজত্ব চলেছে। আমি স্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাছে আত্মনিয়োগ করলাম। এই কাজে সর্বস্তরের সমস্ত মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। সোসাইটির তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু হল প্রধান সঙ্গী ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় বিশুবাবু।

স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হল যেমন—

১। সমস্ত মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনা;

২। নিরাপদ পানীয় জল—তার জন্য Tubewell,

৩। সেনিটারী পায়খানা;

৪। পরিবেশন দূষণ প্রতিরোধ করা;

৫। রোগ প্রতিষেধক টিকাকরণ;

৬। নিরাপদ মাতৃত্ব;

৭। সাধারণ অসুখের চিকিৎসা করা।

৮। প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা আমরা সকলে মিলে করা শুরু করলাম এবং আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। এবং তাতে সুফল পাওয়া যেতে লাগল।

আমি তখন R.G. Kar Medical College Hospital-এ কাজ করছি। কাজেই আমার মাধ্যমে নবগ্রাম এবং R.G. Kar Medical College Hospital-এর মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী হয়েছিল। তার ফলে কঠিন রোগীদের চিকিৎসা করার সুবিধা হ'ল।

তাছাড়া সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন রাত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে পাহারা দিতে হত Night Guard হিসেবে। এই কাজটা আমি খুবই উপভোগ করেছি—সারারাত লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ানো। গল্প করা, চা-খাওয়া।

আমার ডাক্তার হিসেবে জীবন এবং সমাজসেবা দু'টোরই শুরু হ'ল নবগ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে। যদিও আমার সমাজসেবায় হাতেখড়ি হয়েছিল ১০ বৎসর বয়সে ডিব্রুগড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে: হয়ে প্রতি রবিবার 'মুষ্টিভিক্ষা' এবং পরে ছাত্রজীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং পরে কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময় বিভিন্ন Relief Work-এর মাধ্যমে। তবে সংগঠিতভাবে সমাজসেবা শুরু নবগ্রামেই। তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে ডাক্তারী জীবনের। গ্রামীণ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ এখনও চলেছে "বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সংঘের" মাধ্যমে। 'বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সংঘ' স্থাপিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে বেলুড়মঠে। পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলায় এখন শতাধিক গ্রামে কাজ চলেছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী পর্যায়ে। আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি যে গ্রামকে (যেখানে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ বাস করেন) বাদ দিয়ে দেশ কখনও এগিয়ে যেতে পারে না এবং আমাদের সকলের গ্রামের মানুষের প্রতি একটা কর্তব্য আছে—দায়বদ্ধতা আছে। এই কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন আমাদের করতেই হবে। আমার এই উপলব্ধির শুরু নবগ্রামেই হয়েছিল।

১৯৫৩ সালের পর আমি কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও নবগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ সর্বদাই ছিল এবং আছে। আমাদের পরিবারের অনেকেই এখনও নবগ্রামে বসবাস করেন।

সবশেষে Golok Munshi Hospital Planning and Execution-এর ব্যাপারে শচীনবাবুকে সাহায্য করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এত সুন্দর একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুব কমই আছে। নবগ্রামবাসীদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই হাসপাতালটিকে নিজের মনে করে তাঁরা যেন রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং ক্রমশ উন্নত করে তোলেন। সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটা কিছু কঠিন কাজ নয় বলেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

শেষ করার আগে আবার বলি, ডাক্তারী এবং সমাজসেবা, বিশেষ করে গ্রামীণ স্বাস্থ্যপরিষেবা—দুটোর জন্যই আমি নবগ্রাম এবং নবগ্রামবাসীদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। নবগ্রামের উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হোক্ এই প্রার্থনা করি।

আমার স্মৃতিতে
ডাঃ কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নবগ্রাম মালটিপারপাস্ কো-অপারেটিভ কলোনি অ্যাণ্ড হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড বেশ কিছুদিন যাবৎ তার পূর্ব ইতিহাস যথাযথ ভাবে এবং লিখিত ভাবে সংকলন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিল। এই প্রেক্ষাপটে আমার পরম স্নেহাস্পদ নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় রেডক্রশ ইউনিট সম্বন্ধে আমাকে কিছু লেখার জন্য অনেকদিন যাবৎ বলছেন, নানা কারণে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। যাইহোক রেডক্রশ সম্বন্ধে লিখতে গেলে প্রথমে মনে রাখতে হবে যারা ১৯৪৭ সনের পর থেকে এখানে বসতি স্থাপনের কথা ভেবেছেন তারা একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকে সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করার কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছেন। কাজেই নবগ্রামের স্বাস্থ্যপরিষেবা, ওই সূচনা পর্বের থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

বসতি স্থাপনের পর আমি যখন ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে এখানে প্রথম এলাম তখন শুনলাম প্রফুল্ল দাসের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। সেজন্যই তখন এখানে নৈশ প্রহরার ব্যবস্থা নিয়মিত চলছে। ১৯৪৯-৫০ সন ডিসেম্বর নাগাদ ন-পাড়া গ্রামে (কানাইপুর) ভয়াবহ ডাকাতি হয়। কয়েকজন লোক ওখান থেকে বর্তমান আদিবর্ত্ম রোড দিয়ে কোন্নগরের দিকে যাচ্ছিল। শ্রীদুর্গা মিল থেকে থানায় ফোন করার জন্য। ওদের মুখে শুনে আমরা এখান থেকে পরেশবাবু সহ ৮/১০ জন লোক মাঠের ভিতর দিয়ে ন-পাড়ায় চলে যাই। বাড়ির প্রায় সকলেই কম/বেশি আহত এবং রক্তাক্ত। পুলিশ জীপ নিয়ে এসেছিল এবং তাদের নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। স্থানীয় ভাবে কোনরকম চিকিৎসাগত সাহায্য দেওয়া যায় নি।

পরদিন শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র কলকাতা থেকে ১ প্যাকেট তুলা কয়েকটা ব্যান্ডেজ এক বোতল টিংচার আয়োডিন, Tr. Benzoine বোতল নিয়ে এলেন এবং আমার কাছে রাখলেন। হরিপদ সিংহরায়ের বাড়ী থেকে একটি ছোট আলমারী ঔষধপত্র রাখার জন্য দিলেন। এ নিয়ে আমার বাড়ি থেকে কিছু কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োজনে আরম্ভ করা হয়। এ সময়ে যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড, ব্রঙ্কাইটিস বা সাধারণ অসুখ-বিসুখ হত। কিন্তু পয়সা খরচ করেও উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। বাড়ী থেকে রুগীকে

স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হলে কোনরকম যানবাহন এমন কি একটা ষ্ট্রেচারেরও ব্যবস্থা ছিল না। সবই বিকল্প ব্যবস্থায় করতে হত। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু ছিল না। এই অবস্থায় একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল স্থানীয়ভাবে করার ভাবনা শুরু হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই সময় ডাক্তার কান্তিভূষণ বক্সী তার কাকা শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু ভূষণ বক্সী এখানে বসবাসের জন্য আসেন। ডাঃ কান্তিভূষণ ওই সময়ে মোটামুটি সমস্ত রুগী প্রয়োজন মতন দেখতেন এবং ব্যবস্থা নিতেন। এইসঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধেও কাজকর্ম আরম্ভ হয়।

নবগ্রামের রেডক্রশ মেটারনিটি অর্থাৎ হোম পরিচালনায় যে সমস্ত চিকিৎসকদের কাছ থেকে বিনামূল্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চিকিৎসাগত সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে প্রয়াত হয়েছেন। তাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

(১) ডাঃ হিমাংশু চক্রবর্তী (M.D. Calcutta)

(২) ডাঃ কানাইলাল রায় (M.B.B.S., D.G.O.)

(৩) ডাঃ সুচিত্ররঞ্জন রায় (M.B.B.S.)

(৪) ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার (M.B.B.S.) (M.R.C.O.J.)

মাননীয় কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না এখানে নবগ্রামে রেডক্রশ দেখতে আসার সময় ৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে যান।

৪৭/৪৮ সন, নবগ্রাম কলোনী, গ্রাম বড় বহেড়া, পোষ্ট অফিস-কোন্নগরে আমার যাতায়াত আরম্ভ হয়। ফাল্গুন, চৈত্র মাস নাগাদ বাড়ী করে বসবাস শুরু করি। আমার পিতা অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে উনি দেশের বাড়ীতে চলে যান।

তখন পূর্ববঙ্গের অনেক মানুষ এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আমি তখন এখান থেকে কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া আমার পড়াশুনা চালাই। ঐ সময় এই স্থানের নাম ছিল 'নবগ্রাম কলোনি' গ্রাম-বড় বহেড়া, পোষ্ট অফিস-কোন্নগর।

এই সময় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, প্রফুল্লরঞ্জন দাস, প্রবোধ গুহ, আশুতোষ মজুমদার, সত্য চৌধুরী, জ্ঞান চৌধুরী, ডাঃ জগদীশ চ্যাটার্জী, মৃগাঙ্ক গুহ, অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, সত্য ব্যানার্জী, বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্তর (এরা পরে এসেছেন) আরো অন্যান্য অনেকের সাথে এইস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তখন শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চন্দ কলিকাতা

থেকে যাতায়াত করেন, এদের সমবেত চেষ্টায় একটি কমিটি গঠিত হয় (তখন কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিষ্ট্রি হয় নি)। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পরিবারের এখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসা লোকেদের বাড়ী করার জমির ব্যবস্থা ও বাড়ীঘর তৈরীতে সহযোগিতা করা। রাস্তাঘাট, নর্দমা, পানীয় জল ইত্যাদির সাথে সাথে সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনে (১) শিক্ষা, (২) নৈশ প্রহরা, (৩) স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা, (৪) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, (৫) খেলাধুলা এবং সকলের সাথে যাতে একটা সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে; এই প্রচেষ্টা নিয়ে এগোনোর সংকল্প নিয়েই সূচনাপর্ব শুরু হয়।

পুরাতনী ঃ স্মৃতিচারণ

পুনশ্চ

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী

বিক্রমপুর-এ গান্ধীজি

১৯২১ সালে গান্ধীজির প্রেরণায় ভারতবর্ষে অসহযোগের যে বান ডাকিয়াছিল, তাহার ফলে পরিত্যক্ত গ্রামাঞ্চলগুলি মুক্তিকামী সাধকদের প্রত্যাবর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিল। দেশ গান্ধীজির নিকট যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করিল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে সেই সময় বহু উচ্চশিক্ষিত অসহযোগী দেশসেবকের সমাবেশ ঘটে। বাংলার সুসন্তান সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি আশ্রম স্থাপন করেন তাঁহার স্বগ্রামে মালেকান্দায়। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বানারীতে বিদ্যাশ্রম স্থাপন করেন। ফুরশাইলে কাজ আরম্ভ করেন স্বর্গীয় ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, লৌহজং-এ শ্রীভাগবত তালুকদার, পাইকপাড়ায় শ্রীভূপেন দাস, নবাবগঞ্জে আশ্রম স্থাপন করেন শ্রী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং এই লেখকও ঐ সময় বাহেরক গ্রামে সত্যাশ্রম স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত আর্‌ও বহু গ্রামে বহু কর্মী নানাভাবে কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ করেন।

১৯২৫ সালের মে মাসে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পর মহাত্মাজী প্রায় এক মাস কাল বাংলা সফর করেন। সেই সময় বিক্রমপুরের কর্মীদের আমন্ত্রণে প্রথমেই সেখানে আসেন। সেখানে লেখকের যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই।

বাহেরক গ্রামে

বিশালবক্ষা পদ্মা ও মেঘনা নদী বিক্রমপুরের তিন দিক বেষ্টন করিয়া আছে। এই জলপথে ভ্রমণের জন্য ভাগ্যকুলের বিখ্যাত কুণ্ডু মহাশয়দের নিকট হইতে "লক্ষ্মীনারায়ণ" নামক জলযানটি পাওয়া গিয়াছিল। মহাত্মাজী এই লঞ্চখানিতেই দুইদিন পরিভ্রমণ করেন। ২৫শে মে তারিখ তিনি প্রাতেই বাহেরক সত্যাশ্রম পরিদর্শন করেন এবং তারপর দিঘীরপাড়ে একটি জনসভা হয়। সেখানে তাকে অভ্যর্থনা ও সভার বন্দোবস্ত করিবার ভার প্রধানতঃ সত্যাশ্রমের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। জনসভার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় বেহেরপাড়া গ্রামে। রজতরেখা নদীর তীরে প্রায় ১০/১২ বিঘা জমি পরিস্কার করিয়া উহার এক প্রান্তে মহাত্মাজীর বসিবার জন্য একটি সুদৃশ্য মণ্ডপ প্রস্তুত করা হয়। নদীতীরে লঞ্চখানা ভিড়াইবার জন্য একটি নাতিদীর্ঘ "জেটি" এবং

জেটির মুখ হইতে দুই পার্শ্বে রেলিং দিয়া ঘেরা একটি রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া মণ্ডপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। রাস্তাটি এমন কৌশলে ঘুরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল যে প্রত্যেক দর্শকই মহাত্মাজীকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইবার সময় মাত্র ৫/৬ হাত দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য এই বিরাট জনতাকে মোটেই ছুটাছুটি করিতে হয় নাই। প্রত্যেকেই আপন আপন আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই মহাত্মাজীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন।

খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রী সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর মহাত্মাজীর সারা বাংলা ভ্রমণ পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহার উপদেশ অনুসারে সভাস্থলে আচরণের জন্য জনসাধারণকে কয়েকটি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আপন আপন স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকা, মহাত্মাজীর পদধূলি গ্রহণে বিরত থাকা এবং মহাত্মা গান্ধীর নামে কোনরূপ জয়ধ্বনি না করা—এই তিনটি বিষয়ই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। গান্ধীজি যেখানেই যাইতেন, তাঁহাকে জনতার চাপ এবং চরণস্পর্শ দ্বারা ভক্তি প্রদর্শনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই স্বেচ্ছাসেবকদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই প্রচার কার্য্যের ফলে জনসাধারণ আমাদের এই সব নির্দ্দেশ এমন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজী তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমেই এজন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সত্যাশ্রমে

প্রাতে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় "লক্ষ্মীনারায়ণ" জাহাজ মহাত্মাজীকে লইয়া রজতরেখা নদীতে প্রবেশ করে এবং অদূরেই সত্যাশ্রমের নিকটে নোঙ্গর করে। নৌকাযোগে তীরে অবতরণ করিয়া মাঠের সরু আইল দিয়া হাঁটিয়াই মহাত্মাজী আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তখন মাঠগুলি ২/৩ ইঞ্চি লম্বা পাটের চাড়ায় পরিপূর্ণ। মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মহাত্মাজী চারিদিকের ঐ সবুজ শোভা দেখিতে লাগিলেন এবং উবু হইয়া বসিয়া একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ বিস্তীর্ণ পাটচাষ তিনি ইহার পূর্ব্বে আর দেখেন নাই বলিলেন।

অত্যধিক জনসমাগমের ভয়ে সত্যাশ্রমের প্রোগ্রামটি খুবই গোপন রাখা হয় কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সেখানেও কিছু লোক সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। আশ্রম প্রাঙ্গণে আশ্রমের বালকগণ চরকা কাটিতেছিল। এখানকার অভ্যর্থনায় বিশেষ কোনও জাঁকজমক ছিল না। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই মহাত্মাজী ঘুরিয়া

ঘুরিয়া প্রত্যেকটি চরকা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। একটি ছোট্ট ছেলে একটা প্রকাণ্ড চরকা লইয়া প্রাণপণে সুতা কটিতেছিল। দেখিয়া তিনি খুব কৌতুক করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"He is coaxing the thread to come out" (ঐ ছেলেটি যেন তোয়াজ করিয়া সূতা টানিয়া বাহির করিতেছে) এবং ছেলেটির মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইলেন।

চরকাগুলি প্রায় সবই ছিল খারাপ, কোনও রকমের চরকা কাটার একটা অভিনয় করা হইয়াছিল মাত্র। আসলে সেদিকে আমাদের মনও ছিল না এবং তখন পর্য্যন্ত আমরা নিজেরাও সূতাকাটা পুরাপুরিভাবে শিক্ষা করি নাই। সুতরাং গান্ধীজির শ্যেনদৃষ্টির কাছে আমাদের সব ফাঁকি ধরা পড়িতে লাগিল। কথায় বলে "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।" ঠিক যে কয়টা চরকা একটু ভাঙ্গা গোছের ছিল, তিনি যেন সেই কয়টাকেই বাছিয়া দেখিতে লাগিলেন। এটার "Thick spindle" (মোটা টেকো), ওটার Ricketty wheels (নড়বড়ে চাকা) ইত্যাদি দেখাইতে দেখাইতে আমার অবস্থা বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। ইহাতেও নিস্তার নাই। মরার উপর খাড়ার ঘা চলিল। এবার সোজা আমাকেই প্রশ্ন।

Do you know spinning (তুমি সূতাকাটা জানো?)

হ্যাঁ।

Do you know carding (তুমি তুলা ধোনা জানো?)

না।

What is your speed per hour (ঘন্টায় কত গজ কাটিতে পার)?

পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।

লজ্জায় তখন আমি আরষ্টপ্রায়। গান্ধীজিও আমার অবস্থাটি বেশ বুঝিতেছেন কিন্তু তবুও আমার নিস্তার নাই। একটু হাসিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সস্নেহে পিঠে একবার হাত বুলাইয়াই বলিলেন—"যদি আমি এখানে না আসিতাম তবে হয়তো তুমি বলিতে যে গ্রামবাসীদের অনিচ্ছা ও আলস্যবশতই এখানে প্রতি ঘরে চরকা চলিতেছে না। কিন্তু এখন আমি বেশ বুঝিতেছি The fault is yours–দোষটা তোমার নিজেরই।" এখানেই শেষ নয়! তারপর চরকা সম্বন্ধে আমার এই ঔদাসীন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া নানাপ্রকার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলাম। সত্যাশ্রমের অর্থ সংগ্রহ কার্য্যে আমার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় শুনিয়া তিনি তাঁহার অনুপম চিত্তাকর্ষক হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ওসব কাজ তুমি বন্ধ কর। –You must take a year's penance for

this and learn Charka thoroughly (তুমি এক বৎসর অনন্যচিত্ত হইয়া চরকার সর্ব্বাঙ্গীন কাজ শিক্ষা কর)। আমি এবার নিরুপায় হইয়া বলিয়া ফেলিলাম—"আচ্ছা, মহাত্মাজী, আমাকে তিন মাস সময় দিন, আমি আপনাকে খুশী করিব।"* এবারে মহাত্মাজী শুধু একবার "হ্যাঁ" বলিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন।

একাধারে এইরূপ তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও স্নেহমাখা হাসির একত্র সমাবেশ দুর্লভ। ইহাতে দুইটি শিক্ষা লাভ হইল। প্রথমতঃ গান্ধীজিকে ফাঁকি দিতে যাওয়া বড় কঠিন কাজ। প্রতিটি ছোট জিনিসও তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ কত নীতিকথা আমরা শিখি শুধু মুখস্থ করার জন্য, জীবনে আচরণ করি না। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—এ তো বহুদিনের মুখস্থ করা কথা। কিন্তু অবলীলাক্রমে আমরা ঐ নীতিটি কার্য্যক্ষেত্রে অবহেলা করি। গান্ধীজির জীবনে কথা ও আচরণের ঐক্য অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে একটি ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পরবর্ত্তী জীবনে গান্ধীজি একবার চা-পান সম্বন্ধে বিরোধী মত ব্যক্ত করিলে আমি তাঁহাকে একখানা পত্র দেই যে গরীব মানুষ চা পান করিয়া অল্প পয়সায় শারীরিক অবসাদ দূর করিতে পারে। ইহার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি? সাধারণতঃ গান্ধীজিকে পত্র লিখিলে ১০/১৫ দিন মধ্যে অবশ্যই জবাব পাওয়া যাইত। এ বিষয়ে আমি কোনও সময়ে ব্যতিক্রম দেখি নাই। অথচ চা সম্বন্ধীয় পত্রখানার জবাব দীর্ঘদিন না পাইয়া ভাবিলাম যে হয়ত বাপুজী আমার এসব সামান্য তুচ্ছ চিঠির জবাব দিবেন না। কিন্তু হঠাৎ প্রায় সাড়ে তিন মাস পর জবাব পাইলাম— আদা, গুড় ও কিছু তুলসী পাতা গরম জলে খানিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহা চা-এর মত অবসাদ দূর করিবে, অল্প পয়সায়; তাছাড়া ইহা ঔষধের কাজও করিবে। সাধারণ মানুষের মত তিনি কখনও নিজে যেরূপ আচরণ করিবেন না সেরূপ উপদেশ তিনি দিতেন না। এজন্যই সাড়ে তিন মাস বাদে প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন।

মহাত্মাজী আশ্রম গৃহের বারান্দায় উপবেশন করিলে সত্যাশ্রমের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস, কর্মীদের পরিচয় ও আশ্রমের শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাকে সংক্ষেপে জানানো হইল। সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্যালয়টি এখন হইতে সত্যাশ্রম নামে আবাসিক বিদ্যালয় ও গ্রাম সেবাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হইয়াছে জানিয়া

* অনতিবিলম্বে চরকায় সূতা কাটায় সত্যাশ্রম-এর ছাত্র সারা বাংলায় প্রথম স্থান পান।

তিনি মোটামুটিভাবে তাঁহার সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ দান করেন। তাঁহার লিখিত আশীর্ব্বাণীটি এইরূপ ছিল ঃ—

I wish every success to this Institution and hope that the boys will become expert spinners and carders and preach among the people the loving message of Charka.

25th May M. K. Gandhi
1925

(আমি এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি এবং আশা রাখি যে এখানকার বালকগণ উত্তমরূপ সূতাকাটা ও তুলাধোনার কাজ শিক্ষা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে চরকার বাণী প্রচার করিবে—

(এম, কে, গান্ধী ২৫শে মে, ১৯২৫)

জনসভায়

সত্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া মহাত্মাজী বেলা প্রায় ৯টায় সাধারণ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে এক বিশাল জনসমুদ্র। বিগত রাত্রির আহার সমাপন করিয়াই ধীরে ধীরে লোকজন আসিয়া সভাস্থলে সমবেত হইতেছিল। বিশ্ব বিখ্যাত মহাপুরুষকে এত অল্পায়াসে নিজেদের গ্রামের মাটিতেই দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবে, এই আশায় ও আনন্দে আবালবৃদ্ধবনিতা যেন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। আশেপাশের গ্রামগুলিতে সেদিন রাত্রে অধিকাংশ লোকই নিদ্রার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিকস্থ চর অঞ্চল হইতে মুসলমানগণ নৌকা বোঝাই করিয়া দলে দলে আসিতেছে। গ্রাম অঞ্চলের উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ যেন সামাজিক কুলমর্য্যাদার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বিধবার সঙ্গে ঠেসাঠেসি করিয়া বসিয়া আছে অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র মহিলা। পুরাতন সমাজের জীর্ণ আবেষ্টনী ভাঙ্গিয়া হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রবলে ভবিষ্যতের বাধা বন্ধনহীন সমাজের স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে—কেহ কাহাকেও দূরে যাইতে বলে না, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিবার ভয় নাই—মানুষের দেবতা যেন আজ কত কালের রক্তকলুষিত পাষাণ প্রাচীর ভূলুণ্ঠিত করিয়া মুক্ত মানবকে একই লক্ষ্যে একই পথে একই আনন্দযজ্ঞে আহ্বান করিতেছে। জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানবকে আজ সত্যই তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিবে—একি সত্য না স্বপ্ন!

স্টিমার নোঙর করিবামাত্র জনগণ মুহুঃর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের নির্দেশক্রমে গান্ধীজির নামে জয়ধ্বনি হইল না। কিছুক্ষণ পরেই সহস্র

সহস্র তৃষিত চক্ষুর সম্মুখে কাষ্ঠ পাদুকাধারী কটিবস্ত্রাবৃত মহামানব স্টিমার হইতে তীরে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুখে চিত্তাকর্ষক মিষ্ট হাসি; হাত দুইখানি উঠাইয়া করজোড়ে এই অগণিত সরল হৃদয়ের অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামের সাধারণ লোক এরা—দুঃখ দৈন্যের পশরা বহন করিতেছে আজীবন—আজ এই তেজোদৃপ্ত ক্ষুদ্র মানুষটি তাহাদের মুক্তির আহ্বান আনিয়াছেন, তাহাদের এই হীন জীবনের লাঞ্ছনা অপমান দুঃখকে আপনার বুকে গ্রহণ করিয়াছেন—ইহার চাইতে আপনার আর তাহাদের কে আছে? অতীতের দুঃখের স্মৃতি, বর্ত্তমানের এই অনুপম সৌভাগ্য, ভবিষ্যতের আশাময় স্বপ্নের সঙ্গে মিশিয়া ঐ সব সরল হৃদয়গুলি এক অপূর্বভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইল—অনেকের পক্ষেই অশ্রু সংবরণ করা দঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে এবং সত্যাশ্রমের কর্ম্মীগণের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীকে মানপত্র দেওয়া হয় বাংলায়। মহাত্মাজী বাংলায় কথা বলিতে পারেন না বটে কিন্তু বাংলা শুনিলে বুঝিতে পারেন। গুজরাটি এবং বাংলা ভাষার মধ্যে নাকি অনেক সাদৃশ্য আছে সুতরাং মানপত্রের বাংলা তিনি সহজেই বুঝিয়া লইতে পারেন। মানপত্রের জবাব দিতে উঠিয়া প্রথমেই তিনি অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ দিলেন নিখুঁত ব্যবস্থাদির জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণকে ধন্যবাদ দিলেন এইরূপ সানন্দচিত্তে কংগ্রেস কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ মানিয়া শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। অতঃপর গঠন মূলক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলিলেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপরেই বিশেষ জোর পড়িল। উচ্ছিষ্ট জিনিসকেই তিনি প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্য মনে করেন, কোন ব্যক্তি বিশেষকে নয়—বাল্যকাল হইতে তিনি এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন। বাংলাদেশে যখন সভাস্থলে তিনি একের উচ্ছিষ্ট গ্লাসে অপরকে জল পান করিতে দেখেন তখন তিনি ধারণা করিতে পারেন না যে এ দেশে কেন জাতি বিশেষকে সমাজ অস্পৃশ্য করিয়া রাখে। গ্লাসটিতে মুখ না লাগাইয়া শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা হইলে উহা অপবিত্র কি প্রকারে হয়? এমন কি তাঁহার মাতাজীর উচ্ছিষ্ট গ্লাসেও তিনি জলপান করিতে রাজী নহেন। ইহার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থ বোঝা যায়, ইহার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সমাজের এক একটা প্রকাণ্ড অংশকে যেভাবে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, সত্য ধর্ম্ম বিরোধী এবং অন্যায়। এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে সকলকে বলেন। মহাত্মাজী তাঁহার বক্তব্য ইংরেজীতে বলেন এবং পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহা সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করেন। সভান্তে মহাত্মাজী পুনরায় জাহাজে চলিয়া গেলেন। স্টিমারখানা দৃষ্টিপথ হইতে বহির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত মুগ্ধ নেত্রে জনমণ্ডলী উহার শেষ চিহ্নটুকু নদী

তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাদের মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইল যে আজ সত্যই যেন তাহারা পরম লাভে পরিতৃপ্ত, যেন কাঙাল তাহার ক্ষুধার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র লাভ করিবার সম্ভাবনায় আশায় বুক বাঁধিয়াছে।

তালতলায় জনসমুদ্র

শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে আমিও স্টিমারে উঠিয়া পড়িলাম। সম্মুখের বড় প্রকোষ্ঠে মহাত্মাজী নিবিষ্টচিত্তে কি যেন লেখাপড়া করিতেছিলেন! স্টিমারে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর ব্যতীত আচার্য্য কৃপালনী, ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেন, শ্রী সতীশ দাশগুপ্ত এবং আরও ৫/৭ জন ছিলেন। পদ্মা ও মেঘনা দিয়া স্টিমার তালতলা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনুমান প্রায় সাড়ে বারটার সময় আমরা তালতলা পৌঁছিলাম। স্টিমার হইতে নদীতীরটা যেন নরমুণ্ডের অরণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গান্ধীজি একখানা বড় ছান্দি নৌকায় উপবেশন করিয়া তালতলা খাল দিয়া চলিতে লাগিলেন। বিরাট জনতা ঠেলিয়া আমাদের পক্ষে অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না। জনসভা হইবে ফুরসাইলের জমিদার বাড়ীর খালি মাঠে। উহার পর এক কর্মী ধীরেশ বাবুর বাড়ীতে বিক্রমপুর কর্মীসংঘের একটি বৈঠক হইবে মহাত্মাজীকে লইয়া। এই বৈঠকের কথা কর্মীগণ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। সাধারণ সভাস্থলে জনসমাবেশ এত বিশালায়তন হইয়াছিল যে, একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতা শোনা দূরের কথা, চেহারাই দৃষ্টিগোচর হওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং মহাত্মাজী একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগিলেন এবং আপন বস্ত্রাঞ্চল একহাতে উড়াইয়া ও চরকা কাটিবার ভঙ্গীতে অপর হাতখানা ঘুরাইয়া, মুখে "চরকা কাট, খদ্দর পিন্‌হো।" মাত্র এই কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আর কোন পৃথক বক্তৃতা হইল না। বস্তুতঃপক্ষে ইহাই মহাত্মাজীর সকল কথার সার কথা। সুতরাং এই বাণীই তিনি সকলকে শুনাইলেন।

কর্মীদের সঙ্গে

ইতিমধ্যে বিক্রমপুরের সমস্ত কেন্দ্রের কর্মীগণ ধীরেশ বাবুর বাড়ীর নাটমন্দিরে সমবেত হইলেন। মহাত্মাজী আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং চরকা কাটিতে লাগিলেন। চরকানিরত মহাত্মাজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি বিক্রমপুরের গঠনমূলক কার্য্যের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছিলাম কিন্তু গান্ধীজি এমন নিবিষ্টচিত্তে চরকা চালাইতেছিলেন যে আমার কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার দিকে তাকান ত দূরের কথা, হাঁ বা হুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করিলেন না। এই অদ্ভুত ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের

সুরে হঠাৎ আমি প্রশ্ন করিলাম –Mahatmaji, do you listen to me? (মহাত্মাজী, আপনি কি আমার কথা শুনেছেন?) এবার মুখ উঁচু করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন—Yes, but you have not been able to make me so much interested as yet. (হ্যাঁ, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমাকে আকৃষ্ট করবার মত তুমি কিছু বলতে পার নাই)। হঠাৎ এই খোঁচাটুকু খাইয়া আমার মনেও একটু দুষ্টামি বুদ্ধি জুটিয়া গেল। এবার আমি বলিয়া ফেলিলাম—but Mahatmaji we can't follow you when you say that Charka alone will give us swaraj. (কিন্তু মহাত্মাজী আপনি যে বলেন একমাত্র চরকাই আমদের স্বরাজ এনে দেবে একথা তো বুঝে উঠতে পারি না)। ফিক্ করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন—As far as I remember I have never used the word 'alone'–but since you have added it I should henceforth use it and try to explain myself to you. (আমার যতদূর মনে পড়ে আমি চরকার সঙ্গে "কেবল" শব্দটি ব্যবহার করি নাই কিন্তু তুমি এখন শব্দটি ঐভাবে যোগই করিয়াছ তখন আজ হইতে আমি এই শব্দটি ব্যবহার করিব এবং আমার কথা তোমাদের বলিব)।

ওদিকে আগুনের মত সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে মহাত্মাজী ধীরেশ বাবুর বাড়ীতে বসিয়াছেন। ১৫/২০ মিনিটের মধ্যেই জনতার চাপ এত বৃদ্ধি পাইল যে, আমাদের ভয় হইল বেড়া সমেত নাটমন্দিরখানাই হয়ত ভূমিসাৎ হইবে। সুতরাং আর মুহূর্ত্তমাত্র ওখানে থাকিলে বিপদের আশঙ্কা অনুভব করিয়া দ্রুতবেগে মহাত্মাজীকে লইয়া স্টিমারে চলিয়া গেলাম। জনতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আবার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। স্টিমারটি নোঙর উঠাইবামাত্র নদীর ঘাটের জেটিটা প্রায় তিন চারশত লোক সহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কেহ কোন বিশেষ আঘাত পাইল না। আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া আমরা নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

স্টিমারে বিক্রমপুরের কর্মীরা মহাত্মাজীকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং পূর্ব আলোচনা শুরু হইল। মহাত্মাজী যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ছিল ঃ—

তোমরা সকলেই গঠন কর্ম্মে নিযুক্ত সুতরাং আমি ধরিয়া লইতে পারি যে, গঠন কর্ম্ম আমি যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছি তাহাতে তোমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং সংগঠনের যে কর্ম্মতালিকা আমি উপস্থিত করিয়াছি তাহার পূর্ণাঙ্গ সাধন করিলেই আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে। একথাও তোমরা বিশ্বাস কর

যে ঐ কর্ম্মতালিকার মধ্যে চরকার স্থান সর্বোপরি। সুতরাং যদি আমি বলি যে কেবলমাত্র চরকার দ্বারাই স্বরাজ আসিতে পারে তবে একথাও ধরিয়া লইতে হয় যে চরকা সর্ব্বজনীনভাবে প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ করিবে, একটি সামগ্রিক সাধন রূপে। এই প্রকারের চরকা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদ সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে, নচেৎ চরকা সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার লাভ করিবে না। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, স্বদেশী প্রভৃতি কর্ম্মপন্থা তো ঈদৃশ চরকা প্রচলনের পশ্চাতে আসিয়া পড়িতে বাধ্য। শুধু সালিশী বিচার প্রভৃতি আত্মনিয়ন্ত্রণ মূলক কর্ম্ম পদ্ধতিগুলিও উহার সঙ্গে জড়াইয়া যাইবে। তখন দেখা যাইবে চরকাকে সম্পূর্ণরূপে সার্ব্বজনীন করিতে হইলে গঠন কর্ম্মের প্রতিটি ধারা পূর্ণাঙ্গভাবে সাধন করা প্রয়োজন হইবে। যদি এতদূর আমরা যাইতে পারি তাহা হইলে আমি স্বরাজের যে স্বপ্ন তোমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছি উহা সফল হইবে নাকি?

গান্ধীজির বক্তব্যের শেষ ছত্রটি আজও মনে পড়ে, "Charka is the fine thread of the needle which will ultimately build up the entire structure."

ঝড়ের মধ্যে

এবার জাহাজটি চাঁদপুর অভিমুখে রওনা হইল। মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে জলরাশির বিস্তৃতি প্রায় সমুদ্রের মত— চতুর্দ্দিকে কেবলই দ্বীপ রাজি, নদীর পার দেখা যায় না। স্টিমারখানা সেখানে পৌঁছিলে আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে একটু ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিক হইতে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউগুলি স্টিমারের গায়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাতাস বৃষ্টি ও ঢেউ মিলিয়া চলন্ত জাহাজখানির সঙ্গে যেন ভীষণ তাণ্ডব শুরু হইয়া গেল। প্রকৃতির এই বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মহাত্মাজীর কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি "I like to see the storm" (আমি ঝড় দেখিতে চাই) বলিতে বলিতে উপরে সারেং এর কুঠরীতে গিয়ে দাঁড়াইয়া ঝড়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। স্টিমারখানা ঢেউয়ের আঘাতে মোচার খোলার মত দুলিতেছিল। বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহাত্মাজী জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দোলা খাইতে খাইতে হঠাৎ জানালার খড়খড়িটা তাঁহার হাতের উপর পড়িয়া যায়। আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পার্শ্বস্থ আরাম কেদারায় বসিয়া পড়েন এবং প্রায় ১০/১২ মিনিট কাল অর্দ্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকেন। ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়

নিকটেই ছিলেন তিনি মহাত্মাজীর নাড়ী ধরিলেন; এই আকস্মিক বিপদে সকলকেই একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরেই গান্ধীজি পুনরায় উঠিয়া বসিলেন। একটু কাটিয়া যাওয়ায় হাত হইতে সামান্য রক্তপাত হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু ক্ষতস্থানে Tincture Iodine প্রলেপ দিতে উদ্যত হইলে তিনি ডাক্তারকে নিষেধ করিলেন এবং দাঁড়াইয়া আহত হাতখানি জানালার বাহিরে বাতাসে দোলাইতে দোলাইতে "Doctor, my treatment is aseptic." (ডাক্তার, আমার চিকিৎসা উল্টা) বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। Iodine লাগান হইল না।

[দ্রঃ দেশ, ৩০.০১.১৯৬৬]

গান্ধী-মৃত্যু দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে মুদ্রিত রচনা।

নবগ্রাম

অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বপিতার কাছে, ধরণী জননী
কহিল কাঁদিয়া, ''এ কি হল'' পিতা, সন্তান
আমার মহাশক্তিমান স্থলে, জলে, আকাশেতে
ক্রমে ক্রমে হইতেছে ক্ষয়,
হয়ত বা লুপ্ত হবে পরিচয়।
কহিলেন পিতা, ভয় নাই, কনিষ্ঠ সৃষ্টি মোর—''মানুষ''
তোমারই কোলেতে আসিবে সত্বর,
দিব তারে একটি অস্ত্র,
নাম তার ''জ্ঞান,''
দেখে নিবে কত শক্তিমান।।
পাথর ঘষিয়া, রচিল 'আগুন', গড়িল ''কুঠার''
নির্মল নগর, উপনগর, নব ''নবগ্রাম''
স্থলে, জলে, আকাশে বাতাসে
সেই ক্ষুদ্র শিশু মহাশক্তিমান,
কোথা তুমি বিশ্বপিতাই করিছে সন্ধান।
ক্লেদাক্ত পৃথিবী আজ, তাই সেই ক্ষুদ্র শিশু
চন্দ্র কিংবা মঙ্গলের বুকে, চাহিতেছে রচিবারে—
নব বাসস্থান
নব নবগ্রাম।।

নবগ্রাম

সুধীর সেনগুপ্ত

ভট্টবাবুর[১] অট্টহাসি, নাই তবুতো গোঁফ;
পরেশ[২] বাবুর বেটে গড়ন;
নিখিল[৩], অমর[৪] কালোবরণ,
"সত্য-রামে[৬] করি' স্মরণ,
তা'দের কথায় উঠি বসি মশায় মারি তোপ।
গিরীন[৭] বাবুর নিপুণতা,
শ্যাম[৮] বসন্তের[৯] ব্যাকুলতা;
হীরেন[১০] সেনের বদান্যতা;
ত্যাগী মনের গেরুয়াতে লাগায় রঙের ছোপ্।
নারদরূপে কেউ বা ঘুরে,
চিন্তা কারে দিব জুড়ে,
বাক্ বিতণ্ডা বীণার সুরে,
মাতিয়ে দিলে ত্রিভুবনে শান্তি হবে লোপ্।
জীতেন[১১] বাবুর "জয়হিন্দ" জয়,
জাগায় শৈল মহাপ্রলয়;
মোরা আছি যারা কোন কিছু নয়;
উজির নাজির আমরা করি
ঝোপ্ বুঝে দেই কোপ্
সুরেন[১২], কানাই[১৩] মানিক[১৪] বাগে
চরণ[১৫] কারার অনুরাগে,
মোদের তরে ভাগে ভাগে
বংশবনের বংশাবলী করল তারা লোপ।
মুখর হ'ল নীরবতা
জাগল মাটি জাগল লতা
পূর্ণ হল সজীবতা;—
এরি মাঝে "দৃষ্টিশনি'র[১৬] দুর্ব্বাশার ঐ কোপ।
সোঝা নদীর বাঁকা তীরে, (বঙ্কিম নয়)

হাতছানি দেয় কারা ধীরে;
এমন স্নিগ্ধ শান্তি নীড়ে
গোল পাকাতে গভীর ভাবে ফেলল তাজা টোপ।

টীকা ঃ ১। চন্দ্রভূষণ ভট্ট ২। পরেশচন্দ্র চন্দ ৩। নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত ৪। অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫। সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। রামবাবু বা দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডাক্তার বাবুর অগ্রজ ৭। গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮। শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী ৯। বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ১০। হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ১১। জিতেন্দ্রনাথ দাস, ১২। সুরেন্দ্রনাথ দাস, ছোটবহেড়া ১৩। কানাই ঘোষ, বড়বহেড়া ১৪। মানিক বাগ, ছোটবহেড়া ১৫। চরণ কাড়ার, ছোটবহেড়া ১৬। শনির দৃষ্টি — যুগান্তর পত্রিকা-র সম্পাদকীয়।

[দ্রঃ প্রতিধ্বনি হাতে লেখা পত্রিকা, ১৯৫১। দোল সংখ্যা, নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘ।]

আমার চোখে নবগ্রাম

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

শোন শোন জনগণ, শোন দিয়া মন,
নবগ্রামকে যাহা জানি করিব বর্ণন।
ভুল-ত্রুটি থাকি গেলে করি দিও মাপ
নিজগুণে, নাহি করি কোন অভিশাপ।
প্রথমে তো 'নবগ্রাম' নাম নাহি ছিল,
অমূল্যকুমার সরকার নাম তাহে দিল।
'নব'-র অর্থ হইল 'নতুন' যেমন
'নবগ্রাম' নামখানি হইল তেমন।
আর একটু আগাইয়া লেখা ধরি চল—
একবার মুখে শুধু গৌর হরি বল।
১৯৪৮ সালের ২রা ডিসেম্বর,
সৃষ্ট হইল 'নবগ্রাম', শোন তারপর।
নবগ্রাম মাল্টিপারপাস্ কোঃ অপঃ সোসাইটি
লিমিটেড' সৃষ্ট হইল (তাইরে - নাইরে - নাই-টি)
ইহার উদ্দেশ্য হইল পূর্ব পাকিস্তানের
মানুষের বসবাস-ব্যবস্থা বিধানের।
এই অঞ্চলেতে স্থায়ী বসতি স্থাপন,
স্বল্প মূল্যে তাহাদের জমি বিতরণ।
জলের ব্যবস্থা হইল, হইল রাস্তা-ঘাট,
প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়ে জমজমাট।
'বিদ্যাপীঠ' হইল তৈরি তাহাদের দ্বারা,
ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে গড়ি ওঠে পাড়া।
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আগমনে ধন্য
নবগ্রাম, আজ আর নহে তো নগণ্য।
ক্রমে ক্রমে নবগ্রামে বসতি বাড়িল,
যাহা ছিল অনাদৃত, নজর কাড়িল।
নবগ্রাম পশ্চিমে আর পূর্বে কোন্নগর,
নবগ্রামের অগ্রগতি পায় সমাদর।

বড় বড় বাড়ি আর মঠ ও মন্দিরে,
সৃষ্টি ও কৃষ্টির পথে বাড়ি' ওঠে ধীরে।
মহাদেশ পরিষদ, সেবক সংঘেতে
নানাবিধ অনুষ্ঠানে রহিয়াছে মেতে।
নাচ, গান, অভিনয়, দেশী সংস্কৃতি
তাহাদের তরে আজ যথাস্থানে স্থিতি।
রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক ডাকঘর,
নবগ্রাম সমৃদ্ধ হইল ক্রমে অতঃপর।
নবগ্রাম চলি গেল পঞ্চায়েত অধীনে,
সাধ্যমত কার্য করি' চলে দিনে দিনে।
হইল গ্রাম পঞ্চায়েত, করে দেখভাল,
শক্ত হস্তে ধরি' কর্ম সংস্কৃতির হাল।
শিথিল হইয়া পড়ে ক্রমে শক্ত হাত,
সূর্য ঢলে, অস্তাচলে আনি দেয় রাত।
স্থবির হইয়া পড়ে, কর্ম না করি'—
আরেকবার সবে মিলি বল গৌর হরি।

নবগ্রাম 'কুলীন' আজ, সবই আছে হেথা,
দোকান, বাজার, আছে ক্রেতা-বিক্রেতা।
বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে,
প্রয়োজনে ডাক্তার মিলিবেক কাছে।
আরও আছে হরিসভা—শ্রীহরির ধাম,
নাম সংকীর্তনে আছে গোবিন্দের নাম।
আরও আছে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী মত,
দেখাইতে মানুষকে সত্যতার পথ।
আছে মধ্যপন্থী, আর আছে ডান, বাম,
ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে আছে নবগ্রাম।
আছে জঙ্গল, মশা, সানাইয়ের সুরে
'দংশন' রাগ শুনি, রাত্রে দুপুরে।
আছে ভাঙাচোরা রাস্তা, অপুষ্টিতে ভুগি'
ছাড়িয়াছে আশা, যেন ক্ষয়প্রাপ্ত রুগী।
চলে দুই, তিন আর চার - চাকার গাড়ি,

রাস্তার উপরি 'ত্রাহি মাম্' ডাক ছাড়ি'।
আরোহী ও চালকের শরীর নাচন
ক্ষয়প্রাপ্ত রাস্তাপরে। মরণ, বাঁচন —
কোনটা রহিবে টিকি পঞ্চায়েত জানে,
পেট -অভ্যন্তরে নাড়ি ধায় ঊর্ধ্ব পানে।
কেহ বা আছাড় খায় রাস্তার গর্তে,
'কানেতে দিয়াছি তুলা, পিঠে কুলা শর্তে।
ভালো-মন্দ, সাধু-চোর, সুনাম-দুর্নাম,
সবকিছু মিলাইয়া এই নবগ্রাম।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হইবে পালিত,
নানাবিধ অনুষ্ঠান, নৃত্য, বাদ্য, গীত।
এহেন সময় নিজে প্রার্থনা করি,
সবে ভালো থাক হেথা, আনন্দ লহরী
সদাই বহিয়া যাক সকলের মনে,
শান্তি সদাই থাক প্রতিটি ভবনে।
সকলের সৎ ইচ্ছা, সৎ মনস্কাম
পুরাইয়া দেয় যেন এই নবগ্রাম।
সবে যেন বাঁধা থাকে প্রেমের বাঁধনে,
শুভেচ্ছা পাঠাই এবে প্রতি জনে জনে।
নবগ্রামের কথা অমৃত সমান,
ধী. চৌ. কহে আর শোনে পুণ্যবান।।

কি হারিয়ে কি পেয়েছি

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হারানো প্রাপ্তির হিসাব করতে গেলে আগেই মনে পড়বে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা। স্বাধীনতা শব্দটা বড়ই আবেগ মথিত। বাস্তবে মানানসই নয়। স্ব এর অধীন হয়েই কি একজন বাঁচতে পারে? বাঁচতে হলে লেনদেন করে, অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। তবেই সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এই বাধ্যবাধকতা থাকায় শব্দটার বিস্তারও কিছুটা খর্ব হয়। তাই মনে হয় পূর্ণ স্বাধীনতা কেউ কোনো দিন লাভ করতে পারে না। তবে এ সব কথা ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের। আমাদের দেশ, আমরা জন্মেছি এখানে, অতএব দেশের ও দেশের জনগণের কল্যাণ ও উন্নতির কথা বিচার করে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন আমরাই করব। বৈদেশিক আধিপত্য সহ্য করব না। এই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা দেশের স্বাধীনতা। এই মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের জনগণ আন্দোলনে মেতে উঠেছিল। তাই দু'শ বছরের ইংরাজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য করতে হয় দীর্ঘ সংগ্রাম। শুরু হয়েছিল সেই সিপাই বিদ্রোহের সময় আর চলল ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয়। ভারত হল খণ্ডিত। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট হল পাকিস্তান। পাঞ্জাব, সিন্ধু, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত হল পশ্চিম পাকিস্তান। অবশ্য সেজন্য পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত হতে হয়েছিল। এদিকে পূর্ব বাংলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকায় এটা হবে পূর্ব পাকিস্তান। বাঙালী হিন্দুদের মাথায় হাত! লক্ষ লক্ষ বাঙালী বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করে, নির্যাতন ভোগ করে, আত্মত্যাগের বিনিময়ে কি এই পেতে চেয়েছিল! মুহ্যমান বাঙালী হিন্দুর অন্তর্বেদনা অবশ্য বিফলে যায়নি। পাঞ্জাবের মতো বাংলাকেও দ্বিখণ্ডিত করা হল। বাংলার পূর্বদিকের দুই-তৃতীয়াংশ হল পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমের এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে রয়ে গেল ভারতে।

যাই হোক স্বাধীনতা পেলাম এবং সে প্রাপ্তির বয়সও হল ৫০ বছর। ঘটা করে সমারোহে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে সর্বত্র। আমি ভাবছি এই স্বাধীনতা পাওয়াতে আমি তথা খণ্ডিত বাংলার বাঙ্গালী হিন্দুরা কি পেলাম। আমরা কিছুই

পাইনি, বিনিময়ে সব হারিয়েছি। সবচেয়ে বড় দুঃখের হল আত্মপরিচয় হারানো। আমরা এক একটি একক হয়ে গিয়েছি। বংশধারা, পিতৃপুরুষ সব হারিয়ে একা, শিকড় ছেঁড়া। দেশ-ভাগের আগে প্রতি গ্রামে বিশেষ বিশেষ বাড়ির পরিচয় ছিল। সে সব আজ বিস্মৃতির গর্ভে। কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কি আমার কুলশীল্, সব ভুলে গেছি। আত্মপরিচয় হারানো বড়ই মর্মান্তিক। ঝড়ো হাওয়ায় কে কোথায় ছিটকে গেছে, জানা নেই, যোগাযোগ তো নেই-ই। জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কেউ মারা গেলে সে খবরও পাইনা, তাই অশৌচ পালনও হয় না। এইভাবে আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছি।

এখানে আছি প্রায় পঞ্চাশ বছর। এক মাইল দূরে কি আছে জানিনা। না চিনি লোকজন না চিনি গ্রাম গঞ্জ বা তাদের আচার ব্যবহার। কাউকেই আপন করে নিতে পারিনি। অথচ যাকে হারিয়েছি সেটা কিন্তু বিন্দুমাত্র নয়। ২৫-৩০ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে যে ভূখণ্ড হয় সেই রকম একটি এলাকার সবটাই ছিল আমার নিজের। সেই সব মাঠ ঘাটের সঙ্গে ছিল আমার একাত্মতা। আর এখন যেন খাঁচার পাখি অথবা টবের ফুল গাছ। মাটির টান হল না। এই হারানোর দায়িত্ব কি আমার? আমার কর্মফলের, নাকি আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন যাঁরা, তাঁদের দায়িত্বহীনতা।

সবই হারিয়েছি কিছু পাইনি বললে কিন্তু পূর্ণ-সত্য বলা হয় না। বাইরে চোখ ধাঁধানো উন্নতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রয়োগ বিদ্যার ফলে অঢেল শৌখিন জিনিস পত্রে চারিদিক পূর্ণ। আর্থিক সচ্ছলতাও এসেছিল সর্বক্ষেত্রে। তবে মানুষ যে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের দিকে নেমে যাচ্ছে— এটা কিন্তু আরও বড় বেদনাদায়ক। তবে সব হারিয়ে কি পেয়েছি তা বলা দরকার। স্বাধীনতা তো পেলাম, বাংলাও যে ভাগ হ'ল। এখন উপায়! যাঁরা আগে থাকতে এদিকেই চাক্‌রী-বাক্‌রী করতেন অথচ দেশ পড়ে রইলো ওপারে, তাঁরা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। বহুলোক বিকল্প বাসস্থানের অনুসন্ধানে কলকাতার আশেপাশে এদিকে সেদিকে বেরিয়ে পড়লেন রবিবার সকালে — বা অন্য দিন ছুটির পর বিকেলে। এভাবে কারো কারো সঙ্গে আলাপও হয়ে যেত। গিরীনবাবু অর্থাৎ গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করতেন র‍্যালি ব্রাদার্সে এবং থাকতেন সপরিবারে উত্তরপাড়ার এক ভাড়া বাড়িতে। উনি হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের এদিক সেদিক দেখতে লাগলেন। একদিন নেমে পড়লেন কোন্নগর স্টেশনে। স্টেশনের পশ্চিম দিকে বিরাট এলাকা। কাছাকাছি দুটি মাত্র ছোট গ্রাম পাশাপাশি। একটা ছোটবহেড়া অন্যটি

বড়বহেড়া। লোকবসতি সামান্য। স্টেশনে যাত্রী ওঠা নামাও তেমন চোখে পড়ে না। স্টেশনে কোনো রিক্সা ছিলনা, ছিলনা কোনো আলোর ব্যবস্থা। তবে তারাপদ ডাক্তারের দোকানটা তখনই ছিল। এইতো এ পাশের শ্রী। ওপাশে সোজা ক্রাইপার রোড্ ধরে যেতেও একটা গৃহস্থের বাড়ী নজরে পড়ে না, আবার অন্যদিকে কালীতলার দিকে ছিল জঙ্গল, পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্প। কোন্নগর অতি প্রাচীন জায়গা। পশ্চিমে কিন্তু ম্যালেরিয়ার কোপে বহুকাল আগেই ওখানকার বাসিন্দারা এদিক সেদিক চলে গিয়েছিলেন। কলকাতার এত কাছে যে এরকম একটা অনগ্রসর ও অবহেলিত জায়গা থাকতে পারে তা আগে কেউ বোঝেন নি। স্টেশনে হঠাৎ যোগাযোগ হ'লো গিরীনবাবুর সঙ্গে পরেশচন্দ্র চন্দের। উনি কবিরাজ, থাকেন গ্রে স্ট্রীটে। উনিও এসেছিলেন একই ধান্দায়। দুজনের আলাপ হল। স্টেশনের এই পশ্চিম দিকের এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

যার সঙ্গেই দেখা হয় তার কাছেই জমির খোঁজ করেন। সবাই বলে, জমি নেই, হবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে বহু জমি অবহেলিত ভাবে অনাবাদি পড়ে আছে। এই ভাবেই বড়বহেড়ার কানাই ঘোষের সঙ্গে হয়ে গেল এঁদের যোগাযোগ। সে সাহায্যের হাত বাড়াল এবং দালালির বিনিময়ে কিছু জমি যোগাড় করে দিল। বড়বহেড়ার রাস্তার শেষ প্রান্ত থেকে বর্তমান Red Cross Society পর্যন্ত ২০/২৫ ঘর লোক বসতি হয়ে গেল এই ভাবে। সবাই টিনের ঘর করলেন, পাকাবাড়ির কোনো প্রশ্ন ছিলনা। না ছিল রাজমিস্ত্রী, বালি-সিমেন্ট সরবরাহের ব্যবস্থা। খাওয়ার জলের ব্যবস্থা হল যার যার বাড়িতে পাতকুয়ো খুঁড়ে। এই হল নবগ্রামের সংক্ষিপ্ত জন্ম বিবরণী। গিরীন বাবুরা কিন্তু নিজের বাড়ী করেই চুপ করে থাকলেন না। তাহলে আজকের নবগ্রাম হত না। তাঁদের দূরদৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করতেই হবে। প্রত্যেক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি যাতে সহজে জমি সংগ্রহ করে একটু আশ্রয় গড়তে পারেন সেজন্য নবগ্রাম Co-operative Colony নামে একটি Co-operative Society তৈরি করে ১৯৪৮ সালের ২রা ডিসেম্বর সেটাকে Registered করলেন। শুরু হল সমবায়ের অভিযান। সমবায় সমিতির পরিচালকদের নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতায় আজ এই সমিতি ৫০ বছরে উপনীত। আধুনিক সমাজে বাস করতে যা যা প্রয়োজন সমিতি তার সব ব্যবস্থাই করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, জল, আলো, পোস্ট অফিস, জুবিলি মার্ট হয়েছে, হাসপাতাল হচ্ছে। সবই কিন্তু হয়েছে বা হচ্ছে সরকারি সাহায্য ছাড়াই। শুধুমাত্র সদস্যদের

সহযোগিতাই এর মূলধন। আজ নবগ্রামকে আর গ্রাম বলা যায়না। এটা Urbanised Rural Area, এখানে মিউনিসিপ্যালিটি হওয়া অত্যাবশ্যক।

নবগ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার জনগোষ্ঠী অর্থাৎ এই সোসাইটির সভ্যরা সকলেই সমপর্যায়ের; কি শিক্ষায় দীক্ষায়, কি সামাজিক আচরণে এবং অর্থানুকুল্যে সকলেই প্রায় সমান। কেউ ছোট নয় কেউ বড়ও নয়। অবিমিশ্র জনপদ নিয়ে এই নবগ্রাম। এটাও কিন্তু গর্ব করার মতো। এবার বলি নিজের কথা। এই নবগ্রামে আশ্রয় পেয়ে আমি ধন্য। শুরুতে বলেছি, কি হারিয়ে কি পেলাম। তার উত্তরে বলছি যে সব হারিয়ে নবগ্রাম পেয়েছি। নবগ্রাম আমার 'Foster Mother', নবগ্রামকে নমস্কার—(১৯৯৭)।

নবগ্রামের শৈশব

শ্রীমতী অনিমা কর

১৯৪৯ সাল। আমরা তখন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছিতে অসন্তোষ নিয়েই বাস করছিলাম, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায়। একদিন শুনতে পেলাম হাওড়া থেকে ৯ মাইল দূরে পূর্ব রেলের কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিমদিকে আমাদের জন্য একটা জমি দেখা হচ্ছে। পূর্ববঙ্গেরই কিছু লোক মিলে নবগ্রামে একটা কলোনি করেছেন। তখন পরেশচন্দ্র চন্দ মহাশয় কলোনির সেক্রেটারি। আমাদের এক আত্মীয়ই আমাদের ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের একটা প্লট দেবার অনুরোধ করেন এবং আমরা পেয়েও যাই. সাঁতরাগাছি থেকে যাতায়াত করে বাড়ি করব ভেবেও একটু চিন্তায় পড়ি, যে এখানে থেকে বাড়ি না করতে পারলে তো অসুবিধে। তাই সম্পাদক মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষের খালি বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয় বিনা ভাড়াতে, কারণ আমাদের জমি তাঁর বাড়ির কাছেই। প্রথমেই বুঝলাম যে, হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই বোধ হয় পেলাম, কারণ বাড়িও দেখাশুনা করলেন আমাদেরই পরিচিত প্রবোধরঞ্জন গুহ মহাশয়। প্রথম দিন কোন্নগর স্টেশন থেকে নেমে যখন গভীর বাঁশবন দিয়ে আসি তখন রীতিমত ভয় করছিল, কারণ আমি কোনওদিন গ্রামে বসবাস করিনি বিয়ের আগে। এরপর রাতের নির্জনতা ও শেয়ালের ডাক আমাকে আরও ভীত করে তুলল। তখন ৪/৫ জন মিলে পাহারা দিত রাতে। কয়েকদিন আগে স্বর্গীয় প্রফুল্লরঞ্জন দাসের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। রাতে একদিন হ্যারিকেন নিয়ে বাথরুমে যেতেই কয়েকজন লোক দৌড়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরলেন। কারণ আমরা যে নূতন এসেছি ওঁরা জানতেন না। খুব বেঁচে গেলাম। কারণ বর্শা ছুঁড়ে মারেননি! সঙ্গে এও বুঝলাম মুষ্টিমেয় কয়েকজন হলেও সকলেই সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল।

নিজেদের বাড়িতে এলাম, চতুর্দিকে খোলা মাঠ, খুব দূরে দূরে বাড়ি। রাতে যখন সবাই পাহারা দিতে বেরিয়ে যেত তখন আমার ভয়াবহ অবস্থা। এর মধ্যে যদি ঝড় বৃষ্টি হত তবে আমাদের সম্পাদক মহাশয় ঐ রাতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও সকল বাড়ির সামনে এসে বলে যেতেন 'ভয় নেই'। এমন আন্তরিকতা অভিভূত করত। অসুবিধে ছিল যদিও অনেক। জল ছিল না, দূরে

দুরে ২/১ টা পুকুর ছিল। কুয়োতে চৈত্র বৈশাখে জলশূন্য অবস্থা, সাপের উপদ্রব। আলো ছিল না, তথাপি আনন্দ ছিল। যে কয়টা পরিবার ছিল তার সকলের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, একজনের বিপদে আর একজন পাশে।

নবগ্রাম সম্বন্ধে লিখতে হলে অনেক লেখা যায়। কিন্তু সম্ভব কী! ছেলেরা অসুস্থ হলে রাত জাগত ছেলেরা। আর মেয়েদের অসুস্থতাতে মেয়েরাই রাত জেগে তাদের সেবা করত। এটা সম্পাদক মহাশয়ের নির্দেশেই আমরা করতাম। আমাদের কোনও অজুহাতই তাঁর কাছে স্থান পেত না। নবগ্রামে তখন জাতিভেদের একটু বাড়াবাড়ি ছিল। আমরা মেয়েরা ঠিক করলাম আমরা মেয়েরা সবাই মিলে বনভোজন করব এক একজনের বাড়িতে। হলও তাই। তাতে আনন্দ হত প্রচুর, মেলামেশার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির ভেদাভেদ কিছুটা কমল।

এরপর একদিন শ্রদ্ধেয় পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী মহাশয় এসে তৎকালীন সভাপতি স্বর্গীয় গিরীন বাবুর বাড়িতে একটি সভা ডাকলেন। উনি ছিলেন সম্পাদক মহাশয়ের বন্ধু। আমাদের মেয়েদের বললেন যে "সত্যভারতী" নামে একটি সংস্থার শাখা তিনি এখানে খুলতে চান, যার মাধ্যমে এখানে কিছু জনহিতকর কাজ করা যাবে। মেয়েদের ও পুরুষদের ২টি ভিন্ন ভিন্ন শাখা খোলা হল। আমরা কয়েকজন ভার নিয়ে মেয়েদের জন্য কাজ আনতাম। যার মাধ্যমে তারা কিছু রোজগার করতে পারতো, সেলাই শেখানো হত। প্রতিদিন পাঠচক্র বসত, সেখানে নানা কথা আলোচনা করতাম আমরা মেয়েরা। দুপুরবেলা ভালভাবেই কাটত। ঈশ্বর পাঠশালার স্বনাধমন্য পণ্ডিত স্বর্গীয় জানকীনাথ সরকার মহাশয় আমাদের পাঠচক্র অলঙ্কৃত করতেন। সত্যভারতীর মাধ্যমে আমরা দুঃস্থদের মধ্যে দুধ গুলে বিতরণ করতাম। অনেক সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা থাকত। অনেকেই প্রচুর সেলাই করে অর্থ রোজগার করতেন। এসব সেলাই করা জামা শ্রদ্ধেয় পুষ্পদাই কলকাতাতে নানা প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে দিতেন। সত্যভারতীর মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে অনেক কাজই করতাম আমরা, যার ফলে সকলের মধ্যেই একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। ছেলেমেয়েদের স্কুলের জমিটা ছিল এক ভদ্রলোকের। যেহেতু ভদ্রলোক আসছিলেন না এবং জমিটা কলোনির অফিস ঘরের সামনে কেন্দ্রবিন্দুতে, তাই বাসিন্দারা এক রাতের মধ্যেই ঘরের দালান অনেকটা তুলে ফেলেন। সমস্ত রাতই মিস্ত্রীদের সাথে ইঁট, বালি টেনেছিল সকলেই। এখানে কোনও উচ্চ নীচ

ভেদ ছিল না। একটা শব্দই ছিল যে আমাদের স্কুল। সঙ্গেই পৌরভবন। যেখানে সবরকম সভা, সমিতি, নাটক প্রভৃতি হত।

অনেক কথাই মনে পড়ে। এখন যে রাস্তাটা কলেজ রোড নামে স্টেশনে মিশেছে, সেটা ছিল বিরাট এক আনারস বন। আমরা তখন ঝিলের পাড় দিয়ে যাতায়াত করতাম। অনেক রাতে ফিরবার সময় অনেকেরই বাজারের থলে আনারস ক্ষেতে আটকে যাওয়াতে অশুভ শক্তির ভয়েতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়তেন। এক রাতে মাঝখানের কিছু আনারস গাছ কেটে রাস্তা বানিয়ে ফেললেন রাতের অন্ধকারে, পরেশবাবুর নির্দ্দেশে। সকালে উঠে আলাদিনের প্রদীপের মত অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে সকলেই অবাক। এইভাবে সব কাজই সকলের সহযোগিতায় হয়েছে। তাই বর্তমান সমবায় সমিতি নাম সার্থকতার দাবি রাখে। ছেলেদের স্কুলের বাড়িতে মেয়েদের স্কুল সকালে আরম্ভ হয়। প্রাইমারি স্কুলও একটা হয়। সকলেই প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে স্কুল গড়ে তুলেছেন। প্রথমে লাইব্রেরিও গড়ে ওঠে সকলের উপহারের বই অবলম্বন করেই। আদর্শ গ্রাম হিসেবে নবগ্রামের নাম হুগলী জেলাতে প্রথম সারিতে থাকলেও এখনও নবগ্রাম সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, যদিও এখানে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস। আমরা নবগ্রামের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

"সর্পকুলের কথা ভুলি নাই। সে স্মৃতি ভয়ংকর। অনেক বাড়িতেই ঘরের মধ্যে বিপজ্জনক অবস্থায় দিবারাত্র গোখুরা সাপের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছি। তাহাদের বধ করিয়া গৃহস্থকে স্বস্তিপ্রদান করিয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু আজিও সরকার হইতে, নিদেন সোসাইটি হইতে 'বীরচক্র' পাইলাম না।"

রঙ্গলাল দত্ত

নবগ্রাম সোসাইটির সিলভার জুবিলি

নবগ্রাম সোসাইটির সিলভার জুবিলি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। স্টেশনধারে বাইপাসের কোনায় ঝিলের দক্ষিণে 'জুবিলি মার্ট' আজ কেনাকাটার আদর্শ স্থান। একতলা, দোতলা নিয়ে এর অবস্থান। দোতলায় দক্ষিণ অংশে ইউ. বি. আই. নবগ্রাম, এই ব্যাঙ্কে কোন্নগর শহরের অ্যাকাউন্টধারী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। এর মধ্যে পেনশনভোগীর সংখ্যাও অনেক। ইউ. বি. আই. নবগ্রামে শুরু হয়েছিল নৈটি রোডে স্টেশন মাস্টারের ভাড়া বাড়িতে। বর্তমানেও ইউ. বি. আই. নবগ্রাম ব্রাঞ্চ মাসিক ভাড়া দেন নবগ্রাম সোসাইটিকে; তবুও সম্পর্কটা এখন আর ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা নয়।

১৯৪৮—১৯৭২-এ হিসাবে Silver Jublee পালিত হয়। একাজের সহায়তা করে এগিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামপুরের তখনকার বিধায়ক শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ ও তাঁর একান্ত সচিব অধ্যাপক স্বরাজ মুখোপাধ্যায়, পরে যিনি উত্তরপাড়ার বিধায়ক হয়েছিলেন। ঝিলের জলা বুজিয়ে জমি উঁচু করে আস্তে আস্তে মাটি বসিয়ে নিয়ে এই মার্ট তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন মনোরঞ্জন সরকার, শচীন্দ্রকুমার সরকার, রেবতীমোহন দাস এবং সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

'জুবিলি মার্টের' জমিতে বাড়ি উঠবার আগে এক মুড়িওয়ালা বসত। বসত কিছুদিন এক মাছওয়ালা, সকালে-বিকালে বিক্রি করত ইলিশ মাছ। বাড়ি করার জন্য প্ল্যান এস্টিমেট তৈরি করলেন ইঞ্জিনীয়ার সুহাস মুখার্জী। তাকে কাজে সাহায্য করলেন বি-ব্লকের সলিল ঘোষ (ভানু)।

প্রথমে একতলা, তারপর দোতলা, চারদিক ঘিরে আজ এক মস্ত জায়গা। দোতলায় দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাঙ্কের পিছন দরজা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি একাধিক। জামা, কাপড়, চশমা, ওষুধ, ডাক্তার, শর্টহ্যাণ্ড ইনস্টিটিউট, জুতো, সাইকেল, জেরক্স, টেলিফোন বুথ, খাদি, ইমিটেশন গহনা কোনকিছুরই অভাব নেই। কুরিয়ারের ব্যবস্থা পর্যন্ত বর্তমান। বহু মানুষের রুটির সংস্থান হয়েছে এখানে, আরও হবে।

জুবিলি মার্টের উত্তরে লম্বা রাস্তা ঝিল রেল লাইন বরাবর। তাই এই পথের নাম ঝিলপথ, একেবেঁকে কলেজ পর্যন্ত চলে গেছে। এই জলসম্পদ নবগ্রামের গৌরব। মাছ, বিনোদন, সাঁতার-শেখা এসব ব্যাপারে ঝিলের উপযোগিতা আছে। জল সম্পদের বিচারে নবগ্রাম সোসাইটির ভূমিকা খুব উজ্জ্বল। যখন পূর্ববঙ্গের মানুষেরা এসে বাড়ি করেছেন অনেকেরই বাড়িতে

একটা-আধটা পুকুর করা হয়েছিল। যা আজ আর অনেক ক্ষেত্রেই নেই। তবুও সোসাইটির মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি পুকুর বর্তমান। তাতে কোথাও মাছ চাষও হয়। তবে সোসাইটির মাছের ব্যাপারে ভূমিকা কম। বোসু পুকুর, কাঁটা পুকুর, দিঘি পুকুর, ফরার পুকুর, অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন বশিষ্ঠের ঝিল, সংগৃহীত হয়েছিল "বোর্ড অফ হায়ার এডুকেশন" -এর কাছ থেকে জমি কেনার সময়। খেলোয়াড় সূর্য চক্রবর্তীর বাড়ির পূর্ব পাশে কদমপুকুর প্রফুল্ল দাস কিনে নিয়ে পুকুরের উত্তর দিকে অনেকটা জমি বানিয়ে নিলেন মাটি ফেলে। রেলের ধারে জলা কয়েকটা আছে। এগুলো পারিবারিক, তবে মাছ চাষ হয়।

সিলভার জুবিলির সময়েই তদানীন্তন সম্পাদক শচীন্দ্রকুমার সরকারের আগ্রহে সোসাইটি অফিস বিদ্যাপীঠ থেকে চলে আসে বর্তমান স্থানে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাঁকুড়ার শালতোড়ার বিধায়ক ডাঃ অনাথবন্ধু রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সিলভার জুবিলির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছায়ানাটকের মাধ্যমে নবগ্রামের ইতিহাস উপস্থাপিত হয়। রচনা ও পরিচালনা করেন সুনির্মল মজুমদার। ৭৬টি কার্ডবোর্ড কাট আউট স্লাইড নির্মাণ ও আলোক সম্পাত পরিচালনা করেন কবীর সুর চৌধুরী। এতে তৎকালীন নবগ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তিও স্বশরীরে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করেন।

সুবর্ণজয়ন্তীর কথা

১৯৭২-এ নবগ্রাম সোসাইটির সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠানের ২৫ বছর পরে ১৯৯৭-এ সপ্তাহব্যাপী সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়। উৎসবের সভাপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্তীর কথায় "আজ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ আমাদের নবগ্রাম সর্বার্থসাধক সমবায় কলোনী ও আবাসন সমিতির ৫০তম জন্ম দিবস। এই বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করার জন্য এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন।"

২রা ডিসেম্বর সকালে প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিকালে স্থানীয় অধিবাসী হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি আশীষবরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক স্মারকগ্রন্থের প্রকাশ এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের ও মহিলাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুকুমার চক্রবর্তী এবং সম্পাদক শচীন্দ্রকুমার সরকার বক্তব্য রাখেন। এছাড়া প্রবীণ সদস্যদের ভাষণ এবং তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

৩রা ডিসেম্বর সমবায় বিষয়ক আলোচনা সভায় সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ

মণ্ডল এবং হুগলী জেলার আধিকারিক ও শ্রীরামপুর মহকুমার সমবায় আবাসন সমিতির পদস্থ ব্যক্তিরা সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

নবগ্রামের সূচনা থেকে ক্রমবিবর্তনের উপর এক মূল্যবান তথ্যচিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। সোসাইটির প্রযোজনায় এটি প্রস্তুত করেন কবীর সুর চৌধুরী; এর জন্য সঙ্গীত রচনা করেন জ্ঞান চক্রবর্তী।

৪ঠা থেকে ৭ই ডিসেম্বর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নবগ্রাম সেবক সঙ্ঘ ও মহাদেশ পরিষদের সভ্যবৃন্দের মিলিত নাট্যানুষ্ঠান। এছাড়া কলকাতার 'সায়কে'র অভিনয় "দায়বদ্ধ" নাটক এবং আনন্দ শঙ্কর ও তনুশ্রী শঙ্করের ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল।

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এক স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনায় স্মারকগ্রন্থটি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। সুকুমার চক্রবর্তী, শচীন্দ্রকুমার সরকার, দেবব্রত সুর চৌধুরী, মুরারি মিত্র, কিশোরমোহন হালদার, অতীন্দ্রকুমার ব্যানার্জী, সুধাকণা দাস, ডঃ চিত্তরঞ্জন বশিষ্ঠ, অমূল্য চ্যাটার্জী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অনিমা কর, রঞ্জিত দাস, সুবোধকুমার গুপ্ত, অজিত ঘোষাল, ডঃ স্বরাজ সেনগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রবন্ধে, কবিতায় নবগ্রামের ক্রমবিবর্তনের কথা প্রকাশ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

প্রসঙ্গ ঃ নবগ্রাম ও সমবায় সমিতি

১৯৯৭-এ সমবায় সমিতির সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ থেকে ঃ

আজ বিশেষভাবে মনে পড়ে সেই দিনগুলি যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর যে মুহূর্তে বোধোদয় হল যে আমরা সব ছিন্নমূল হয়ে গেছি যা ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ভিটেমাটি যা আমাদের ছিল একান্ত আপন তা স্বাধীনতার পাদপ্রদীপে বলি হয়ে গেছে, আমরা আমাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু যা ছিল আমাদের জন্মভূমি, তা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি তখনই নতুন করে বাঁচবার তাগিদ এল, শুরু হল নতুন করে ঘর বাঁধবার প্রচেষ্টা।

নতুন বসতি স্থাপন শুরু হল। এমন জায়গায় যা একদা ছিল শ্বাপদশঙ্কুল ঘন বাঁশবন এবং বিষধর সাপের আবাসভূমি। নতুন উদ্দীপনায় ও সমবেত প্রচেষ্টায় নতুন বসতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল—নাম হল 'নবগ্রাম'। নতুন গ্রাম যেখানে গ্রামের পরিবেশে পরস্পরের প্রতি মেলবন্ধন থাকবে। সকলে মিলে ঠিক করলেন এই বসতিকে সর্বাঙ্গ ও আদর্শ গ্রাম হিসাবে তৈরী করতে হলে চাই এক পরিকাঠামো যা অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে কিন্তু সুষ্ঠু বাঁধনে থাকবে এর চালচিত্র। এই তদনীন্তন শুভ চিন্তক অধিবাসীরা ঠিক করলেন সমবায় পদ্ধতিই এর একমাত্র পথ এবং দিশা। এই সিদ্ধান্ত যে কত সঠিক তা আমরা এই পঞ্চাশ বছর বাদেও সম্যক উপলব্ধি করি। এই সমবায় কলোনির প্রধান উদ্দেশ্য হল বাস্তুচ্যুতদের বাস্তু তৈরীর জন্য স্বল্প মূল্যে জমি সংগ্রহ করে দেওয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ করে জমি বন্টন শুরু হল, রাস্তা ঘাট নতুন করে তৈরী হতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানা অভাব দেখা দিল, যেমন শিক্ষা, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির পুনঃ স্থাপন।

সামাজিক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করল নবগ্রাম সেবক সংঘ। এই সংঘ প্রতি রাত্রে পাহারার বন্দোবস্ত করতে লাগল। তখন এখানে কোন ডাক্তার ছিল না, চিকিৎসার অভাব। সেবক সংঘ রোগ প্রতিষেধক টিকা, ইনজেকশন, নর্দমায় ডি ডি টি স্প্রে এ সব করতে শুরু করল। এই সঙ্গে বাড়ীতে বাড়ীতে দরকার হলে রাত জেগে রুগীর শুশ্রূষাও করতে লাগল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা ব্যায়ামাগার ক্রমে ক্রমে সব প্রতিষ্ঠিত হল। সমবায় সমিতি ইতিমধ্যে রাস্তা ঘাট, নর্দমা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কর্মীও নিয়োগ করলেন। স্থাপিত হল প্রাইমারী স্কুল পরপর অনেকগুলি, স্থাপিত হল ছেলেমেয়েদের জন্য মাধ্যমিক স্কুল, ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির একটি

স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হল, চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা হল। এ সবই আমাদের সমবায় সমিতির অবদান। সেবক সংঘের কাজ ও সমবায় সমিতির কাজ সমান্তরাল গতিতে চলতে লাগল।

এর মধ্যে পোস্ট অফিসও তৈরী হল। যে এক ইতিহাস—অনেক চেষ্টার পরে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট Extra Departmental Post Office স্থাপন করলেন নবগ্রামে। সবাই বাড়ি থেকে অফিসে গিয়ে নিজের বাড়িতেই চিঠি লিখতেন, যাদের সুবিধা ছিল অফিসের জন্য রেভিনিউ স্ট্যাম্প অন্যান্য সামগ্রী এই পোস্ট অফিস থেকে কিনে নিয়ে যেতেন অফিসের জন্য এই পোষ্ট অফিসের কাজ ও আয় বাড়াবার জন্য। এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা যিনি অবসরের পরে অন্য জায়গায় বেশী বেতনের চাকুরী ছেড়ে নবগ্রামে এলেন ২০ টাকা বেতনে চাকুরী করতে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আজীবন পোস্ট মাস্টারের চাকুরী করে ইনি জানতেন কি করে Extra Departmental কে Post Office/Sub Post Office-এ রূপান্তর করা যায়। তাঁর ঐকান্তিকতায় ও নবগ্রামের অধিবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় আজ নবগ্রাম পোষ্ট অফিসের এই কলেবর। এই Post Office নবগ্রামের অধিবাসীদের সব প্রয়োজন মেটাচ্ছে। হরিসভা, বিজলিবাতি, পরিশ্রুত জল, পাকা রাস্তা পরপর সব হল সমবায় সমিতির প্রচেষ্টায়। যেখানে টাকা দরকার, যেখানে জমি দরকার, যেখানে জমি ও সঙ্গে বাড়িও দরকার সব দেবার দায়িত্ব নিয়েছে এই সমবায় সমিতি। এই সমবায় সমিতির সভ্যসভ্যারা যেন এক যৌথ পরিবারের সদস্য। এ ভাবেই নবগ্রাম শিশুকাল থেকে যৌবনে পদার্পণ করল। আমাদের সৌভাগ্য সকলের শুভ প্রচেষ্টায় ও শুভবুদ্ধিতে নবগ্রাম নবগ্রামেতেই থেকে যেতে পারল।

এর মধ্যে পঞ্চায়েতের জন্ম হয়েছে। রাস্তা ঘাট নর্দমা ও অন্যান্য কাজ যা এতকাল এই সমবায় সমিতি কোন ট্যাক্স্ ধার্য্য না করেই চালিয়ে যাচ্ছিল ভার পড়ল পঞ্চায়েতের উপর। যা যা দরকার সব করে দিয়েছে এই সমবায় সমিতি, এখন শুধু রক্ষণাবেক্ষণ।

এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা নবগ্রাম আদর্শ সমবায় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে। সামাজিক ও লৌকিক ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন সব গড়ে উঠেছে নবগ্রামে কিন্তু প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তৈরীর পেছনে এক একটা ইতিহাস, খুব সহজে কোন কিছু গড়ে ওঠেনি। অর্থের অভাব ছিল, কিন্তু ছিল লোকবল ও অদম্য উৎসাহ যা প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করেছে, যেমন

এক একটি ইট সাজিয়ে ইমারত তৈরী হয় সে রকম এক এক করে এই নবগ্রামকে সাজান হয়েছে। রাস্তাঘাট, প্রাইমারী ও নার্সারী স্কুল, উচ্চতর ও মাধ্যমিক একাধিক স্কুল, কলেজ, সত্যভারতী, সেবক সংঘ, মহাদেশ পরিষদ ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান, বৈদ্যুতিক আলো, পরিশ্রুত জল, দোকান পাট, বাজার, কাঠের এবং স্টিলের আসবাব পত্রের ফ্যাকটরী ও দোকান—কি নেই এখন নবগ্রামে। কোন কিছুর জন্যই এখন আর কলকাতা দৌড়বার দরকার নেই। নবগ্রামকে কেন্দ্র করে আশপাশে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন জনপদ। যে জায়গায় একটা প্রাইমারী স্কুলও ছিল না, লোকসংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, যেখানে আজ এই সমবায় সমিতির কল্যাণে সব কিছু গড়ে উঠেছে. এই নবগ্রামের পরিচিতি সারা পশ্চিমবঙ্গে। এখানে বহু কৃতী শিক্ষিত লোকের বাস এখানকার বহু যুবক দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক নবগ্রামের চেহারাও পাল্টেছে, পাল্টেছে চিন্তা-ভাবনার ধরণ, দেখা দিয়েছে নগর ভিত্তিক মানসিকতা। নবগ্রামের সেই সংহত সুসংবদ্ধ ও পারস্পরিক সৌহার্দের বাতাবরণ যা ছিল নবগ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা জঙ্গলাকীর্ণ এই জনপদকে এক পূর্ণাঙ্গ বসতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তার যেন কিছুটা অবক্ষয় হয়েছে। এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে অনেক উত্থান পতনের হিসাব আছে। অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে এই নবগ্রাম তৈরী হয়েছে। এই নবগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই নবগ্রামের অধিবাসীদের মনে রাখতে হবে আমরা পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশীদার। এককভাবে বাঁচার জন্য নবগ্রাম তৈরী হয় নি অবশ্য একক ভাবে বাঁচাও যায় না। আসুন আমি আপনি সকলে মিলে এই নবগ্রামকে আজকের দিনের চাহিদার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য করে আবার নতুন করে গড়ে তুলি।

সম্পাদকের বিবরণী

[সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ থেকে]

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টের মধ্যরাত্র ভারত স্বাধীনতা পাবে। আমরা ভারতবাসীরা ২০০ বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাব, মন আনন্দের ভরপুর। হউক না দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ তবুও স্বাধীনতার মূল্য অনেক। এই স্বাধীনতার জন্য বহুলোক আত্মদান করেছেন হাসিমুখে। সেই আত্মদানের মূল্যে স্বাধীনতা। কিন্তু মন তখনই ভারাকান্ত হল যখন জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম এই স্বাধীনতার জন্য নিজের মাতৃভূমিকে ফেলে আসতে হবে তখনই। বয়স কম হলেও স্বাধীনতা পাওয়ায় যে আনন্দ তা ক্রমেই স্তিমিত হতে থাকল, নিজেদের পৈত্রিক ভূমিকে ছেড়ে যেতে হবে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে এ পারে রেখে চলে যেতে হবে এ একটা হর্ষ বিষাদের শিহরণ। তাই স্বাধীনতা অমৃত ফল ভোগ করতে পশ্চিমে যেতে হবে। কারণ বহুবিধ আনন্দের ফেলে আসা দিনগুলিকে আর টেনে আনতে চাইনা।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পর কর্তব্য পালন করতে হলে চাই সুপরিকল্পিত চিন্তা, সেই চিন্তা কি? বাসোপযোগী জমি যা কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয় অথচ অল্প অর্থ ব্যয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই আমাদের পূর্বসূরীরা বেছে নিয়ে ঘর আরম্ভ করলেন কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিম পারে জঙ্গলাকীর্ণ মাপের বাসভূমি এই ছোটবহেড়া, বড়বহেড়া ও কোন্নগর মৌজার কিয়দংশে অজন্মা জমি সংগ্রহ করে। এবং সে জমিকে বাসোপযোগী করতে অর্থ ব্যয়, দৈহিক পরিশ্রমকে মূলধন করে এগোতে হবে দৃঢ় চিত্তে। এখানে শুধু সাপের ভয়ই ছিল না, ছিলো ডাকাতের ভয় এবং কারো শ্যেনদৃষ্টি। এত বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই নগণ্য হলেও আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে হারিয়ে আসা জমি ও গৃহীদের বিকল্প সুস্থ জীবন যাপনের জন্য সহযোগিতা করতে লাগলেন। আমরা মনে পুনরায় সাহস সঞ্চয় করে ক্ষুদ্র হলেও গৃহাদি প্রস্তুতে মন দিলাম। এক্ষেত্রে একথা স্বীকার করতেই হবে ঐ মুহূর্তে স্থানীয় চাষী বন্ধু যথা সুরেন দাস, চরণ কাঁড়ার, মানিক বাগ, কানাই ঘোষ, পরেশ ঘোষ ইত্যাদি আমাদের সাহায্য না করতেন তবে এই নবগ্রাম হত না, বা হলেও অনেক বিলম্ব হত। তাই আজ আমরা সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে তাঁদের স্মরণ করে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

আমাদের পূর্বসূরী শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় গিরীন ব্যানার্জী ও পরেশ চন্দ মহাশয়

পূর্ববঙ্গ হতে আগত গৃহহারা সর্বহারাদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে থাকলেন। কিন্তু শুধু বসবাসের ব্যবস্থার জন্য জমি সংগ্রহ করলেই জীবন চলবে না ওঁরা চেয়েছিলেন এটাকে একটা আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে, যেখানে আধুনিক জীবন ধারনের অন্যান্য উপকরণও প্রয়োজন, যেমন রাস্তাঘাট, জল, আলোর ব্যবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি। এসব নিত্যপ্রয়োজন মেটাতে হলে বহু টাকার প্রয়োজন। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে কারণ এখানে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁরা সীমিত অর্থ আয়ের লোক, কারোও পক্ষেই এককালীন অর্থ ব্যয় করে উঁন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। তথাপি তৎকালীন বিভিন্ন সময়ের পরিচালক সমিতি Phase অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরী করলেন, কিন্তু পরিকল্পনা মত কাজ করতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন।

তাই তাঁরা নিজের জমি কেনা হয়ে গেছে বলে চুপ করে থাকলেন না। তারা সকলে কো-অপারেটিভ কলোনি করবেন ঠিক করলেন। তখন খাদ্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়। তাঁর কাছে প্রায় ২০০ জন স্বাক্ষরিত পত্রে পুনর্বাসনে সাহায্য করার জন্য আবেদন করা হল। তিনি স্বহৃদয় চিত্তে জানালেন পূর্ববঙ্গ থেকে এসে যারা এই ছোটবহেড়া, বড়বহেড়া ও কোন্নগর এর কিয়দংশে বাড়ী তৈরী করে বসবাস করছে বা আগ্রহ আছে তাদের সকলকেই পুনর্বাসনে বাধা সৃষ্টি করা হবে না। তাই দৃঢ়চিত্ত মন নিয়ে সকলেই ঘর বাঁধতে আরম্ভ করল সীমিত অর্থ নিয়ে। ঘরতো বাঁধতে আরম্ভ করলেন কিন্তু জায়গাটির একটা সুন্দর নাম করা যায় সে ভাবে প্রস্তাব আরম্ভ হল। বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে 'নবগ্রাম' নামটা গ্রহণ করে সমবায় সমিতি সমূহের রেজিস্টারের কাছে আবেদন করা হল। সমবায় দপ্তর বিশেষ বিবেচনা করে আমাদের এই সমবায় কলোনিকে স্বীকৃতি দিলেন ১৯৪৮ সনের ২রা ডিসেম্বর।

নবগ্রাম নামে একটি সমবায় সমিতি তৈরী হল কিন্তু একে প্রয়োজন মাফিক প্রস্তুত করতে হবে। সে কথা চিন্তা করে নবগ্রাম উন্নয়নে পরিকল্পনাতে সর্বাগ্রে যা বাস্তবে সত্বর পরিণত করার চিন্তা করে কাজ আরম্ভ করার জন্য সকল সভ্যগণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন ভাবা হল অর্থ সংগ্রহ করার চিন্তা করতে হবে। সরকারের কাছ থেকে Development-এর অর্থ পাওয়া শক্ত ও বিলম্ব এই দুইই হবে—তবু কাজ ফেলে রাখা যাবে না কারণ প্রয়োজন মাফিক ক্রমান্বয়ে এগোতে হবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই তাই পরিকল্পনাই প্রস্তুত করা হল—

যে পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হবে প্রয়োজন মাফিক সেই পরিকল্পনা কিছুটা উল্লেখ করি।

১। পাতকুয়া ও টিউবওয়েলের পরিবর্তে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা।

২। রাস্তা ঘাট তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছেলে ও মেয়েদের জন্য।

৪। ডাকঘর।

৫। বিজলি বাতি।

৬। খেলাধুলার মাঠ।

৭। বেকারত্ব দূর করার জন্য সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিপনন সংস্থা।

৮। হাসপাতাল।

৯। হরিসভা।

১০। পুরসভা।

১১। কোন্নগর থেকে দিল্লী রোডের সাথে সংযোগের ব্যবস্থা, আরও অনেক পার্ক এবং সেবক সংঘ সোসাইটির Cultural Section তৈরী করা।

উপরোক্ত পরিকল্পনার মধ্যে এই ৫০ বৎসরে সবই প্রায় সম্পূর্ণ।

১৯৪৮ সন থেকে আজ পর্যন্ত বহু মানুষের পদার্পণে নবগ্রাম ধন্য। এখানে এসেছেন বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না, শ্রীমতী রিতা পণ্ডিত প্রমুখরা। আমাদের সোসাইটির সভ্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় প্রভূত প্রশংসা করে যথাসাধ্য উৎসাহিত করে গেছেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয় হয়ে আছে ও থাকবে।

নবগ্রামকে যাঁরা পত্তন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যাঁরা নবগ্রামের উন্নয়নে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ গত। তাঁদের স্মৃতি আজকের এই পুণ্যদিনে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। আজও যাঁর জীবিত আছেন তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। এই সব কর্মীদের সকলেই বৃদ্ধের কোঠায় উপনীত। নবগ্রামের বুকে প্রথম যে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে আজ পূর্ণ বয়স্ক, নবগ্রামের মাটি তার বাসভূমি। তার মাতৃভূমি নবগ্রাম তার যত্ন ও মমতার উপর নির্ভর করছে। নবগ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করায় প্রায় সব প্রকার কার্যই সম্পন্ন করা হয়েছে। এদের এখন গুণগত বিকাশের ওপরই নবগ্রামের ক্রমোন্নতি নির্ভর করবে।

নবগ্রাম

মুরারি মিত্র

নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নানাভাবে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তারপর, ওখানে বাড়িঘর Construction আরম্ভ হলে, কো-অপারেটিভের প্রথম সভাপতি গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রথম সম্পাদক পরেশচন্দ্র চন্দ প্রায়ই আসতেন। সঙ্গে থাকতো কত বিল্ডিং প্ল্যানসহ গৃহনির্মাণ সামগ্রীর পারমিটের জন্য কত আবেদন। তখন সব কিছুই কন্ট্রোলের সামগ্রী। একজন Civil Supply Inspector ও সঙ্গে থাকতেন। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, সেই ১৯৪৮-৪৯ সালে কন্ট্রোলের সমস্ত সামগ্রীর জন্য আবেদন স্থানীয় ভাবে অনুসন্ধান করে পারমিট বিতরণ যথাযথ এবং ত্বরান্বিত করার জন্য তখন প্রত্যেক Controller of Civil Supplies দফতরে সরকার নিযুক্ত একটি করে Advisory Committee ছিল। তারই সদস্য থাকার কারণে—নবগ্রামের যাবতীয় আবেদনের ব্যবস্থা যাতে ত্বরান্বিত করা যায়—সে কারণেই তাঁদের আসা। তাছাড়া, মাখলা-ন'পাড়া ইউনিয়ন বোর্ড এলাকা, "উত্তরপাড়া-রিষড়া মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির" অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এই সংগঠনের প্রধান হিসাবে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তো পূর্ব থেকেই ছিল। এই সব কারণে নবগ্রাম আবাসন সমবায় সমিতির প্রায় আদিপর্ব থেকেই আমি তার সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত।

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ নবগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। নবগ্রাম সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পর এই কলোনিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রথম শুভাগমন। সোসাইটিও ওই দিনই তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবেন মনস্থ করলেন। আবার হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটি ওই দিনই বেলা ১১টায়, রিষড়া স্কুলের মাঠে, শ্রীরামপুর কেন্দ্রের প্রার্থী জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সমর্থনে নির্বাচনী সভার আয়োজন করেছেন, যেখানে ডাক্তার রায়ের ভাষণ দেবার কথা। এই সভাগুলির উপলক্ষে, বিশেষ করে নবগ্রামের দুটি সভার ব্যাপারে আমি এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। নবগ্রামের সভার দুদিন আগে, শঙ্করীদা

(জেলা কংগ্রেস সম্পাদক শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) খবর পাঠালেন, আমি যেন পরের দিন বেলা ১২টার মধ্যে অবশ্যই রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রফুল্লদার সঙ্গে দেখা করি। তিনি ডেকেছেন। যথাসময়ে গিয়ে শুনলাম, নবগ্রামের দুটি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরাই চান ডাক্তার রায় যেন তাদের অনুষ্ঠানে প্রথমে যান। কিন্তু ডাক্তার রায় স্থির করেছেন, যেহেতু নবগ্রাম কো-অপারেটিভ কলোনিতে তিনি এই প্রথম যাচ্ছেন, সুতরাং তাঁদের অনুষ্ঠানেই তিনি আগে যাবেন। ওরা দুপক্ষই বলে গেছেন—নবগ্রামে ঢুকে সামান্য গেলেই রাস্তা দুদিকে চলে গেছে। এক দিকে কলেজ আর একদিকে কলোনির সভাস্থল। বললেন, আমি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে থাকব। তুমি নবগ্রামে ঐ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর Convoy-এর Pilot-কে কো-অপারেটিভের সভার পথটা দেখিয়ে দেবে। যে পুলিশ সার্জেন্ট পাইলট থাকবেন তাঁকে নীচে থেকে ডেকে নিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁকেও সব বলে দিলেন। আমাকে আরও বললেন, আমি যেন এখানে এঁদের বলে দিই যে, অনুষ্ঠান কোথাও দীর্ঘ করা যেন না হয়। কারণ এখানের এবং রিষড়ার জনসভা সেরে ডাক্তার রায়কে দেড়টার মধ্যে রাইটার্সে ফিরতে হবে। ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরের ব্যাপারে একটি জার্মান প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে তাঁর appointment আছে। আমার অবস্থা তখন খুবই করুণ। বুঝলাম, পথের ইঙ্গিত দেবার এই ব্যবস্থাটি খুবই গোপন রাখতে হবে। আর অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার কথা এঁদের বলতে গেলে এঁরাও আমার উপর বিরক্ত হবেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাযথ ভাবে, ট্রাফিক পুলিশের কায়দায়, Pilot-কে পথ দেখিয়ে দিলাম, এবং যথাযথ ইশারা পেয়ে যাওয়ায় তাকেও তার মোটর বাইকের গতি স্তিমিত করতে হলো না। প্রফুল্লদা বলে ছিলেন, পথ দেখিয়েই, ডাক্তার রায়ের গাড়ির পেছনেই ওঁর গাড়ি থাকবে, আমি যেন তাতে উঠে পড়ি। কিন্তু চলন্ত কনভয়ের কোনও গাড়ি হঠাৎ করে দাঁড়াতে পারে না। আমার তাই কোনও গাড়িতেই ওঠা হলো না। দশ বারো খানা গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর—রাস্তা ধুলায় অন্ধকার। আর তেমনি ভিড়। আমি কি করি! ছুটতে আরম্ভ করলাম। বেশ কিছুটা পথ। সুতরাং হাঁপিয়ে, ঘেমে, ধুলি ধুসরিত অবস্থায় সভাস্থলে পৌঁছে দেখলাম—ভিড়ে সভামঞ্চে ওঠাই দুরূহ ব্যাপার। ঠেলে ঠুলে মঞ্চে যখন উঠলাম তখন অতিথি বরণ ইত্যাদি হয়ে গেছে—

মাইকে একটা কিছু পাঠ করা হচ্ছে। আর ডাক্তার রায় তাঁর পুরাতন বন্ধু শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ কুশারী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপে মশগুল।

দেখতে দেখতে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। পাষাণী অহল্যা রাম পদস্পর্শে জেগে উঠেছিল। আর, কয়েক শতাব্দীর সম্পদশালী একটা অঞ্চল মাত্র বিগত দেড়শ/দুশ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়ে জলা জঙ্গলে পর্যবসিত হয়েছিল—সেই মাটিতে নবগ্রাম সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি করেছে প্রাণ সঞ্চার। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় সেই জনহীন উষর প্রান্তর আজ একটা সুন্দর জনপদ। আজকাল প্রায়ই 'উপনগর' গড়ার কথা শোনা যায়। তাঁরা এসে নবগ্রামকে দেখে যেতে পারেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মানুষ নিজেদের নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সততার বলে কী করতে পারেন, হুগলী জেলার এই নবগ্রাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বাধীনতার স্বর্ণ-জয়ন্তীর প্রেক্ষিতে নবগ্রাম আবাসন সমিতির পঞ্চাশ বছর

অজিত ঘোষাল

পঞ্চাশ বছরে 'নবগ্রাম সমবায় ও আবাসন সমিতি' ছোট একটি জনপদ গড়ে তুলতে পেরেছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার জনসংখ্যা নিয়ে আজ নবগ্রাম গর্ব করে বলতে পারে তাদের উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলি। ছোটদের একাধিক স্কুল, চারটি উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ, বাজার হাট, বিজলী আলো, জল, দোকান পাট, রেডক্রস সংস্থা, দুঃস্থ এবং অন্যান্য মেয়েদের হোমস, (সত্যভারতী), রবীন্দ্রভবন, সেবক সঙ্ঘ, মহাদেশ পরিষদ, সোসাল স্কোয়াড, এম্বুলেন্স, নির্মিয়মান হাঁসপাতাল এইরকম একটি ছোট জনপদে গড়ে ওঠা এককথায় একটি অভুতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তীতে হুগলী জেলার 'নবগ্রাম সমবায় ও আবাসন সমিতি' ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল; এ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সমিতি এ বছর তার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে চলেছে। উনিশশো সাতচল্লিশের সেই খানা-ডোবা; বাদা জমি...বাঁশঝাড়, কিছু ধানের ক্ষেত যেখানে ঠেঙাড়ে আর ডাকাতের ভয়ে বিকেলের পরে মানুষ চলাফেরা করত না.....শেয়ালের ডাকে রাত্রির প্রহর ভাঙতো—সেই জমিতে পূর্ববাংলার ছিন্নমূল মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল। তাদের সকলকে সংঘবদ্ধ করে সেদিন কতিপয় মানুষ শুরু করেছিলেন যে সমবায় আবাসন তাঁদের প্রত্যেককে আমি শ্রদ্ধা আর বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। আজ বড় অনায়াসেই নাসিকা কুঞ্চন করে অনেকেই নবগ্রামের রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির অসুবিধার কথা সমালোচনার সুরে বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের জন্য আজ যে জনপদ সেই কতিপয় মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ আর নিরলস সংগ্রামের মধ্যে গড়ে উঠেছে তার জন্য আমরা কতজন কৃতজ্ঞতা বোধ করি। নবগ্রাম সমবায় ও আবাসন সমিতির সঙ্গে আজ যদি আমরা অর্থাৎ সমস্ত নবগ্রামবাসী মনেপ্রাণে যুক্ত হয়ে আমাদের সমস্যাগুলোকে মাথায় রেখে নিজেদের স্বার্থন্বেষী মনোভাব ত্যাগ করে সমগ্রিক কল্যাণ কামনায় ব্রতী হতে পারি তাহলেই আমরা গড়ে তুলতে

পারব এক সুস্থ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ জনপদ। ভারতের বিরাট মানচিত্রের একটি ক্ষুদ্র, অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনপদ এই নবগ্রাম আদর্শ আবাসন হয়ে তার চালচিত্রের রূপায়ণে এক নতুন সংযোজন হয়ে উঠতে পারে যদি এই বিরাট কর্মযজ্ঞে যুবশক্তিকে আমরা সংঘবদ্ধ করে অগ্রসর হতে পারি। নবগ্রামে জ্ঞানী, গুণীজন এবং প্রচুর সৎ মানুষ রয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে নবগ্রাম সমবায় ও আবাসন সমিতি হাতে হাত ধরে যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৌরসভা গঠন করে সমাজের সর্বস্তরে সর্বমুখী কল্যাণ প্রকল্পে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

নবগ্রাম মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনি অ্যাণ্ড হাউসিং সোসাইটির পদাধিকারসহ পরিচালনা সমিতির

সদস্যদের নামের তালিকা

১৯৪৮-এ প্রথম পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দের নাম স্মরণ করা কর্তব্য। এঁরা প্রথম আলো জ্বালালেন অন্ধকারের বুকে। তাই শ্রদ্ধায় তাঁদের একবার স্মরণ করি— (১৯৪৮—১৯৫১)

গিরীন্দ্রকুমার ব্যানার্জী	—	সভাপতি
জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার	—	সহঃ সভাপতি
পরেশচন্দ্র চন্দ	—	সম্পাদক
অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	সহঃ সম্পাদক
জিতেন্দ্রনাথ দাস	—	ডিরেক্টর
অমূল্যকুমার সরকার	—	,,
মণীন্দ্রকুমার মজুমদার	—	,,
প্রফুল্লরঞ্জন দাস	—	,,
সত্যরঞ্জন চৌধুরী	—	,,
পবিত্রকুমার মজুমদার	—	,,
শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	—	,,
প্রবোধরঞ্জন গুহ	—	,,

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৫১—১৯৫৪)

গিরীন্দ্রকুমার ব্যানার্জী	—	সভাপতি
অমূল্যকুমার সরকার	—	সহঃ সভাপতি
পরেশচন্দ্র চন্দ	—	সম্পাদক
সত্যরঞ্জন চৌধুরী	—	সহঃ সম্পাদক
জিতেন্দ্রনাথ দাস	—	ডিরেক্টর
শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	—	,,

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ভট্টাচার্য্য	—	ডিরেক্টর
অতুলচন্দ্র দাস	—	”
প্রফুল্লরঞ্জন দাস	—	”
মনোতোষ চক্রবর্তী	—	”
স্নেহাংশুভূষণ বক্সী	—	”
হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	—	”

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৫৪—১৯৫৬)

হীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	—	সভাপতি
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ভট্টাচার্য্য	—	সহঃ সভাপতি
পরেশচন্দ্র চন্দ (২৯/২/৫৫ পর্যন্ত)	—	সম্পাদক
জিতেন্দ্রনাথ দাস (২৯/২/৫৫—১২/৫/৫৫)	—	সম্পাদক
জীবনকৃষ্ণ সরকার (১২/৫/৫৫—১৩/৫/৫৬)	—	সম্পাদক
সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য	—	সহঃ সম্পাদক
সুকুমার চক্রবর্তী	—	সহঃ সম্পাদক
পরেশনাথ বিশ্বাস	—	কোষাধ্যক্ষ
সত্যরঞ্জন চৌধুরী	—	ডিরেক্টর
অমূল্যকুমার সরকার	—	”
বিনয়ভূষণ বসু বর্মন	—	”
সুরেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন	—	”
জিতেন্দ্রনাথ কুশারী	—	”
আশুতোষ মিত্র	—	”

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৫৬—১৯৫৭)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	সভাপতি
পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী	সহঃ সভাপতি
সুকুমার চক্রবর্তী	সম্পাদক
শচীন্দ্রকুমার সরকার	সহঃ সম্পাদক
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	কোষাধ্যক্ষ
জিতেন্দ্রনাথ কুশারী	ডিরেক্টর

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী	—	ডিরেক্টর
জীবনকৃষ্ণ সরকার	—	”
সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য	—	”
জনরঞ্জন সেন	—	”

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৫৭—১৯৬০)

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী	—	সভাপতি
সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী	—	সহঃ সভাপতি
শচীন্দ্রকুমার সরকার	—	সম্পাদক
তারাপ্রসাদ সেনগুপ্ত	—	সহঃ সম্পাদক
প্রমথরঞ্জন সরকার	—	সহঃ সম্পাদক
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	—	কোষাধ্যক্ষ
সুকুমার চক্রবর্তী	—	ডিরেক্টর
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	”
চন্দ্রভূষণ ভট্ট	—	”
সুরেশচন্দ্র দে চৌধুরী	—	”
নিরঞ্জন চ্যাটার্জী	—	”
মৃগাঙ্কপ্রসাদ গুহ	—	”

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৬০—১৯৬২)

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী	—	সভাপতি
সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী	—	সহঃ সভাপতি
শচীন্দ্রকুমার সরকার	—	সম্পাদক
চন্দ্রভূষণ ভট্ট	—	সহঃ সম্পাদক
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	—	কোষাধ্যক্ষ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	ডিরেক্টর
ননীগোপাল পোদ্দার	—	”
নিরঞ্জন চ্যাটার্জী	—	”
সুরেশচন্দ্র দে চৌধুরী	—	”
মৃগাঙ্কপ্রসাদ গুহ	—	”

মলয়কুমার সেনগুপ্ত	—	ডিরেক্টর
রঙ্গলাল দত্ত	—	"

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৬২—১৯৬৫)

সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী	—	সভাপতি
চন্দ্রভূষণ ভট্ট	—	সহঃ সভাপতি
শচীন্দ্রকুমার সরকার	—	সম্পাদক
সুরেশচন্দ্র সাহা	—	সহঃ সম্পাদক
নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	—	কোষাধ্যক্ষ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	ডিরেক্টর
পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী	—	"
ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	—	"
অনন্তকুমার চক্রবর্তী	—	"
নিরঞ্জন চ্যাটার্জী	—	"
উপেন্দ্রনাথ দাস	—	"
মুকুল সেনগুপ্ত	—	"

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৬৫—১৯৯৩)

সুকুমার চক্রবর্তী	—	সভাপতি
ননীগোপাল পোদ্দার	—	সহঃ সভাপতি
শচীন্দ্রকুমার সরকার	—	সম্পাদক
রেবতীমোহন দাস	—	সহঃ সম্পাদক
ননীগোপাল শূর	—	ডিরেক্টর
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	"
বাসুদেব ভট্টাচার্য্য	—	"
কানাইলাল ব্যানার্জী	—	কোষাধ্যক্ষ
মলয়কুমার তালুকদার	—	ডিরেক্টর
শিশুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	—	"

অজিতমোহন চক্রবর্তী	—	ডিরেক্টর
মলয়কুমার সেনগুপ্ত	—	,,

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৯৩—১৯৯৬)

সুকুমার চক্রবর্তী	—	সভাপতি
অজিতমোহন চক্রবর্তী	—	সহ সভাপতি
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	প্যানেল চেয়ারম্যান
শিশুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	—	,,
মলয়কুমার তালুকদার	—	,,
শচীন্দ্রকুমার সরকার	—	সম্পাদক
রেবতীমোহন দাস	—	সহঃ সম্পাদক
কানাইলাল ব্যানার্জী	—	কোষাধ্যক্ষ
নির্মলকুমার চ্যাটার্জী	—	ডিরে
গৌরাঙ্গচন্দ্র ব্যানার্জী	—	,,
কালিপদ গুহ	—	,,
ভূপেশচন্দ্র সাহা (১৫/১২/৯৬ হতে)	—	,,
জগন্নাথ চ্যাটার্জী (২৯/১১/৯৬ পর্যন্ত)	—	,,

পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ
(১৯৯৬—১৯৯৯)

সুকুমার চক্রবর্তী	—	সভাপতি
অজিতমোহন চক্রবর্তী	—	সহঃ সভাপতি
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	প্যানেল চেয়ারম্যান
শিশুরঞ্জন ভট্টাচার্য	—	,, ,,
মলয়কুমার তালুকদার	—	,, ,,
শচীন্দ্রকুমার সরকার	—	সম্পাদক
রেবতীমোহন দাস	—	সহঃ সম্পাদক
কানাইলাল ব্যানার্জী	—	কোষাধ্যক্ষ
নির্মলকুমার চ্যাটার্জী	—	ডিরেক্টর